অলৌকিক গল্পসমগ্র

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কপিরাইট © তূণীর বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৭
প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১৭
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই বইটি এই শর্তে বিক্রীত হল যে, প্রকাশকের পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া বইটি বর্তমান সংস্করণের বাঁধাই ও আবরণী ব্যতীত অন্য কোনও রূপে বা আকারে ব্যাবসা অথবা অন্য কোনও উপায়ে পুনর্বিক্রয়, ধার বা ভাড়া দেওয়া যাবে না এবং ঠিক যে-অবস্থায় ক্রেতা বইটি পেয়েছেন তা বাদ দিয়ে স্বত্বাধিকারীর কোনও প্রকার সংরক্ষিত অধিকার খর্ব করে, স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক উভয়েরই পূর্বলিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইটি কোনও ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্যসঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি বা অন্য কোনও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন, সঞ্চয় বা বিতরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই বইয়ের সামগ্রিক বর্ণসংস্থাপন, প্রচ্ছদ এবং প্রকাশককৃত অন্যান্য অলংকরণের স্বত্বাধিকারী শুধুমাত্র প্রকাশক।

ISBN 978-93-5040-836-0 (print)
ISBN 978-93-90048-83-0 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: সুদীপ্ত দত্ত

প্রকাশকের নিবেদন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসমূহের মধ্যে 'ভূতজ্ঞানী' বরদার গল্পসহ অন্যান্য অলৌকিক গল্পগুলি বিশেষ জনপ্রিয়। ১৯১৫ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত সময়কালে বেশ কিছু অলৌকিক গল্প রচনা করেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এগুলি শরদিন্দু অম্‌নিবাসের পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে বিষয় অনুসারে শরদিন্দুর লেখাগুলি বিন্যস্ত করার যে পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছিলাম, সেই অনুযায়ী এই গ্রন্থে শরদিন্দুর সমুদয় অলৌকিক গল্প, বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়সহ সংকলিত হল।

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র
গল্পসংগ্রহ
নাটক ও চিত্রনাট্য সমগ্র
ঝিন্দের বন্দী
তুঙ্গভদ্রার তীরে
দশটি উপন্যাস
ব্যোমকেশ সমগ্র
ভূমিকম্পের পটভূমি (কিশোর সাহিত্য)
শরদিন্দু অমনিবাস ১ম খণ্ড-১২শ খণ্ড

সূচি

*

প্রেতপুরী

রক্ত-খদ্যোত

টিকটিকির ডিম

অন্ধকারে

মরণ-ভোমরা

অশরীরী

সবুজ চশমা

বহুরূপী

প্রতিধ্বনি

পঞ্চভূত

আকাশবাণী

ধীরেন ঘোষের বিবাহ

দেহান্তর

ভূত-ভবিষ্যৎ

নিরুত্তর

দেখা হবে

গুহা

শূন্য শুধু শূন্য নয়

মধু-মালতী

চিরঞ্জীব

মায়া কুরঙ্গী

সতী

নীলকর

কালো মোরগ

নখদর্পণ

প্রত্নকেতকী

ছোটকর্তা

মালকোষ

ফকিরবাবা

পিছু পিছু চলে

কামিনী

গল্প-পরিচয়

প্রেতপুরী

সূর্যাস্তের পর শ্রাবণের বৃষ্টি আরো চাপিয়া আসিয়াছিল। আমরা কয়জনে ক্লাবের একটা ঘরে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিলাম। আলোটা টেবিলের উপর নিস্তেজভাবে জ্বলিতেছিল। এমন সময় ছাতা মাথায় দিয়া প্রায় ভিজিতে ভিজিতে বরদা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের মধ্যে একজন তাহাকে সম্ভাষণ করিল, আয়াহি বরদাবাবু!

বরদা ছাতাটা মুড়িয়া এককোণে দাঁড় করাইয়া দিয়া কোঁচা দিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে একটা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, 'এ ভরা বাদর মাহ "শাঙন" শূন্য মন্দির মোর। গিন্নী বুঝে-সুঝে আজই বাপের বাড়ি গেলেন।'

অমূল্য এককোণে গুড়িসুড়ি পাকাইয়া বসিয়াছিল; বলিল, 'তাই আমাদের জ্বালাতে এসেছ?'

বরদা ওদিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, 'বাড়িটা ভারি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতে লাগল, তাই—'

মিনিট দুই নীরব থাকিয়া বুক-পকেটের ভিতর হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'আজকের বৃষ্টি দেখে একটা পুরনো গল্প মনে পড়ছে—'

'এই সারলে!' অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'একটু যে নিশ্চিন্দি হয়ে ক্লাবে বসব তার যো নেই। আমি বাড়ি চললুম; হৃষী, তোমার ছাতাটা যদি দাও—'

হৃষী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'উহুঁ, আমাকেও তো বাড়ি যেতে হবে। বৃষ্টি আজ রাত্রে থামবে বলে মনে হচ্ছে না।'

অমূল্য ব্যাকুলচক্ষে ঘরের চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু ছাতার স্বত্বাধিকারী কাহারও মুখে করুণার কণামাত্র না দেখিয়া হতাশভাবে আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

পৃথ্বী জোরে হাসিয়া উঠিল, 'অমূল্য, কপালে লিখিতং ঝাঁটা, কোন শালা কিং করিষ্যতি। বরদার গল্পটা শুনেই যাও।'

অমূল্য জবাব দিল না।

বরদা আরম্ভ করিল:

বছর কয়েক আগেকার কথা। সেবারও এমনি নিদারুণ বর্ষা; ভাসছে বিলখাল, ভাসছে বিলকুল, ঝাপসা ঝাপটায় হাসছে জুঁইফুল। আমার মাসতুতো ভাইয়ের বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছি।

দাদা বিয়ে করলেন বাংলাদেশের এক অতি পুরনো পচা পাড়াগাঁয়ে। আমাদের কারুর মত ছিল না কিন্তু প্রজাপতি শুনলেন না, অগত্যা সেইখানেই যেতে হল।

একে পল্লীগ্রাম, তায় বর্ষাকাল। সে-দৃশ্য বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়। সুবিধের মধ্যে রেলের স্টেশন ক্রোশখানেকের মধ্যেই ছিল।

স্টেশনে নেমে সকলে পদব্রজে কনের বাড়ির দিকে যাত্রা করলুম; কারণ, জানা গেল যে মধ্যে একটা পুল ভেঙে গিয়ে পথ গরুর-গাড়ির পক্ষেও দুর্গম হয়ে উঠেছে। পুরোহিত ন্যায়রত্ন মশায় সঙ্গে ছিলেন, কাদার মধ্যে তাঁর একপাটি খড়ম অন্তর্হিত হল দেখে আমরা আপন আপন জুতো খুলে বগলে নিলুম। তারপর অনেক বাধা-বিঘ্নের ফাঁড়া কাটিয়ে যখন মেয়ের বাড়ি উপস্থিত হলুম, তখন বর থেকে নাপিত পর্যন্ত কাউকে চেনা গেল না। কেবল, মেসোমশায় গোঁফ থেকে কাদা নিঙড়োতে নিঙড়োতে কাকে খিঁচোচ্ছিলেন, গলার আওয়াজে

তাঁকে ধরে ফেললুম।

এই একক্রোশ পথ পায়েসের মতো কাদার মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল। তাই কন্যাপক্ষ যখন মুগের ডালের খিচুড়ি আর হাঁসের ডিম ভাজা দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, তখন কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় খেয়ে ফেললুম।

আহারান্তে কিন্তু বড় কষ্ট পেতে হল। আমরা সংখ্যায় বরযাত্রী প্রায় কুড়িজন ছিলাম। যে ঘরটিতে আমাদের বিশ্রাম করতে দেয়া হল, তাতে শোয়া নয়, ঠাসাঠাসি করে কোনরকমে কুড়িজন বসতে পারে। গুরুভোজনের পর সকলের মনেই একটু গড়াবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর ঘটে উঠল না। শুধু শীর্ণদেহ ন্যায়রত্ন মশায় কোনমতে একটা কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আর সকলে পান-তামাক খেয়ে গল্প-গুজবে সময় কাটাতে লাগল, একদিকে জনকয়েক ছোকরা তাস নিয়ে বসে গেল; আমার কিন্তু বড় বিরক্তি বোধ হতে লাগল। জানলার ধারে বসে মন-খারাপ করে ভাবতে লাগলুম— দিনের বেলা তো যা হোক হল, রাত্রেও কি ঐ ব্যবস্থা নাকি?

গোধূলি-লগ্নে বিয়ে, সুতরাং রাত্রে ঘুমোবার কোন বাধা নেই। দাদা না হয় বাসরঘর আলো করে শ্যালী আর দিদিশাশুড়ির সঙ্গে রসিকতা করে রাত কাটাবেন, কিন্তু সেজন্যে আমার সারারাত জেগে পাহারা দেবার তো কোন দরকার নেই। তাই বাড়ির একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, রাত্রে শোবার ব্যবস্থা কি রকম?

তিনি বললেন, পাড়াগাঁয়ে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না, অতিকষ্টে এই বাড়িটি সংগ্রহ করা হয়েছে। এর আর একটি ঘরে জিনিসপত্র আছে, রাত্রে খালি করে দেয়া হবে।

শুনে বড় ভরসা হল না, কুড়িজনের শোবার জন্য মাত্র দুটি ঘর! অন্যমনস্কভাবে বাইরের অবিশ্রাম বারিধারার দিকে চেয়ে চেয়ে কিছুদূরে একটি অন্ধকারদর্শন ছোট পাকা বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িতে কেউ আছে বলে বোধ হয় না, দরজা-জানলাগুলো সব বন্ধ। আগে বোধ হয় বাড়িখানার হলদে রঙ ছিল, এখন সবুজবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেয়ালের স্থানে স্থানে চুন-বালি খসে গিয়ে ঘায়ের মতো দেখাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ও বাড়িটি কার?

ভদ্রলোকটি হেসে বললেন, আপাতত ভূতের।

একটু বিস্মিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে তিনি যা বললেন তার মর্ম এই: কিছুকাল পূর্বে ঐ বাড়িটি এক ভদ্রলোকের ছিল, অবশ্য তাঁর নিজের তৈরি নয়, পৈতৃক-সম্পত্তি। তিনি গ্রাম থেকে ক্রোশ দুই দূরে জমিদারের কাছারিতে পনেরো টাকা বেতনে গোমস্তা ছিলেন। সংসারে কেবল স্ত্রী আর এক মেয়ে ছিল। বাবুটি মদ খেতেন, অনেক সময় মাতাল হয়ে স্ত্রীকে প্রহারাদি করতেন, কিন্তু মেয়েটি তাঁর বড় আদরের ছিল। জীবনে একবার ছাড়া আর কখনো তার গায়ে হাত তোলেননি।

তাঁর স্ত্রী সতীসাধ্বী ছিলেন, তাই বছর তিনেক আগে তিনি একদিন স্বর্গে চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে স্বামীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগল। এই আঘাত সত্যি কি ভণ্ডামী বলা যায় না– কিন্তু তাঁর মাতলামি ভারি বেড়ে উঠল। একদিন তিনি জমিদারের নায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করে তার গালে একটি চপেটাঘাত করে বাড়ি ফিরে এলেন। পরদিন সকালে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না, তার বদলে তাঁর ছ'বছরের মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেল। পুলিস তাঁকেই কন্যাঘাতী বলে সন্দেহ করে; কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর কোন সন্ধান পায়নি।

মাঝে মাঝে কানাঘুষো শোনা যায় যে, তিনি কাছেপিঠেই কোথাও লুকিয়ে আছেন; গ্রামের কেউ কেউ তাঁকে অন্ধকার রাত্রে মাঠে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে... কিন্তু সেসব গুজব নিতান্তই বাজে কথা। বাড়িখানা সেই অবধি খালি পড়ে আছে, কেউ ব্যবহার করে না। গ্রামের দু'-একজন সাহসী লোক একবার রাত্রে ঐ বাড়িতে শোবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেইরাত্রেই ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে— তারা বলে বাড়িতে ভূত আছে।

গল্পটার শেষ শুনে বললুম, আমরা কয়েকজন যদি রাত্রে ওখানে শুই, কারুর আপত্তি হবে কি?

ভদ্রলোকটি বললেন, না মশায়, আমাদের সাহস হয় না।

আমি বললুম, আমাদের যদি সাহস হয়, তাহলে আপনাদের হতেই বা বাধা কি? আর সকলের দিকে

ফিরে বললুম, ওহে, তোমরা কেউ ভূতের বাড়িতে শুতে রাজী আছো?

সকলেই ব্যাপার কি জানতে চাইলে— কিন্তু সমস্ত শুনে, আমার মতো দু'-তিনজন ছাড়া আর কেউ রাজী হল না। যা হোক, সন্ধ্যার আগে বৃষ্টি একটু ধরেছে— আমরা বাড়িখানা দেখতে গেলুম। বাড়িতে তালা লাগানো ছিল— সেই ভদ্রলোকটি তার চাবি জোগাড় করে আনলেন।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই ভিতরকার বদ্ধ অন্ধকার যেন বন্যজন্তুর মতো আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। স্যাঁতসেঁতে ভিজা একটা দুর্গন্ধ নাকে এসে ঢুকল। তাড়াতাড়ি পাশের একটা জানলা খুলে দিতেই বাইরের মলিন আলো ম্রিয়মাণভাবে ঘরে ঢুকল। দেখলুম, মেঝের ওপর প্রায় এক ইঞ্চি পুরু ধুলো পড়েছে— কোণে কোণে ঝুল আর মাকড়সার জাল। মোটের ওপর যতদূর নোংরা আর অস্বাস্থ্যকর হতে পারে।

বাড়িতে মাত্র দুটি ঘর, তার মধ্যে একটি শয়নকক্ষ। আসবাবের মধ্যে একটি পুরনো কীটদষ্ট খাট আর তার মাথার কাছে একটি কপাটযুক্ত দেওয়াল-আলমারি। ঘরটি নেহাত ছোট নয়, খিড়কির দিকে একটা জানলাও আছে।

দেখে-শুনে সঙ্গীদের মধ্যে একজন হাসবার চেষ্টা করে বললেন, না হে, আজ রাত্রে আর শোবার দরকার হবে না, তাস-পাশা খেলে কাটিয়ে দেয়া যাবে। কাজ কি বাবা!

ভদ্রলোকটি সঙ্গে ছিলেন, তিনি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আমি বললুম, বেশ, তোমরা তাস-পাশাই খেলো, আমার কিন্তু না ঘুমোলে চলে না।

ভদ্রলোকটিকে বললুম, আপনি দয়া করে একটা চাকর পাঠিয়ে দেবেন, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে বিছানা করে দেবে।

ভদ্রলোকটি এবং সঙ্গীরা ক্ষীণভাবে একবার বাধা দিলেন, কিন্তু আমার জিদ চেপে গেছে দেখে আর কিছু বললেন না।

রাত্রে শুভকর্ম যথাসময়ে শেষ হয়ে গেল। সাড়ে দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে লণ্ঠন হাতে একলা শুতে গেলুম। সন্ধ্যার পর আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল; এখনও সমভাবে চলেছে।

বাড়িতে ঢুকে ভিতর থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলুম, তারপর লণ্ঠন হাতে শোবার ঘরে গেলুম। চাকর বিছানা পেতে মশারি ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, খিড়কির দিকে জানলাটা পূর্ববৎ বন্ধই ছিল। আলো ধরে ঘরখানাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেই ঘরটা অত্যন্ত নিস্তব্ধ বোধ হতে লাগল, বায়ু অভাবে একটু গরমও বোধ হল। জানলাটা ধরে দু'-তিনবার টানাটানি করবার পর সেটা খুলে গেল, তখন আবার ব্যাঙ ও ঝিঁঝি-পোকার কনসার্ট শুনতে পেলুম।

জানলা খুলে ফিরে আসতে পাশে দেয়াল-আলমারিটা পড়ে; কৌতূহল হল, সেটাকেও খুলতে গেলুম— দেখি, মরচে পড়ে সেটাও এঁটে গেছে। জোরে এক টান মারতেই ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে খুলে গেল। ভেতরে দরকারী জিনিস কিছুই নেই, কেবল গোটা পাঁচ-ছয় খালি মদের বোতল গৃহস্বামীর সুরাসক্তির ঐতিহাসিক স্তম্ভের মতো ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে।

শরীর বেশ ক্লান্ত হয়েছিল, তাই আলোটা কমিয়ে খাটের পায়ার কাছে রেখে শুয়ে পড়লুম। শুয়ে শুয়ে রবিবাবুর একটা গল্প বারবার মনে পড়তে লাগল, দু'-একবার গায়ে কাঁটাও দিলে। কিন্তু বেশি ক্লান্ত হয়েছিলুম বলেই হোক বা ভয় বস্তুটা আমার শরীরে কম আছে বলেই হোক, এই ভূতুড়ে বাড়িতে একলা শুয়েও অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লুম।

রাত্রি বোধ করি তখন দুটো কি আড়াইটে হবে, হঠাৎ কানের খুব কাছে একটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনে একেবারে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলুম। দেখি দেয়াল-আলমারি থেকে শব্দটা আসছে।

নিমেষের মধ্যে দারুণ ভয়ে আমার সমস্ত যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধি-বিবেচনা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। এই শব্দটার যে কোন স্বাভাবিক কারণ থাকতে পারে, সেকথা আমার মনের ধার ঘেঁষেও গেল না। সমস্ত চেতনা দিয়ে

অনুভব করতে লাগলুম, সেই শূন্য মদের বোতলগুলো সজীব হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কপাটে ঘা দিচ্ছে। সে-শব্দ আর থামে না। নিশাচর প্রেতযোনির এই নিশীথ উল্লাস ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে সমভাবে সমব্যবধানে চলতেই লাগল। আমি মশারির মধ্যে একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে কাঠ হয়ে বসে রইলুম।

আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ, বাইরে অজস্র বারিপাত— ভিতরে অশরীরীর নৃত্য! আমি আর বিছানার মধ্যে থাকতে পারলুম না, মশারি ছিঁড়ে বাইরে এসে পড়লুম। আলোটা বাড়িয়ে দিতেই ঘরের নিরাভরণ শূন্যতা যেন। আমার চারদিকে দাঁত বার করে হেসে উঠল। অন্ধকার এর চেয়ে ছিল ভাল। মনে হতে লাগল ঐ বোতলগুলো এখনি নাচতে নাচতে আলমারি থেকে বেরিয়ে আসবে। এবং তারপর যে কি কাণ্ড শুরু হবে তা আমার বিধ্বস্ত মস্তিষ্ক দিয়ে কল্পনা করতে পারলুম না।

আমি ছুটে জানলার কাছে গিয়ে সজোরে গরাদ চেপে ধরলুম।

ঠিক এই সময় আকাশের মাঝখানে বিদ্যুৎ চমকালো।

বাইরের সমস্ত দৃশ্যটা এক মুহূর্তে চোখের ওপর মুদ্রিত হয়ে গেল। জানলা থেকে হাত পঁচিশেক দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল— নিম কিংবা তেঁতুল ঠিক ধরা গেল না— সেই গাছের গোড়ায় একটা ভীষণাকৃতি লোক কোদাল দিয়ে প্রাণপণে কোপাচ্ছে। সর্বাঙ্গ বেয়ে জল পড়ছে, পরনে কাপড় আছে কি উলঙ্গ, ঠিক ধরা গেল না।

কৌতূহলে ভয় অনেকটা চাপা পড়ে গেল। আমি আর একবার বিদ্যুতের আশায় বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আবার বিদ্যুৎ! দেখলুম ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, বৃষ্টির দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, লোকটা সমভাবে গাছের গোড়ায় কোদাল চালাচ্ছে, আর সেই কোদালের তালে তালে ঘরের মধ্যে আলমারির ভিতর থেকে শব্দ আসছে— ঝন্‌ঝন্‌, ঝন্‌ঝন্‌। আমার ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল— একবার ভাবলুম ডাকি, কিন্তু যদি চোর হয়! কিংবা হয়তো পাগল!

কোন কিছু স্থির করবার আগেই না বুঝে-সুঝে লণ্ঠনটা জানলার সুমুখে তুলে ধরলুম। বাইরের লোকটাকে সে-আলোতে দেখা গেল না। কিন্তু হঠাৎ আলমারির ঝন্‌ঝনানি বন্ধ হয়ে গেল। শব্দটা এতক্ষণ সয়ে গিয়েছিল, থামতেই বুকের ভিতরটা ধড়াস্‌ করে উঠল। আবার থামে কেন?

শব্দ থামতেই দেয়াল-আলমারির দিকে তাকিয়ে ছিলুম, সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে জানলার দিকে চাইতেই ভয়ে আমার গায়ের রক্ত প্রায় জল হয়ে গেল। লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোতে দেখলুম, ঠিক জানলার ওপারে একটা মস্ত ঝাঁকড়া মাথা, আর তারই ভিতর থেকে দুটো বড় বড় লাল চোখ আমার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে।

আমার হাঁটু দুটো এবং গলার আওয়াজ তখন একেবারে শাসনের বাইরে চলে গেছে। চেঁচামেচি কিংবা পলায়ন দুই সমান অসম্ভব। তাই কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে কেবল ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলুম।

হঠাৎ বাঘের থাবার মতো একজোড়া হাত বাইরের অন্ধকার থেকে উঠে এসে জানলার দুটো গরাদ ধরে টান দিলে। জানলার ঘুণধরা পচা কাঠ অকস্মাৎ ভেঙে গিয়ে গরাদ দুটো বার হয়ে গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্লেদাক্ত গিরগিটির মতো সেই ফাঁক দিয়ে লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে বললে, তুমি কে?

নিজের নামটা পর্যন্ত সাফ ভুলে গিয়েছিলুম, তাই উত্তর দেওয়া হয়ে উঠল না। লোকটা নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর তার মাথার চুলগুলো শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল। সে ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল, তুমি পুলিস!

আমি প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে জানালুম যে আমি পুলিস নই।

আশ্চর্য, লোকটা তখনই অকপটে তাই বিশ্বাস করে মাটিতে বসে পড়ল। কোমরে একটা শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া জড়ানো ছিল মাত্র। একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বললে, তিন মাস মদ খাইনি। বুক ফেটে যাচ্ছে।

আমাকে একটু মদ দিতে পারো? বেশি নয়, একটি গ্লাস!

এমন বুকফাটা মিনতি আর কখনো শুনেছি বলে মনে হয় না। বোধ হল, মদের দুর্নিবার পিপাসা লোকটাকে পাগল করে দিয়েছে। একটা সন্দেহ গোড়া থেকেই আমার মনে উঁকি মারছিল; আমি বললুম, মদ তো নেই, কিন্তু আপনিই কি—?

লোকটা দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, শেষে মাথা তুলে বললে, এই বাড়ির মালিক আমি, নিজের মেয়েকে খুন করে পালিয়ে যাই। গোমস্তাগিরি করতুম, একদিন ঝগড়া করে চলে এলুম। তখন স্ত্রী বেঁচে নেই— শুধু মেয়ে। বাড়ি আসতেই মেয়েটা বললে, বাবা, খেলা করতে করতে পায়ের মল গাছতলায় কোথায় পুঁতে রেখেছিলুম, আর খুঁজে পাচ্ছি না।— মাথায় রাগ চড়েই ছিল, মারলুম মেয়েটার রগে এক চড়, মেয়েটা সেইখানে পড়েই মরে গেল।... সেই থেকে পুলিসের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।— মেয়েটা মরেছে— যাকগে! কিন্তু তার মল ক'গাছা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

এই বলে লোকটা লাফিয়ে উঠে একবার আলমারির দিকে ছুটে গেল। খালি বোতলগুলো পেড়ে পেড়ে মাটিতে আছড়ে ভাঙতে লাগল। তারপর উন্মত্ত একটা চিৎকার করে, যে-পথে এসেছিল সেই পথেই বেরিয়ে গেল। মিনিট দুই ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। তারপর আলমারির কাচের কপাট দুটো সজোরে শব্দ করে উঠল— ঝন্ ঝন্ ঝন্!

বরদা নীরব রইল।

অমূল্য শ্লেষ করিয়া বলিল, 'ব্যাস, এই গল্প? খালি ঝন্ ঝন্ ঝন্!'

বরদা বলিল, 'আর একটু বাকি আছে। শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ চমক ভেঙে গেল। দেখলুম ঘর একেবারে অন্ধকার, আলোটা কখন নিভে গেছে।

'অনেকক্ষণ কান খাড়া করে শুয়ে রইলুম। কিন্তু খোলা জানলা দিয়ে ঝিঁঝির শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে এলো না। শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

'সকালবেলা উঠে দেখি, বালিশের তলা থেকে সোনার ঘড়ি আর মনিব্যাগটা চুরি গেছে।'

১৯১৫

রক্ত-খদ্যোত

সন্ধ্যার সময় প্রাত্যহিক অভ্যাসমতো গুটিকয়েক সভ্য ক্লাবঘরের মধ্যে সমবেত হইয়াছিলাম।

বরদা সিগারেটের ক্ষুদ্র শেষাংশটুকুতে লম্বা একটা সুখটান দিয়া সেটা সযত্নে অ্যাশ্-ট্রের উপর রাখিয়া দিল। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "ভূতের গল্প তোমরা অনেকেই শুনেছ, কিন্তু ভূতের মুখে ভূতের গল্প কেউ শুনেছ কি?"

অমূল্য এক কোণে বসিয়া একখানি সচিত্র বিলাতি মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতেছিল। বলিল, "অসম্ভব একটা কিছু বরদার বলাই চাই।"

বরদা বলিল, "আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। তবে বলি শোন—"

অমূল্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, আজ যে আমাদের সাহিত্য-সভার অধিবেশন। অতুল, তোমার 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র' প্রবন্ধটা তাহলে—"

হৃষী বলিল, "কাল হবে। বস্তুতন্ত্রের চেয়ে বড় জিনিস আজ এসে পড়েছেন। বরদা, তোমার গল্প আরম্ভ হোক।"

অমূল্য অস্থির হইয়া বলিল, "আজ তাহলে বরদার কতকগুলো মিথ্যে কথা শুনেই সন্ধ্যেবেলাটা কাটাতে হবে?"

প্রশান্তকণ্ঠে বরদা বলিল, "কথাটা শুনে তারপর সত্যি-মিথ্যে বিচার করা উচিত। তাহলে আরম্ভ করি। গত বৎসর—"

অমূল্যর নাসারন্ধ্র হইতে একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

বরদা বলিল, "গত বৎসর আমার প্ল্যাঞ্চেটে ভূত নামাবার শখ হয়েছিল, বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। যারা জানে-শোনে, তাদের পক্ষে ভূত-নামানো অতি সহজ ব্যাপার। দরকারী আসবাবের মধ্যে কেবল একটি তেপায়া টেবিল।"

অমূল্য বিড় বিড় করিয়া বলিল, "আর একটি গুলিখোর।"

বরদা ওদিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "একদিন একটা ছোট দেখে তেপায়া টেবিল যোগাড় করে সন্ধ্যের পর আমাদের তেতলার সেই নিরিবিলি ঘরটায় বসে গেলুম— আমি, আমার বউ, আর পেঁচো—"

অমূল্য বলিল, "এই বয়স থেকেই ছোট ভাইটির মাথা খাওয়া হচ্ছে কেন? বউয়ের কথা না হয় ছেড়ে দিই, কারণ যেদিন তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সেদিনই তার যা হবার হয়ে গেছে—"

বরদা বলিল, "পেঁচোকে নেবার কারণ, তিনজনের কমে চক্র হয় না। তাছাড়া সে ছেলেমানুষ, সুতরাং মিডিয়ম হবার উপযুক্ত। সে যাক, মেঝের উপর টেবিল ঘিরে তো বসা গেল— কিন্তু ভাবনা হল কাকে ডাকি! ভূত তো আর একটি-আধটি নয়, পৃথিবীর আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত যত লোকের ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটেছে সকলের দাবি সমান। এখন কাকে ফেলে কাকে ডাকি?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বরদা বলিল, "আমাদের সুভাষকে চেনো তো— জুনিয়র উকিল? তার ভগ্নীপতি সুরেশবাবু হাওয়া বদলাতে এসে গত শীতকালে নিউমোনিয়ায় মারা যান, বোধ হয় তোমাদের স্মরণ

আছে।... অমূল্য, তুমি তো পোড়াতে গিছলে? হঠাৎ সেই সুরেশবাবুকে মনে পড়ে গেল। তখন তিনজনে আলোটা কমিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর আঙুলে আঙুল ঠেকিয়ে সুরেশবাবুর ধ্যান শুরু করে দিলুম। বেশিক্ষণ নয় ভাই, মিনিট পাঁচেক চোখ বুজে থাকবার পর চোখ চেয়ে দেখি পেঁচোটা কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছে,— কশ বেয়ে নাল গড়াচ্ছে, চোখ শিবনেত্র, বিজ বিজ করে কি বকছে! 'কি রে!'— বলে তাকে একটা ঠেলা দিলুম— কাৎ হয়ে পড়ে গেল। বউ তো 'বাবা গো!' বলে আমাকে খুব ঠেসে জড়িয়ে ধরলে।"

হৃষী বলিল, "বস্তুতন্ত্র এসে পড়ছে। এবার আসল গল্পটা আরম্ভ হোক।"

বরদা বলিল, "বুঝলুম ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। পেঁচোকে অনেক প্রশ্ন করলুম, কিন্তু সে জড়িয়ে জড়িয়ে কি যে উত্তর দিলে বোঝা গেল না। বড়ই মুশকিল। তখন আমার মাথায় এক বুদ্ধি গজাল। কাগজ-পেনসিল এনে পেঁচোর হাতে ধরিয়ে দিলুম। পেনসিল হাতে পেয়ে পেঁচো সটান উঠে বসল। উঠে বসে লিখতে আরম্ভ করে দিলে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! পেঁচোর চোখ বন্ধ, মুখ দিয়ে লাল গড়াচ্ছে, আর প্রাণপণে কাগজের ওপর লিখে যাচ্ছে।"

পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া বরদা বলিল, "আবার হাতের লেখা দেখে অবাক হয়ে যাবে, দস্তুরমতো পাকা হাতের লেখা। কে বলবে যে পেঁচো লিখেছে?"

অমূল্য লেখাটা তদারক করিয়া বলিল, "পেঁচো লিখেছে কেউ বলবে না বটে, কিন্তু তোমার লেখা বলে অনেকেরই সন্দেহ হতে পারে।"

বরদা বলিল, "এই লেখা হাতে পাবার পর আমি সুভাষের বাড়ি গিয়েছিলুম। সুরেশবাবুর পুরনো একখানা চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলুম,— অবিকল তাঁর হাতের লেখা। বিশ্বাস না হয় তোমরা যাচিয়ে দেখতে পারো।"

অমূল্য বলিল, "অবশ্য দেখব।"

হৃষী বলিল, "সে যাক্। এখন তুমি কি বলতে চাও, ঐ কাগজের তাড়াটা সুরেশবাবুর প্রেতাত্মার জবানবন্দি?"

বরদা বলিল, "এটা হচ্ছে তাঁর মৃত্যুর ইতিহাস। পুরোপুরি সত্যি কি না সে-কথা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু গোড়ার খানিকটা যে সত্যি তা সুভাষ সেদিন স্বীকার করেছিল।"

"এইবার তবে আসল গল্পটা শোন"— এই বলিয়া বরদা কাগজের তাড়াটা তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।—

যাঁহারা মুঙ্গের শহরের সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে, উক্ত শহরে পিপর-পাঁতি নামক যে বিখ্যাত বীথিপথ আছে, তাহার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার কূলে মুসলমানদের একটি অতি প্রাচীন গোরস্থান আছে। বোধ করি এই গোরস্থানের সব গোরগুলিই শতাধিক বর্ষের পুরাতন। স্থানটি অনাদৃত। কাঁটাগাছ ও জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে অস্থিপঞ্জর প্রকট করিয়া এই কবরগুলি কোনও রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

এই গোরস্থানের এক কোণে একটি কষ্টিপাথরের গোর আছে। এই গোরটি সম্বন্ধে শহরে অনেক ভূতুড়ে গল্প প্রচলিত ছিল। এই সব আজগুবি গল্প শুনিয়া আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ শ্যালক বলিলেন যে, গোরটা সজীব। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে নাকি এক সাহেব ঐ গোর লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিল। গুলির আঘাতে পাথর ফাটিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিয়াছিল। সে রক্তের দাগ এখনও মিলায় নাই, গোরের গায়ে তেমনি শুকাইয়া গড়াইয়া আছে। আর, যে নাস্তিক সাহেব গুলি করিয়াছিল সেও প্রাণে বাঁচে নাই, সেই রাত্রেই ভয়ংকরভাবে তার মৃত্যু হইয়াছিল।

একদিন শীতের সন্ধ্যায় শ্যালককে সঙ্গে লইয়া গোরটি দেখিতে গেলাম। শ্যালক আমারই সমবয়সী, প্রেতযোনিতে অটল বিশ্বাস। আমি কিছুদিন যাবৎ মুঙ্গেরে আসিয়া শ্যালক-মন্দিরেই বায়ুপরিবর্তন করিতেছিলাম। সঙ্গে স্ত্রী ছিলেন।

গোরস্থানের নিকটে গিয়া দেখিলাম স্থানটি কাঁটাগাছের বর্মে প্রায় দুর্ভেদ্য হইয়া আছে। অনেক যত্নে

অনেক সাবধানে পা ফেলিয়া এবং কাপড়-চোপড় বাঁচাইয়া সেই ভূতুড়ে গোরটির সম্মুখীন হইলাম। কালো পাথরের গোর, আপাতদৃষ্টিতে ভৌতিকত্ব কিছুই চোখে পড়িল না।

হঠাৎ, যখন আমরা গোরটির একেবারে নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন সেই কালো পাথরের উপর শায়িত আরও কালো একটা জন্তু বোধ হয় আমাদের পদশব্দে জাগিয়া উঠিয়া, একবার আমাদের মুখের উপর তাহার চক্ষু দুটা মেলিয়া ধরিয়া, আস্তে আস্তে গোরের অন্তরালে মিলাইয়া গেল।

দেখিলাম একটা কুকুর। রঙ কুচকুচে কালো, শরীর যে হিসাবে লম্বা সে হিসাবে উঁচু নয়— পা-গুলা বাঁকা বাঁকা এবং অত্যন্ত খর্ব। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ তাহার চক্ষু দুটা— হল্‌দে রঙের সহিত ঈষৎ রক্তাভ এবং মণিহীন। পলক ফেলিলে মনে হয় যেন অন্ধকার রাত্রে খদ্যোত জ্বলিতেছে।

শ্যালক বলিলেন, “লোকে বলে ঐ কুকুরটাই সাহেবের টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলেছিল।”

আমি বলিলাম, “পঞ্চাশ বছর আগে? কিন্তু কুকুরটাকে তো অত প্রাচীন বলে বোধ হল না।”

আমরা কবরটার একেবারে পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম কুকুরটা যে-স্থানে শুইয়াছিল ঠিক সেই স্থানে পাথরের খানিকটা চটা উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহারই চারি পাশে লাল রঙের একটা পদার্থ শুকাইয়া আছে— হঠাৎ রক্ত বলিয়া ভ্রম হয়। যেন ঐ কুকুরটা সমাধির রক্তাক্ত ক্ষতটাকে বুক দিয়া আগলাইয়া থাকে।

শ্যালক জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রকম বোধ হচ্ছে?”

আমি বলিলাম, “আশ্চর্য বটে। আমার মনে হয় খুব গরম একটা ধাতু দিয়ে এই পাথরে আঘাত করা হয়েছিল, তাতেই এই রকম হয়েছে।”

আমার মন্তব্য শুনিয়া শ্যালক আধ্যাত্মিকভাবে একটু হাসিলেন। বলিলেন, “তা হবে।” কিন্তু তাহা যে একেবারেই হইতে পারে না তাহা তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিতে বেশ বুঝা গেল।

কোনও একটা তর্কাধীন বিষয়ের আলোচনায় মানুষ যখন উচ্চ অঙ্গের হাসি হাসিয়া এমন ভাব দেখায় যেন অপর পক্ষের সঙ্গে তর্ক করাটাই ছেলেমানুষী, তখন অপর পক্ষের মনে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আমারও একটু রাগ হইল। কিন্তু যে-লোক তর্ক করিতে অসম্মত, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। তাই আমি বলিলাম, “আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। এই পাথরটা ভেঙেই দেখা যাক না, ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরোয় কি না। প্রত্যক্ষের বড় তো আর প্রমাণ নেই—”

নিকটেই একখণ্ড পাথর পড়িয়া ছিল, আমি সেটা তুলিয়া লইয়া গোরে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় সেই কুকুরটা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া একটা বিশ্রী রকমের চিৎকার করিয়া উঠিল এবং সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া অত্যন্ত হিংস্রভাবে আমাকে শাসাইয়া দিল।

শ্যালক আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন, “চলে এসো, চলে এসো, কি যে তোমার পাগলামি —”

কুকুরটার আকস্মিক আবির্ভাবে আমার শ্যালক মহাশয় যতটা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাস্তবিকপক্ষে আমি ততটা হই নাই। অথচ একটা হিংস্র কুকুরকে অযথা ঘাঁটানো বিশেষ যুক্তির কাজ নয়। তাই পরীক্ষা-কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া আমরা যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলাম তখন তুমুল তর্ক বাধিয়া গিয়াছে; কুকুরের জীবনের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের শাণিত যুক্তিগুলি শ্যালকের কুসংস্কারের বর্মের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া আসিতেছে।

বাড়ি ফিরিতেই আমার শালাজ এবং যাঁহার সম্পর্কে শালার সহিত সম্বন্ধ তিনি আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিলেন। দু'জনেই নবীনা, বিদুষী— প্রতীচ্যের আলোক তাঁহাদের চোখে সোনার কাঠি স্পর্শ করাইয়াছে— তাঁহারা আসিয়াই আমার পক্ষে যোগদান করিলেন। শ্যালক বেচারির বর্ম তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিল।

তর্কে যে ব্যক্তি হারে তাহার জিদ বাড়িয়া যায়। যুক্তির দিকে তখন আর তাহার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। শ্যালক শেষে চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, “মানতে না চাও, মেনো না; কিন্তু দুপুর রাত্রে একলা ঐ জায়গায় যেতে

পারে এমন লোক তো কোথাও দেখি না।”

শালাজ উৎসাহদীপ্ত চক্ষে কহিলেন, “আচ্ছা, এমন লোক যদি পাওয়া যায় যে যেতে পারে, তাহলে তো মানবে যে, তোমার ভূত শুধু তোমার ঘাড়েই ভর করে আছে— আর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই?”

শ্যালক গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, “একলা রাত্রে সেখানে যেতে পারে এত সাহস কারুর নেই; আর যদি বা কেউ যায়, সে যে ফিরে আসবে এমন কোনও সম্ভাবনা দেখি না।”

আমি বলিলাম, “সকলের সাহস এবং সম্ভাবনা সমান নয়। আমি যেতে প্রস্তুত আছি।”

শ্যালক অতি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া বলিলেন, “তুমি— প্রস্তুত আছ? রাত বারোটার সময় একলা—”

তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না।

আমি হাসিয়া বলিলাম, “নিশ্চয়। খোট্টার দেশে বেশি দিন থাকিনি বলেই বোধ হয় আমার সে সাহসটুকু আছে। তাহলে আজই ভাল। আজ বোধ হয় অমাবস্যা। শাস্ত্র অনুসারে রাজ্যের ভূতপ্রেত দৈত্যদানা আজ সবাই এই মর্ত্যভূমিতে ফিরে এসে দিগ্বিদিকে নৃত্য করে বেড়াবেন। অতএব এ সুযোগ ছাড়া অনুচিত।”

শ্যালক ভীত চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, “গোঁয়ার্তুমি করো না সুরেশ, ভারি খারাপ জায়গা। এ সব বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা নেই—”

তীব্র হাস্যোচ্ছসিত কণ্ঠে শালাজের নিকট হইতে প্রতিবাদ আসিল, “ভয় পাবেন না সুরেশবাবু, আপনার জন্যে একটা খুব ভাল প্রাইজ ঠিক করে রাখলুম। আপনি জয় করে ফিরে এলেই এ-বাড়ির কোনও এক মহিলা তাঁর বিম্বাধরের রক্তিমরাগে আপনার কপালে ললাটিকা পরিয়ে দেবেন। ভূতজয়ী বীরের সেই হবে রাজটিকা।”

আমি উৎসাহ দেখাইয়া বলিলাম, “লোভ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মহিলাটি কে শুনি?”

তিনি হাসিয়া বলিলেন, “তাঁর সঙ্গে কারুর তুলনাই হয় না।”— বলিয়া আমার গৃহিণীর দিকে কটাক্ষপাত করিলেন।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, “ঐ জাতীয় প্রাইজ যদিও আমার ভাগ্যে খুব দুর্লভ নয় (গৃহিণী জনান্তিকে,—‘আঃ—কি বকছ—দাদা রয়েছেন।’), তবু অধিকের প্রতি আমার বিরাগ নেই। তাহলে চুক্তি পাকা হয়ে গেল— আজ রাত্রেই যাব। কিন্তু আমি যে সত্যি সত্যিই কবরের কাছে গিয়েছি, এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে আসিনি, এ কথা শেষকালে আপনাদের বিশ্বাস হবে তো?”

শালাজ অতি দূরদর্শিনী, বলিলেন, “আপনার মুখের কথা আমরা বিশ্বাস করব নিশ্চয়, কিন্তু যাঁকে বিশ্বাস করানো দরকার তিনিই হয়তো করবেন না। অতএব আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। খড়ি দিয়ে গোরের ওপর নিজের নাম লিখে আসতে হবে।”

“তথাস্তু!” গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলাম, “তোমার দাদার প্রেততত্ত্বের মাথায় বজ্রাঘাত করে দিয়ে আসা যাক— কি বলো?”

অল্প দ্বিধাজড়িত হাসি ভিন্ন আর কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

শ্যালক বলিলেন, “ফাজলামি ছাড়ো। আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দিতে পারি না।”

শ্যালকের কথা শুনিলাম না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যত সহজ, পশ্চাৎপদ হওয়া তত সহজ নয়।

রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় গরম জামায় আপাদমস্তক আবৃত করিয়া একটা কড়া গোছের বর্মা চুরুট ধরাইয়া বাহির হইলাম। এতক্ষণে গৃহিণীর মুখ ফুটিল। প্রতীচ্য বিদ্যায় জলাঞ্জলি দিয়া বলিলেন, “থাক্, গিয়ে কাজ নেই।”

আমি হাসিয়া উঠিলাম, “পাগল! ভাই-বোন দু’জনকার ধাত একই রকম দেখছি।”

শ্যালক নিরতিশয় ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "তুমি এমন একগুঁয়ে জানলে কোন্ শালা তর্ক করত!"

এমন বিশ্রী অন্ধকার বোধ করি আর কখনও ভোগ করি নাই। একটা গুরুভার পদার্থের মতো অন্ধকার যেন চারিদিকে চাপিয়া বসিয়া আছে। পথ চলিতে চলিতে পদে পদে মনে হয় বুঝি পরমুহূর্তেই এক চাপ অন্ধকারে ঠোকর লাগিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইব।

চুরুটে লম্বা টান মারিয়া মনে প্রফুল্লতা ও উৎসাহ সঞ্চয় করিতে লাগিলাম। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অজ্ঞাতসারে এমন সতর্ক ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল যে, নিজের পদধ্বনি শুনিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিলাম, মনে হইল কে যেন চুপি চুপি পিছন হইতে আমার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু তথাপি অকারণে ভয় পাইবার পাত্র আমি নই। মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলাম, দ্বিপ্রহর রাত্রির এই অন্ধকার, এই স্তব্ধতা, এই বিজনতা সকলে মিলিয়া আমার আন্তরিক সাহসকে দুশ্ছেদ্য একটা ষড়যন্ত্রের জালে ধীরে ধীরে জড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। একটা অলৌকিক মায়া যেন আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। মাকড়সা যেমন শিকারকে প্রথমে সূক্ষ্ম তন্তুর সহস্র পাকে জড়াইয়া পরে ধীরে ধীরে জীর্ণ করিয়া ফেলে, তেমনি এই অদৃশ্য শক্তি আমার সহজ সত্তাকে ক্রমে ক্রমে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

ক্রমে পিপর-পাঁতি রাস্তার পূর্বপ্রান্তে আসিয়া পড়িলাম। ইহারই অপর প্রান্তে কবরস্থান। রাস্তার দুই পাশে বড় বড় গাছ, মাথার উপর বহু ঊর্ধ্বে তাহাদের শাখা-প্রশাখা মিলিয়াছে। অন্ধকার আরও জমাট বাঁধিয়া আসিল।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের মতো একটা স্পর্শ পাইলাম। শরীরের সমস্ত রোম শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। পরক্ষণেই একটা খুব লঘু পদার্থ পিঠের উপর দিয়া খড় খড় শব্দে নীচে গড়াইয়া পড়িল। বুঝিলাম, ভয় পাইবার মতো কিছু নয়, মাথার উপর যে-ঘনপল্লব শাখাগুলি আলিঙ্গনকে নিবিড় বিচ্ছেদবিহীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই একটি শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছে। আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিতে লাগিলাম।

লম্বা টানের চোটে চুরুটটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অন্য সময়ে হইলে ফেলিয়া দিতাম, কিন্তু আজ সেটাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিলাম না। তাহার অগ্নিদীপ্ত প্রান্তটুকুতে যেন একটু প্রাণের সংস্রব ছিল। এই নিঃসঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যখন সঙ্গীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, তখন ঐ ক্ষীণ রশ্মিটুকুই জীবন্ত সঙ্গীর মতো প্রাণের মধ্যে ভরসা জাগাইয়া রাখিয়াছিল। ওটাকে ফেলিয়া দিলে যে অনেকখানি সাহসও চলিয়া যাইবে তাহা বেশ বুঝিতেছিলাম।

কিন্তু ক্রমে যখন আঙুল পুড়িতে লাগিল তখন সেটাকে ফেলিয়া দিতেই হইল। একবার বেশ ভাল করিয়া টানিয়া লইয়া সম্মুখের দিকে কিছু দূরে ফেলিয়া দিলাম।

ফেলিয়া দিবা মাত্র মনে হইল, যে-আঙুল দুটা দিয়া চুরুট ধরিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কোনও ছিদ্র পাইয়া খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আমার দৃষ্টি ছিল নিক্ষিপ্ত চুরুটটার উপর— সেটা মাটিতে পড়িবামাত্র আগুন ছিট্‌কাইয়া উঠিল। তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। ছিট্‌কানো আগুনটা মধ্যপথে দুটা আকৃতি ধরিয়া পাশাপাশি একসঙ্গে নড়িতে আরম্ভ করিল। মাটি হইতে প্রায় এক হাত উপরে থাকিয়া পরস্পরের চারি আঙুল ব্যবধানে এই ক্ষুদ্র অগ্নিগোলক দুটো একজোড়া লাল জোনাকির মতো সম্মুখ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং মাঝে মাঝে মিট্‌মিট্‌ করিতে লাগিল।

আমার মাথা বোধ হয় গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কি জানি কেন, আমার ধারণা জন্মিল যে, ঐ মিট্‌মিট্‌ করা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দুটা আর কিছুই নয়, দুটা চক্ষু আমার পানে তাকাইয়া আছে; এবং এই চক্ষু দুটার পশ্চাতে একটা খর্বাকৃতি কুকুরের কালো রঙ যে অন্ধকারে মিশাইয়া আছে তাহা যেন মনে স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

চলিতে চলিতে কখন দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলাম লক্ষ্য করি নাই, চক্ষু দুটাও সম্মুখে কিছু দূরে দাঁড়াইল। তারপর কতক্ষণ যে নিষ্পলকভাবে আমার মুখের দিকে দৃষ্টি ব্যাদান করিয়া রহিল জানি না, মনে হইল বহুক্ষণ পরে সেই চক্ষুর পলক পড়িল। তখন সেটা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ

চলিলাম। দেহের উপর তখন কোনও অধিকারই নাই। স্বপ্নে বিভীষিকার সম্মুখ হইতে পলাইবার ক্ষমতা যেমন লুপ্ত হইয়া যায়, আমিও তেমনি নিতান্ত নিরুপায়ভাবে ঐ চক্ষুর পশ্চাদ্বর্তী হইলাম। স্বাধীন ইচ্ছা তখন একেবারে জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, আছে কেবল সমস্ত চেতনাব্যাপী দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ভয়।

কতক্ষণ এই অগ্নিচক্ষুস্মান আমাকে তাহার আকর্ষণ প্রভাবে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল আমার ধারণা নাই। একবার চেতনার অন্তরতম প্রদেশে যেন ক্ষীণ অনুভূতির ছায়া পড়িয়াছিল যে, পাকা রাজপথ দিয়া চলিতেছি না; আর একবার মনে হইয়াছিল বুঝি একটা গাছের মোটা শিকড়ে ঠোক্কর খাইলাম; কিন্তু সেসব আমার ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির বাহিরে।

হঠাৎ একটা বড় রকমের ঠোক্কর খাইলাম। এটা বেশ স্মরণ আছে। তারপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াই নীচের দিকে গড়াইতে শুরু করিলাম। কোথায় পড়িতেছি কোনও ধারণাই ছিল না; অন্ধকারে দেখাও অসম্ভব; কিন্তু এই পতন যে অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে এবং পতনের লক্ষ্যও যে একটা অতলস্পর্শ স্থানে লুকাইয়া আছে তাহা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অথচ কি নিদারুণ সেই পতন! গড়াইতে গড়াইতে এক ধাপ হইতে অন্য ধাপে পড়িতেছিলাম এবং প্রত্যেক স্তরে অবরোহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহের অস্থিগুলা যেন একবার করিয়া ভাঙিয়া যাইতেছিল।

এই অবরোহণের শেষ ধাপে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন জ্ঞান বিশেষ ছিল না, কিন্তু একটা অনন্ত যন্ত্রণার পথ যে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা সমস্ত শরীর দিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মেলিলাম। সেই দেহহীন লাল চক্ষু দুটা আমার মুখের অত্যন্ত নিকটেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন নিরীক্ষণ করিতেছে। দেহের রক্ত তো জল হইয়া গিয়াছিলই, এবার তাহা একেবারে বরফ হইয়া গেল। একটা অসহ্য শীতের শিহরণ সমস্ত দেহটাকে যেন ঝাঁকানি দিয়া গেল। তারপর আর কিছু মনে নাই।

সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে জ্ঞান হইল। কল্যকার রাত্রি যে স্বাভাবিকভাবে কাটে নাই এই চিন্তা লইয়া চক্ষু মেলিলাম। ঘাসের উপর শুইয়া আছি দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে গেলাম— উঃ! গায়ে দারুণ বেদনা। আবার শুইয়া পড়িলাম। তখন ক্রমশ সব মনে পড়িল। ঘাড় না নাড়িয়া যতদূর সাধ্য দেখিয়া বুঝিলাম, পিপর-পাঁতি রাস্তার পাশে পাশে কেল্লার যে শুষ্ক গড়খাই গিয়াছে তাহারই তলদেশে বাবলা গাছের ঝোপের মধ্যে পড়িয়া আছি।

সূর্য উঠিল। এখানে সমস্ত দিন পড়িয়া থাকিলেও কেহ সন্ধান পাইবে না ইহা স্থির। শরীরে তো নড়িবার শক্তি নাই। প্রচণ্ড এক হেঁচকা মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম; চক্ষু হইতে আরম্ভ করিয়া দেহের সমস্ত রোম বেদনায় টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল। কিন্তু বাড়ি গিয়া পৌঁছিতেই হইবে। অসীম বলে মৃতপ্রায় দেহটাকে টানিতে টানিতে কি করিয়া বাড়িতে পৌঁছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার আমার সাধ্য নাই। বাড়ি যাইতেই সকলে চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল এবং উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে আমার ক্ষীণ চেতনা আবার লুপ্ত করিয়া দিবার যোগাড় করিল। শ্যালক সকলকে সরাইয়া দিয়া আমাকে একটা ইজি-চেয়ারে বসাইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সারা রাত কোথায় ছিলে? আমরা সকলে তোমার জন্যে—”

উত্তর দিতে গেলাম, কিন্তু কি ভয়ানক! গলার স্বর একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। শ্যালক আমাকে দুধ ও ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন।

ডাক্তার যখন আসিলেন, তখন বিছানায় শুইয়া আছি— ভয়ানক কম্প দিয়া জ্বর আসিতেছে। স্ত্রী ও শ্যালক মলিন মুখে মাথার শিয়রে বসিয়া আছেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “দুটো লাংসই অ্যাফেক্ট্‌ করেছে— নিউমোনিয়া।”

তারপর আবার অচেতন হইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙিয়া দেখি শরীর বেশ ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে— কোথাও কোনও গ্লানি নাই।

কে একজন পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন বোধ হচ্ছে?”

ফিরিয়া দেখি বিনোদ,— আমার ছেলেবেলার স্কুলের বন্ধু। অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। বলিলাম, “বেশ ভালই বোধ হচ্ছে, ভাই। বুকের ওপর যে একটা ভার চাপানো ছিল সেটা আর টের পাচ্ছি না।”

বিনোদ মৃদু হাসিয়া বলিল, “প্রথমটা ঐ রকম বোধ হয় বটে। আমার যখন কলেরা হয়—”

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল— তাই তো! বিনোদ তো আজ দশ বৎসর হইল কলেরায় মরিয়াছে; আমি স্বহস্তে তাহাকে দাহ করিয়াছি। তবে সে এখানে আসিল কি করিয়া! মহাবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বিনোদ, তুমি তো বেঁচে নেই— তুমি তো অনেক দিন মারা গেছ!”

বিনোদ আসিয়া আমার দুই হাত ধরিল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, “তুমিও আর বেঁচে নেই, বন্ধু!”

১৯২৯

টিকটিকির ডিম

শীতের সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন ক্লাবে বসিয়া রাজনৈতিক আলোচনা করিতেছিলাম, যদিও ক্লাবে বসিয়া উক্তরূপ আলোচনা করা ক্লাবের আইনবিরুদ্ধ। বেহার প্রদেশে বাস করিয়া বাঙালীর ক্লাব করিতে হইলে ঐ রকম গুটিকয়েক আইন খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

আলোচনা ক্রমশ দুইজন সভ্যের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। আমরা অবশিষ্ট সকলে মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলাম।

পৃথ্বী বলিল, যাই বল, গান্ধীটুপি পরলেই দেশভক্ত হওয়া যায় না।

গান্ধীটুপি পরিহিত চুনী বলিল, হওয়া যায়। বাংলাদেশের সাতকোটি লোক যদি গান্ধীটুপি পরে তাহলে অন্তত এককোটি গজ খদ্দর বিক্রি হয়, তার দাম নিদেন পক্ষে ত্রিশ লক্ষ টাকা। ঐ টাকাটা দেশের লোকের পেটে যায়।

পৃথ্বী বলিল, হতে পারে। কিন্তু টুপি পরলে বাঙালীর বিশেষত্ব নষ্ট হয়, তা সে যে-টুপিই হোক। 'লাঙ্গা শির' হচ্ছে বাঙালীর বিশেষত্ব!

চুনী চটিয়া উঠিয়া বলিল, কেবল ঐ বিশেষত্বের জোরে যদি বাঙালী বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে তার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।

দূরে টেবিলের এক কোণে বরদা কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করিল, টিকটিকিকে হাসতে দেখেছ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তার্কিক দু'জনে কিছুক্ষণের জন্য গুম হইয়া গেল; তারপর সবাই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে বরদা বলিল, হাসির কথা নয়। মিথ্যে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলি আমার একটা দুর্নাম আছে; সেটা কিন্তু নিন্দুকের অখ্যাতি। স্রেফ গান্ধীটুপি পরলে দেশ উদ্ধার হয় কিনা বলতে পারি না কিন্তু গয়ায় পিণ্ডি দিলে যে বদ্ধ জীবাত্মার মুক্তি হয় তার সদ্য সদ্য প্রমাণ যদি চাও তো আমি দিতে পারি।

সকলেই বুঝিল একটা গল্প আসন্ন হইয়াছে। অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এইবার গাঁজার শ্রাদ্ধ হবে, আমি বাড়ি চললুম—। দরজা পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দেখ, তোমরা ভাল চাও তো বরদাকে ক্লাব থেকে তাড়াও বলছি; নইলে শুদ্ধ গাঁজার ধোঁয়ায় এ ক্লাব একদিন বেলুনের মতো শূন্যে উড়ে যাবে, বলিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বরদা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সত্যি কথা যারা বলে তাদের এমনিই হয়, যীশুকে তো ক্রুশে চড়তে হয়েছিল। যাক, হৃষী, একটা সিগার দাও তো।

হৃষী বলিল, সিগার নেই। বিড়ি খাও তো দিতে পারি।

বরদা আর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, থাক, দরকার নেই। দেখি যদি আমার পকেটে—

নিজের পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া সযত্নে ধরাইয়া বরদা বলিতে আরম্ভ করিল,— ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে বলতে আমারই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কিন্তু তোমরা যখন শুনবে বলে ঠিক করেছ তখন বলেই ফেলি। দেখ, শুধু যে মানুষ মরেই ভূত হয় তা নয়, পশুপক্ষী এমন কি কীটপতঙ্গ পর্যন্ত মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। তার প্রমাণ আমি একবার পেয়েছিলুম।

এই তো সেদিনের কথা, বড় জোর বছর-দুই হবে।

ছুটির সময়, কাজের তাড়া নেই, তাই নিশ্চিন্ত মনে গী-দ্য মোপাসাঁর গল্পগুলো আর একবার পড়ে নিচ্ছি। আমাদের দেশের অকালপক্ক তরুণ সাহিত্যিকেরা দ্য-মোপাসাঁর দোষটি ষোলো আনা নিয়েছেন কিন্তু তার গুণের কড়াক্রান্তিও পাননি। যাকে বলে, বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর।

সে যাক্। সে-রাত্রে টেবিলে বসে একমনে পড়ছি, কেরাসিনের বাতিটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। হঠাৎ এক সময় চোখ তুলে দেখি একটা প্রকাণ্ড টিকটিকি কখন টেবিলের ওপর উঠে পোকা ধরে খাচ্ছে। টিকটিকিটার স্পর্ধা দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম।

জগতে যত রকম জানোয়ার আছে, আমার বিশ্বাস তার মধ্যে সব চেয়ে টিকটিকি বীভৎস। মাকড়সা, আরশোলা, শুঁয়োপোকা, কচ্ছপ, এমন কি ব্যাং পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু টিকটিকি! জানো, টিকটিকির এক কানের ভেতর দিয়ে আর এক কান পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়? তার ল্যাজ কেটে দিলে ল্যাজটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনা-আপনি লাফাতে থাকে? মোট কথা, টিকটিকি দর্শন মাত্রেই আমার প্রাণে একটা অহেতুক আতঙ্কের সঞ্চার হয়, পেটের ভেতরটা কেমন যেন খালি হয়ে যায়, শিরদাঁড়া শিরশির করতে থাকে। হাসির কথা মনে হচ্ছে কিন্তু তা নয়; ডিউক অফ্ ওয়েলিংটনের বেরাল দেখলে ঐ রকম হত।*

যা হোক, টিকটিকিটাকে আমার টেবিলের ওপর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেখেই আমি তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম, তারপর দূর থেকে তাকে একটা তাড়া দিলুম। সে ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে কট্‌মট্ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সব দাঁতগুলো বার করে একবার হেসে নিলে।

তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করছিলুম যে টিকটিকিকে হাসতে দেখেছ কিনা। কুকুরের হাসি, বেরালের হাসি, শিম্পাঞ্জীর হাসি সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পড়েছি কিন্তু টিকটিকি সম্বন্ধে এরকম একটা জনশ্রুতি পর্যন্ত কোথাও শুনেছি বলে স্মরণ হয় না।

এই টিকটিকিটার মুখে বোধহয় পঞ্চাশ হাজার দাঁত ছিল; তার হাসিটা নিরতিশয় অবজ্ঞার হাসি। সে হাসির অর্থ— দেখেই তো চেয়ার ছেড়ে পালালে, দূর থেকে বীরত্ব ফলাতে লজ্জা করে না।

বড় রাগ হল। একটা টিকটিকি— হোক না সে ছয় ইঞ্চি লম্বা, আমারই টেবিলের ওপর উঠে আমাকেই কিনা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে? ভারী দেখে একটা অভিধান, বোধহয় সেটা ওয়েব্‌স্টারের, হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে তাই দিয়ে টেবিলের কোণায় দমাস্ করে এক-ঘা বসিয়ে দিলুম। টিকটিকিটা বিদ্যুতের মতো ফিরে গোল গোল চোখ পাকিয়ে আমার পানে চেয়ে রইল, প্রায় দু'মিনিট! তারপর আবার সেই পঞ্চাশ হাজার দাঁত বার করে হাসি।

আমার গিন্নী পর্দা ফাঁক করে পাশের ঘর থেকে আমাদের এই শব্দভেদী যুদ্ধ দেখছিলেন, চুড়ির শব্দে চেয়ে দেখি তিনিও নিঃশব্দে হাসছেন। টিকটিকি সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা তিনি আগে থেকেই জানতেন।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। অভিধানখানা হাতেই ছিল, দু'হাতে সেটা তুলে ধরে দিলুম টিকটিকি লক্ষ্য করে টেবিলের ওপর ফেলে!

হুলস্থুল কাণ্ড। ল্যাম্পটা উল্টে গিয়ে ডোম-চিম্‌নি ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। মা রান্নাঘর থেকে শব্দ শুনে রান্না ফেলে ছুটে এলেন; আমার ছোট ভাই পাঁচুর হিন্দুস্থানী মাস্টার বাইরের ঘরে বসে পড়াচ্ছিল, 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' করে চেঁচাতে লাগল।

আমি চিৎকার করে ডাকলুম, রঘুয়া, জল্‌দি একঠো লণ্ঠন লে আও।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেবলি ভয় হচ্ছিল পাছে টিকটিকিটা টেবিল থেকে নেমে এসে আমার পা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করে!

রঘুয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে লণ্ঠন নিয়ে হাজির হল। তখন দেখা গেল, ভাঙা কাচের মাঝখানে, বিরাট অভিধানের তলা থেকে টিকটিকির মুণ্ডটা কেবল বেরিয়ে আছে, ধড়টা পিষে ছাতু হয়ে গেছে। মুণ্ডটা একেবারে অক্ষত, যেন অভিধানের তলা থেকে গলা বাড়িয়ে আমাকে দেখছে আর অসংখ্য দাঁত বার করে একটা অত্যন্ত

পৈশাচিক হাসি হাসছে!

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দু'-চার বার শিউরে উঠল। বীভৎস মৃত দেহটাকে ফেলে দেবার হুকুম দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম। সে রাত্রে আর ভাত খাবার রুচি হল না।

সমস্ত রাত্রি ঘুমের মধ্যে কতকগুলো দুঃস্বপ্ন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, সেগুলোকে চেতনা দিয়ে ধরাও যায় না অথচ কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। সকালে যখন বিছানা ছেড়ে উঠলুম তখন শরীর-মনে প্রফুল্লতার একান্ত অভাব।

বিরস মনে বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ চোখ পড়ল টেবিলের ওপর। দেখি, দু'টি ছোট ছোট ডিম পাশাপাশি রাখা রয়েছে। দেখতে ঠিক খড়ি-মাখানো করমচার মতো। ইতিপূর্বে টিকটিকির ডিম কখনো দেখিনি কিন্তু বুঝতে বাকী রইল না যে এ দু'টি সেই বস্তু। হাঁকাহাঁকি করে চাকরদের জেরা করলুম, কে এখানে ডিম রেখেছে? কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলে না, এমন কি প্রহারের ভয় দেখিয়েও তাদের কাছ থেকে কোনো কথা বার করা গেল না। তখন পেঁচোর ওপর ঘোর সন্দেহ হল। পেঁচোকে নিয়ে পড়লুম, সে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেললে, কিন্তু অপরাধ স্বীকার করলে না। শাস্তি-স্বরূপ তাকে ডিম দু'টো বাইরে ফেলে দেবার হুকুম দিলুম।

এ-যে আমাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে কোনো লোকের বজ্জাতি এই কথাই গোড়া থেকে আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চাবি-দেয়া দেরাজ খুলেও যখন দেখলুম তার মধ্যে শাদা শাদা ক্ষুদ্রাকৃতি দু'টি ডিম বিরাজ করছে তখন কেমন ধোঁকা লাগল। তাইতো! এখানে ডিম কে রাখে?

তারপর দেখতে দেখতে বাড়িময় যেন টিকটিকির ডিমের হরির লুঠ পড়ে গেল। যেদিকে তাকাই, যেখানে হাত দিই, সেইখানেই দু'টি করে ডিম। হঠাৎ যেন জগতের যত স্ত্রী-টিকটিকি সবাই সঙ্কল্প করে আমার চারিপাশে ডিম পাড়তে শুরু করে দিয়েছে।

এমনি ব্যাপার দু'দিন ধরে চলল। মন এমন সন্ত্রস্ত এবং বিভ্রান্ত হয়ে উঠল যে, সহসা কোনো একটা জায়গায় হাত দিতে পর্যন্ত ভয় করতে লাগল, পাছে সেখান থেকে টিকটিকির ডিম বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু সাধারণ পাঁচজনের কাছে এ ব্যাপার এতই অকিঞ্চিৎকর যে মনের কথা কাউকে খোলসা করে বলাও যায় না। টিকটিকির ডিম দেখেছে তার আর হয়েছে কি? এ প্রশ্ন করলে তার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। আমিও নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বিশেষ ফল হল না। বরঞ্চ সর্বদা মনের মধ্যে এই কথাটাই আনাগোনা করতে লাগল যে, এ ঠিক নয়, স্বাভাবিক নয়, কোথাও এর একটা গলদ আছে।

কিন্তু একটা টিকটিকিকে অপঘাতে মেরে ফেলার ফলেই এই সমস্ত ব্যাপার ঘটছে সহজ বুদ্ধিতে একথাও মেনে নেওয়া যায় না। তবে কি এ? অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলুম, সম্ভবত যে টিকটিকিকে সেদিন অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বধ করেছিলুম তারই গর্ভবতী বিধবা বিরহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেবলি ডিম পেড়ে বেড়াচ্ছে। এছাড়া আর যে কি হতে পারে তা ভেবে পেলুম না।

বাড়িতে যখন মন অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা ভাবলুম— যাই ক্লাবে। ছুটির সময়, তোমরা কেউ এখানে ছিলে না; ক্লাব একরকম বন্ধ; তবু চাকরটাকে দিয়ে ঘর খুলিয়ে আলো জ্বালিয়ে এই ঘরেই এসে বসলুম। টেবিলের উপর পাতলা একপুরু ধুলো পড়েছে; অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই-এর কাঠিটা অ্যাশ্-ট্রেতে ফেলতে গিয়ে দেখি, ছাই পোড়া সিগারেটের কুচির মধ্যে দু'টি ডিম।

তৎক্ষণাৎ উঠে বাড়ি চলে এলুম।

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, হাঁ রে, ক'দিন থেকে তোর মুখখানা কেমন শুকনো শুকনো দেখছি— শরীর কি ভাল নেই?

আমি বললুম, হ্যাঁ— ঐ একরকম; বলে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলুম।

ব্যাপার যে ক্রমে ঘনীভূত হয়ে আসছে তাতে আর সন্দেহ নেই। টিকটিকি-বধূর অতি-প্রসবিতা বলে উড়িয়ে দেওয়া আর অসম্ভব। এ আর কিছু নয়— ভূত, ডিমভূত! সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ টিকটিকিটা

প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে; এবং ঐ ডিম ছাড়া আর কিছুতেই যে আমি ভয় পাবার লোক নয়, তা সে তার ভৌতিক বুদ্ধি দিয়ে ঠিক বুঝেছে।

ইতর প্রাণীর ওপর কেন যে আমাদের শাস্ত্রে দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতে আদেশ করে গেছেন এবং কেন যে বুদ্ধদেব সামান্য ছাগলের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন, আমার দৃষ্টান্ত দেখেও সে জ্ঞান যদি তোমাদের না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের অদৃষ্টে কুম্ভীপাক নরক অনিবার্য। আসল কথা, আমার মনে ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হয়েছিল; অনুতপ্ত হয়ে সেই দংষ্ট্রাবহুল গতাসু টিকটিকিকে উদ্দেশ্য করে কেবলি বলছিলুম, হে প্রেত! হে নিরালম্ব বায়ুভূত! যথেষ্ট হয়েছে, এইবার তোমার ডিম্ব সম্বরণ কর!

কিন্তু সম্বরণ করে কে? রাত্রে খেতে বসে ভাত ভেঙেই দেখলুম ভাতের মধ্যে দু'টি সুসিদ্ধ ডিম্ব! কম্পিত কলেবরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। মা বললেন, কি হল, উঠলি যে?

শরীরের প্রবল কম্পন দমন করে বললুম, ক্ষিদে নেই—

বিছানায় শুয়ে শুনতে পেলুম মা বধূকে তিরস্কার করছেন, বোকা মেয়ে, করমচা কখনো ভাতে দিতে আছে! ওর যা ঘেন্নাটে স্বভাব, দেখেই হয়তো না খেয়ে উঠে গেল।

রাত্রে এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখলুম। অপূর্ব এই হিসাবে যে, তার পূর্বে কখনো অমন স্বপ্ন দেখিনি, এবং পরেও আর দেখবার ইচ্ছে নেই।

স্বপ্ন দেখলুম যেন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছি। শোবামাত্র বুঝতে পারলুম যে, বিছানায় চাদর পাতা নেই— তার বদলে আগাগোড়া টিকটিকির ডিম দিয়ে ঢাকা। আমার শরীরের চাপে ডিমগুলো ভেঙে যেতে লাগল আর তার ভেতর থেকে কালো কালো কঙ্কালসার সরীসৃপের মতো লক্ষ লক্ষ টিকটিকির ছানা বেরিয়ে আমার সর্বাঙ্গে চলে বেড়াতে লাগল। প্রাণপণে উঠে পালাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু স্বপ্নে পালানো যায় না। সেইখানে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলুম আর সেই ধেড়ে টিকটিকিটা— যাকে আমি মেরে ফেলেছিলুম — আমার ঘাড় বেয়ে নাকের ওপর উঠে বসে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইল।

গিন্নীর ঠেলায় ঘুম ভেঙে দেখলম, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে এবং তখনো যেন টিকটিকির বীভৎস ছানাগুলো গা-ময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

ভাই, অনেক রকম দুঃস্বপ্ন আজ পর্যন্ত দেখেছি এবং আরো অনেক রকম দেখব সন্দেহ নেই। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা, এমনটি যেন আর দেখতে না হয়।

ভয়ের যে বস্তুটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না, যার ভয়ানকত্ব যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায় না এবং যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোনো জানিত উপায় নেই, সেই বস্তুই বোধ করি জগতে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। ভূতের ভয় ঐ জাতীয়। তাই প্রাণের মধ্যে আমার বিভীষিকা যতই বেড়ে চলল তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার পন্থাটাও আমার কাছে তেমনি অজ্ঞাত রয়ে গেল। কি করব, কোথায় যাব— যেন কোনো দিকেই কিছু কিনারা পেলুম না।

এই রকম যখন মনের অবস্থা তখন একদিন ডাকে একখানা চিঠি এল। শুভেন্দু গয়া থেকে লিখেছে; চিঠি এমন কিছু নয়, "তুমি কেমন আছ, আমি ভাল আছি" গোছের, কিন্তু হঠাৎ যেন আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। মনে হল এ চিঠি নয়— দৈববাণী।

তৎক্ষণাৎ শুভেন্দুকে 'তার' করে দিলুম। আজই যাচ্ছি।

তারপর যথাকালে গয়ায় পৌঁছে টিকটিকির প্রেতাত্মার সদ্‌গতি সঙ্কল্প করে পিণ্ডি দিলুম। গয়াতে আজ পর্যন্ত টিকটিকির পিণ্ডদান কেউ করেছে কি না জানি না, কিন্তু সেই থেকে আমার ওপর আর কোনো উপদ্রব হয়নি।

সেই মায়ামুক্ত জীবাত্মা বোধ করি এখন দিব্যলোকে বৈকুণ্ঠের দেয়ালে উঠে পোকা ধরে ধরে খাচ্ছেন!

১৩৩৬

* বরদা ভুল করিয়াছে ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন নয়— লর্ড রবার্টস।

অন্ধকারে

বছর কয়েক আগে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি একটা রাত্রিতে যে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হইয়া কলিকাতা শহরটা দেখিতে দেখিতে দুই হাত জলের নীচে ডুবিয়া গিয়াছিল তাহা বোধ করি এখনো অনেকের স্মরণ আছে। অবশ্য কলিকাতার জলনিকাশের যেরূপ সুব্যবস্থা তাহাতে শহরের কোনও কোনও অংশে আধ ঘণ্টা বৃষ্টি হইবার পরই এক হাঁটু জল জমিয়া যাওয়া কিছু নূতন নয়। কিন্তু সেবারের দুর্যোগ এতই ভয়ানক হইয়াছিল যে, বোধ করি গত চল্লিশ বছরের মধ্যে এমনটা দেখা যায় নাই। ইলেক্‌ট্রিক তার ছিঁড়িয়া রাস্তায় গ্যাসবাতি নিভিয়া সমস্ত রাত্রির জন্য মহানগরী একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। সত্য-মিথ্যা বলিতে পারি না, কিন্তু শুনিয়াছি সেই এক রাত্রের জন্য একটা মোমবাতির দাম পাঁচ পয়সা হইতে দুই টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

বাদুড়বাগানে আমার বাসা। সেদিন সন্ধ্যাবেলা একটা জরুরী কাজে শহরের উল্টাদিকে হাওড়ার অভিমুখে গিয়াছিলাম। কাজ শেষ করিতে সাতটা বাজিয়া গেল। ফিরিবার পথে চা খাইবার জন্য দর্মাহাটার কাছাকাছি একটা ছোট্ট দোকানে ঢুকিলাম। বাহিরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তায় গ্যাসের আলো কাচের উপরকার বৃষ্টিবিন্দু ভেদ করিয়া ঝাপসাভাবে বাহির হইতেছে। আমার দুর্ভাবনার বিশেষ হেতু ছিল না—সঙ্গে ছাতা ছিল। আরাম করিয়া বসিয়া চা খাইতে লাগিলাম।

দোকানে বেশি লোকজন ছিল না। দুটি লোক— একজন আধবয়সী ও একজন কর্ণমূল পর্যন্ত জুলপি বিশিষ্ট যুবক— অয়েলক্লথ-মোড়া টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া দানীবাবু এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করিবার আপেক্ষিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে উত্তপ্তভাবে আলোচনা করিতেছিল। চা খাওয়া অনেকক্ষণ তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তর্কের ভালরকম নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্যই বোধ করি, তাহারা উঠিতে পারিতেছে না।

যুবক বলিল, ‘জানেন মশায়, শিশির ভাদুড়ী আগাগোড়া বুড়ো আলমগীরের পার্ট করে, একবারও দাঁত বেরোয় না।’

আধবয়সী লোকটি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, ‘ভারী কেরামতি! দাঁত নেই তো বেরুবে কোত্থেকে? আর দাঁত না বেরুলেই বড় অ্যাক্টর হয় নাকি?’

যুবক চটিয়া উঠিয়া বলিল, ‘আপনিও তো বুড়ো হয়েছেন, দাঁত না বার করে একটা কথা বলুন না দেখি।’

তর্ক শুনিতে শুনিতে ও চা খাইতে খাইতে প্রায় মিনিট পনের কাটিয়া গেল। চা শেষ করিয়া দাম দিয়া দোকান হইতে বাহির হইতেছি— যুবক তখন দানীবাবু সম্বন্ধে অত্যন্ত মানহানিকর কথাবার্তা বলিতেছে—এমন সময় সোঁ সোঁ করিয়া একটা উন্মত্ত হাওয়া কোথা হইতে আসিয়া দরজা জানলাগুলাকে আছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। আকাশের দিকে চোখ তুলিতেই নীল রঙের ভয়ঙ্কর আলোতে দু'চোখ একেবারে ধাঁধিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কড়্ কড়্ শব্দে বাজ পড়িয়া কানদুটাকে যেন বধির করিয়া দিল। তাহারি মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম, আকাশের গায়ে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। দিগন্ত ব্যাপিয়া নিকষকালো মেঘের উপর আরও কালো মেঘ জমিয়া যেন নিরেট নিভাঁজ হইয়া গিয়াছে— অন্য জিনিসের একতিল সেখানে জায়গা নাই।

এইবার ভীষণ বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বড় বড় ফোঁটা তির্যক্‌ভাবে নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে পড়িতে শুরু করিল। রাস্তার আলোগুলা জলের পুরু পর্দার অন্তরালে পড়িয়া নিস্তেজ হইয়া গেল, শুধু তাহাদের চারিদিক

হইতে একটা মণ্ডলাকার প্রভা বাহির হইতে লাগিল।

দোকানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম; চাকরটাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'আর এক পেয়ালা চা দাও তো হে!'

মেঘের আকস্মিক ধমকে তার্কিক দু'জনের বিসম্বাদ সহসা থামিয়া গিয়াছিল। তাহারা আবার আরম্ভ করিল, 'দানী ঘোষ যদি ইচ্ছে করে, অমন পাঁচটা শিশির ভাদুড়ীকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে!'

জুলপি বিশিষ্ট ছোকরা কড়া রকম একটা যুক্তি প্রয়োগ করিতে যাইতেছিল, আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'থাক না মশায়! পৃথিবীতে দানী ঘোষ আর শিশির ভাদুড়ী ছাড়া আর কি লোক নেই? অন্য কিছু আলোচনা করুন না।'

জুলপি সিংহবিক্রমে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'চা খাচ্ছেন চা খান। মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করবেন না।'

আমি চা খাইতে লাগিলাম।

ক্রমে আটটা বাজিল। বৃষ্টির বিরাম নাই— সমভাবে সতেজে চলিয়াছে। তার সঙ্গে ঠাণ্ডা এলোমেলো বাতাস। রাস্তার লোক চলাচল কমিয়া আসিল।

নয়টা বাজিল। বাহিরে বৃষ্টি ও ভিতরে তর্ক একভাবে চলিয়াছে। অদ্ভুত একনিষ্ঠা এই দুটি লোকের, তখনো দানী ঘোষ ও শিশির ভাদুড়ীকে লইয়া কামড়াকামড়ি করিতেছে। পৃথিবীতে যেন অন্য প্রসঙ্গ নাই।

সাড়ে নয়টায় আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যে করিয়া হোক রাত্রে বাড়ি পৌঁছিতেই হইবে। কিন্তু যাই কি করিয়া? ছাতায় এ বৃষ্টি আটকাইবে না— পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিজিয়া কাদা হইয়া যাইব। একে আমার সর্দির ধাত— তখন নিউমোনিয়া ঠেকাইবে কে? এই সময় বৃষ্টি আরও চাপিয়া আসিল; হঠাৎ হাওয়ার বেগ যেন বাড়িয়া গেল।

একবার বাহিরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

দোকানের চাকরটা নিস্পন্দভাবে নিবন্ত উনানের পাশে উপু হইয়া দেয়াল-ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। মাথার উপর ধূঁয়ায় মলিন ইলেক্‌ট্রিক্ বাতিটা পীতবর্ণের আলো বিকীর্ণ করিতেছে। বাহিরে আশেপাশের দোকান-পাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে— মোটরের হর্ন ও ট্রামের ঢং ঢং আর শুনা যাইতেছে না।

যুবক বলিল, 'শিশির ভাদুড়ী—'

ঠিক এই সময় হঠাৎ আলো নিভিয়া গেল।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

দোকানের চাকর ভাঙা গলায় বলিল, 'তার ছিঁড়ে গেছে— আজ রাতে আর মেরামত হবে না। দেশলাই দেবেন বাবু— ল্যাম্পোটা জ্বালি!'

অন্ধকারে হাতড়াইয়া দেশলাই দিলাম। ল্যাম্পো জ্বলিল। মিটমিটে আলো ও দুর্গন্ধ ধূঁয়ায় ঘর ভরিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এতক্ষণে প্রথম অন্য কথা কহিলেন, বলিলেন, 'নীলমণি, কেটলিটা আর একবার চড়াও — আর এক পেয়ালা চা হোক।'

জুলপিধারী যুবক তীব্রভাবে আমার দিকে একবার তাকাইয়া গর্বিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'সিগারেট আছে?'

আমি পকেট হইতে সিগারেট কেসটা বাহির করিয়া দিলাম। গোটা কয়েক সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া যুবক কেসটা তাচ্ছিল্যভরে আমায় ফেলিয়া দিল। তারপর এমনভাবে আমার দিকে পিছু করিয়া বসিল, যেন আমার বাঁচিয়া থাকার সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে— আর আমি কাহারও কোনও কাজেই লাগিব না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি বাহিরের দিকে একটা উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'এ বৃষ্টিতে বেরুনো যাবে না। গ্যাসগুলোও নিভে গেছে দেখছি। যা বাবা!' বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে আবার সেই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় প্রসঙ্গ

আরম্ভ করিলেন।

আমিও বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলাম— সত্যই তো! রাস্তার গ্যাস-বাতি একটাও জ্বলিতেছে না। চারিদিকে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, কোথাও জনমানব নাই। কেবল অবিশ্রান্ত বারি পতনের ঝুপ্‌ঝুপ্ ঝম্‌ঝম্ শব্দ।

আর এক পেয়ালা চা খাইলাম। প্রৌঢ় লোকটি বলিলেন, 'আজ রাত্রে বাড়ি যাওয়া হল না দেখছি। নীলমণি, বিষ্টি থামলে আমাকে তুলে দিও।' বলিয়া বেঞ্চির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। যুবক কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সিগারেট টানিতে লাগিল।

কিন্তু আমার তো বেঞ্চির উপর রাত কাটাইলে চলিবে না, বাড়ি যাওয়াই চাই। বাড়িতে স্ত্রী দুটি ছেলেমেয়ে লইয়া একলা আছেন। ঝিও হয়তো বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। অথচ বৃষ্টি না ধরিলে যাই বা কেমন করিয়া?

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি— এগারোটা!

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাকের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে একটা অনৈসর্গিক শব্দ বাহির হইতেছে। যুবক স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাঁহার ঘুম ভাঙিলেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।

রাত্রি যত গভীর হইতেছে, আমার মনের উদ্বেগ ও অস্থিরতা ততই বাড়িতেছে। এদিকে ঝড়বৃষ্টির উদ্দাম নৃত্যে কিছুমাত্র শ্রান্তির লক্ষণ নাই।

ঘড়ির কাঁটা সরিয়া সরিয়া পৌনে বারোটায় পৌঁছিল। নীলমণির ল্যাম্পোর জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। সে উঠিয়া বাতিটা একবার নাড়িয়া বলিল, 'তেল ফুরিয়ে গেছে— আর পাঁচ মিনিট।'

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাসিকা-নিঃসৃত একটি ধ্বনি অর্ধপথে রুখিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ, থেমেছে?'

নীলমণি বলিল, 'না বাবু, আলো নিভে যাচ্ছে।'

'ওঃ,' বলিয়া নিরুদ্বেগে প্রৌঢ় আবার শুইবার উপক্রম করিলেন।

শিকার ফস্কায় দেখিয়া যুবক বলিল, 'আমি তখন বলছিলুম শিশি—'

আমার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। চিৎকার করিয়া বলিলাম, 'খবরদার বলছি! ফের যদি ওদের নাম করেছ ছোকরা, তোমার জুলপি ছিঁড়ে নেব।'

আমার এই আকস্মিক উগ্রতায় যুবক ও প্রৌঢ় দু'জনেই স্তম্ভিতবৎ আমার মুখের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিল।

নীলমণি ভগ্নস্বরে কহিল, 'বিষ্টি ধরে আসছে বাবু, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন। আমি দোকান বন্ধ করি।'

সাগ্রহে বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখি সত্যই বৃষ্টির বেগ প্রায় অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে— ঝড়ও যেন থামিয়াছে। একাদিক্রমে পাঁচ ঘণ্টা দাপাদাপি করিয়া বুঝি তাহারা অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ছাতাটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আর দেরি নয়। যাইতে হয় তো এই সময়।

পশ্চাৎ হইতে যুবকের কণ্ঠস্বর আসিল, 'মশায়, দেশলাই-এর গোটাকয়েক কাঠি দেবেন কি?'

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। এই সময় পিছু ডাক! পকেট হইতে দেশলাই-এর বাক্সটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ল্যাম্প দপ্ দপ্ করিয়া দু'বার খাবি খাইয়া নিভিয়া গেল।

কি অন্ধকার! একটা প্রকাণ্ড শহর বর্ষার রাত্রিকালে সহসা আলোকহীন হইয়া গেলে যে কিরূপ ভয়ানক অন্ধকার হয়, তাহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। খুব শক্ত করিয়া চোখ বাঁধিয়া দিলে কিংবা অন্ধ করিয়া দিলেও বোধ করি এর চেয়ে বেশি অন্ধকার হয় না। নিষ্পলক চক্ষু দুটা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বিস্ফারিত হইয়া থাকে— এবং অন্য ইন্দ্রিয়গুলা অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সতর্ক হইয়া উঠে।

প্রথম ঝোঁকে খুব খানিকটা চলিয়া আসিয়া থমকিয়া পড়িলাম। কোথায় যাইতেছি— কোন্ দিকে

যাইতেছি? বাড়ি গিয়া পৌঁছিবার একান্ত আগ্রহে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু এই বিদ্‌ঘুটে অন্ধকারে পথ চিনিয়া যাইব কি প্রকারে? দোকান হইতে বাহির হইয়া ঠিক যে কোন্ মুখে আসিয়াছি তাহাও স্মরণ করিতে পারিতেছি না। হয়তো বা যেদিকে বাড়ি তাহার উল্টা পথেই গিয়াছি। এখন উপায়!

কিন্তু পথের মাঝখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। যে দিকে হোক চলা দরকার, যদি এমনিভাবে চলিতে চলিতে কোথাও একটা আলো বা মানুষের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং আবার সম্মুখ দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বৃষ্টি ও ঝড় ক্রমে কমিয়া কমিয়া একটা বিষাদপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া থামিয়া গেল। তখন এই অন্ধকারের বুকের উপর আর একটা জিনিস চাপিয়া বসিল— সেটা এই মধ্যরাত্রির ভয়াবহ নীরবতা। এতক্ষণ বৃষ্টির ঝপ্ ঝপ্ শব্দ ও বাতাসের গোঙানিতে যাহা চাপা ছিল, এখন তাহা উলঙ্গ মূর্তি ধরিয়া দেখা দিল। পৃথিবীর সব মানুষ যেন মরিয়া গিয়াছে, শুধু আমি একা বাঁচিয়া আছি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি একা— একেবারে নিঃসঙ্গ।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিলাম। মনের গূঢ়তম প্রদেশে বোধ করি এই আকাঙক্ষাটাই দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল যে মানুষ চাই, সঙ্গী চাই, কোনও প্রকারে এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। কিন্তু বেশি দূর যাইতে হইল না। খানিক দূর গিয়াই প্রচণ্ড একটা হোঁচট লাগিয়া হুমড়ি খাইয়া একেবারে এক কোমর জলের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। ছাতাটা হাত হইতে কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম,— না, এক কোমর নয়, তবে জল এক হাঁটু বটে। আন্দাজে বুঝিলাম বোধ হয় এতক্ষণ ফুটপাথে চলিতেছিলাম, এবার রাস্তায় নামিয়াছি। কিন্তু এই অবতরণটি যেমন সুখকর নয়, ফুটপাথে ফিরিয়া যাওয়াও তেমনি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ ফুটপাথ যে কোন্ দিকে তাহা জলে পতনের সঙ্গে সঙ্গে গুলাইয়া গিয়াছে।

পাঁচ ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি হইবার পর যে রাস্তায় জল জমিতে পারে এ সম্ভাবনাটা তখন পর্যন্ত মাথায় আসে নাই। কিন্তু ভগবান যখন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন, তখন দুশ্চিন্তা হইল— না জানি কোথায় অথৈ গভীর জল আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, হয়তো এক পা অগ্রসর হইলেই হুস্ করিয়া ডুবিয়া যাইব!

এক হাঁটু জলের মধ্যে এক পা এক পা করিয়া সাবধানে অগ্রগামী হইতে লাগিলাম। বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। হায় ভগবান! এ আমার কি দুর্দশা করিলে। কেন মরিতে আজ ঘরের বাহির হইয়াছিলাম। যদি বাহির হইয়াই ছিলাম তবে চায়ের দোকানে রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম না কেন?

কিন্তু পশ্চাত্তাপে কোনও ফল হইবে না। আমি মাথা ঠাণ্ডা করিয়া একটু ভাবিতে চেষ্টা করিলাম— এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিত। প্রথমত কোনও রকমে ফুটপাথে ওঠা চাই— মাঝ রাস্তায় জলের মধ্যে দিয়া দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গেলেও কোনও একটা লক্ষ্যে পৌঁছানো যাইবে না। ফুটপাথে উঠিতে পারিলে, কোনও একটা বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়া লোক জাগাইয়া রাত্রির মতো আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে কিংবা অন্য কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব। মোট কথা যে উপায়েই হোক, নরলোকের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করা দরকার। এই অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে বেশি নয়, আপাতত একটা মানুষের দেখা পাইলেও যে সাক্ষাৎ চাঁদ হাতে পাইব তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

শামুকের মতো হাঁটিয়া হাঁটিয়া কিন্তু কোনও দিকেই এমন একটা বিশিষ্ট কিছু ধরিতে পারিলাম না যেখান হইতে আমার যাত্রাটাকে সুনিশ্চিত করিতে পারি। এক হাঁটু জল কখনো কমিয়া আধ হাঁটুতে নামিতেছে, কখন উরুত পর্যন্ত পৌঁছিতেছে। এ ছাড়া, দিগ্‌দর্শন করিবার কিংবা আবার যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবার আর কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিহ্নই নাই।

সৃষ্টির প্রথম জীব বোধকরি এমনি অন্ধভাবে প্রলয়পয়োধির অতলতলের মহা স্তব্ধতার মধ্যে অদৃষ্ট পরিচালিত হইয়া হাঁটিয়া বেড়াইত; এবং আবার মহাপ্রলয়ের দিন যখন সূর্যচন্দ্রের আলো নিভিয়া যাইবে,

তখন সৃষ্টির শেষ জীব এমনি নিরুপায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে।

এইভাবে কতক্ষণ চলিয়াছিলাম বলিতে পারি না— সময়ের ধারণাও এই ঘোর নীরবতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের আঙুলে একটা শক্ত বস্তু ঠেকিল। অনুভবে সিঁড়ির ধাপের মতো বোধ হইল। তাহার উপর উঠিয়া দু'চার পা এদিক ওদিক ঘুরিবার পর বুঝিলাম এতক্ষণে আমার সেই ঈপ্সিত ফুটপাথে পৌঁছিয়াছি।

যাক্— তবু তো কিছু পাইয়াছি! দুই হাত বাড়াইয়া হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে কিছুক্ষণ চলিলাম। একটা ভিজা দেয়াল হাতে ঠেকিল। তখন সেই দেয়াল ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুকাল এইভাবে যাইবার পর কাঠের দরজায় হাত পড়িল। সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিলাম— এতক্ষণে বুঝি দুঃখ সাগরে কূল মিলিল।

দরজায় সজোরে ধাক্কা দিলাম। তারপরে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম— 'কে আছ দোর খোল' 'মশায়, দয়া করে একটিবার দোর খুলুন' 'ওহে কেউ শুন্‌তে পাচ্ছ, একবার দরজাটি খুলবে?' কিন্তু কোথায় কে? দরজা যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি বন্ধই রহিল। বাড়ির ভিতর হইতে কোনও জবাব আসিল না। শুধু আমার আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠস্বর কোথাও আশ্রয় না পাইয়া একটা নিঃসঙ্গ প্রেতযোনির মতো এই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে গুমরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পূর্ববৎ দেয়াল ধরিয়া আবার আর একটা দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি করিলাম, কিন্তু কোনই ফল হইল না। দরজা খুলিল না,— এমন কি দরজার অন্তরালে কোথাও যে লোক আছে, তাহার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। আরও দুই-তিনটা দরজা এমনিভাবে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং— ফলের কোনও তারতম্য হইল না।

শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল,— মনও উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীন হইয়া গেল। যদি কলিকাতার সবাই মরিয়া গিয়া থাকে, তবে আমার বাঁচিয়া থাকিয়াই বা লাভ কি? এখন কোথাও একটু শুইবার জায়গা পাইলে আর কিছুরই আমার দরকার নাই। জলের মধ্যে হাঁটিয়া হাঁটিয়া পা দুটা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে— যদি মরিতেই হয় তবে কোনও একটা শুষ্ক স্থানে পা ছড়াইয়া শুইয়া মরিতে পারিলেই ভাল।

কিন্তু পা ছড়াইয়া শুইবার মতো স্থান এই প্রলয়-প্লাবিত কলিকাতা শহরটার মধ্যে কোথায় পাওয়া যায়? ফুটপাথের ওপরেও তো প্রায় এক ফুট জল!

যা হোক, এরকমভাবে হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। মন যতই অবসাদে ডুবিয়া যাইতে চাহিল, ততই তাহাকে জোর করিয়া চাঙ্গা করিয়া তুলিতে লাগিলাম। একটা কিছু সুরাহা হইবেই। এমন কখনো হইতে পারে যে কোনও বাড়ির লোক সাড়া দিবে না? হয়তো এখনই একটা বিলম্বিত ভাড়াটে গাড়ি কিংবা একজন আলোকধারী পথিক আসিয়া পড়িবে।

হঠাৎ আমার মনে একটা দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কোনও অভাবনীয় উপায়ে অন্ধ হইয়া যাই নাই তো! নহিলে একি সম্ভব যে এতক্ষণ ধরিয়া এই দু'চক্ষে একটা কোনও কিছুই দেখিতে পাইতেছি না? এত অন্ধকার কি হইতে পারে? হয়তো সেই যখন জলে পড়িয়া গিয়াছিলাম—

দু'চক্ষু সজোরে কচলাইতে আরম্ভ করিলাম— কিন্তু চক্ষুর দুর্ভেদ্য তিমির দূর হইল না। হঠাৎ মনে হইল দেশলাই জ্বালিয়া দেখি না কেন! দু'পকেট খুঁজিলাম, দেশলাই নাই। দেশলাই যে জুলপিকে দিয়া আসিয়াছি, তাহা তখন কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না।

যেন পাগলের মতো হইয়া গেলাম। অন্ধ হইয়া গিয়াছি কিনা এ সন্দেহটা তখনি যেমন করিয়া হোক ভঞ্জন করিতেই হইবে— মুহূর্ত বিলম্ব সহে না! আর একটা দরজার সম্মুখে গিয়া দু'হাতে তক্তার উপর চাপড়াইতে লাগিলাম, 'ও মশায়, কে আছেন একটিবার দোর খুলুন না। ও মশায়!'

পিছন হইতে শান্তস্বরে কে বলিল, 'মিছে চেঁচামেচি করছেন— এখানে কি লোক আছে যে উত্তর দেবে! এগুলো সব দোকান।'

আমি যেন আঁতকাইয়া উঠিলাম; 'অ্যাঁ—কে—কে—কে?'

'কোনও ভয় নেই, আসুন আমার সঙ্গে। আমার হাত ধরুন।'

আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। একখানা হাত— বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা— আমার আঙুলগুলা চাপিয়া ধরিল। আমার পা হইতে চুলের ডগা পর্যন্ত যেন একবার অসহ্য শীতে কাঁপিয়া উঠিল। দাঁতে দাঁতে ঠুকিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতে লাগিল।

আমি বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি কি অন্ধ হয়ে গেছি?'

ছোট্ট একটি হাসির শব্দ হইল।

'না, ভারি অন্ধকার তাই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। ভয় পাবেন না, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

আমি বলিলাম, 'আমার বাড়ি বাদুড়বাগানে।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। অদৃশ্য আগন্তুক স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে আমাকে সব রকম বাধা-বিঘ্ন বাঁচাইয়া লইয়া চলিল। আমার বুদ্ধিশক্তি ক্রমশ ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, এই অন্ধকারে আপনি তো বেশ দেখতে পাচ্ছেন!'

কোনও উত্তর পাইলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি দর্মাহাটার একটা দোকানে চা খেতে ঢুকেছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে কোথায় এসে পড়েছিলাম, বলতে পারেন!'

উত্তর হইল, 'আপনি নিমতলা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।'

নিমতলা ঘাট! সর্বাঙ্গের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ দুইজনে নিস্তব্ধ।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কে? আপনার নাম কি?'

'আমার নাম— শুনে আপনার লাভ নেই। —এদিক দিয়ে ঘুরে আসুন, ওখানে একটা ম্যানহোল খোলা আছে। জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? ওর মধ্যে যদি আপনি গিয়ে পড়েন তাহলে আর—'

সভয়ে সরিয়া আসিলাম।

অল্পকাল পরে আমার দিব্যচক্ষুষ্মান পথ-প্রদর্শক বলিল, 'অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। শহরের মাঝখানে, ঠন্‌ঠনের কালীবাড়ি ঘিরে প্রায় দেড় মানুষ জল জমেছে। আপনি সে পথ দিয়ে যেতে পারবেন না।'

আমি নিঃশব্দে পথ চলিলাম। মিনিট পাঁচেক পরে বলিলাম, 'কলকাতা শহরটা মনে হচ্ছে যেন শ্মশান হয়ে গেছে। কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, মানুষ নেই—'

'ও রকমটা মনে হয়। শহরের প্রাণ হচ্ছে তার রাস্তাঘাট। সেখানে মানুষ না থাকলে শ্মশান আর শহরে কোনও তফাৎ থাকে না।'

আমি কতকটা নিজের মনেই বলিলাম, 'মনে হচ্ছে যেন এটা ভূতের রাজ্য।'

হাসির শব্দ হইল।

'এই রকম রাত্রে ভূতেদের ভারি ফুর্তি হয়— কি বলেন?— আচ্ছা, আপনি যখন একলা দরজা হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন যদি একটা ভূতের সঙ্গে দেখা হত, আপনি কি করতেন বলুন দেখি?'

'কি করতাম? বোধহয় দাঁতকপাটি লেগে মারা যেতাম।'

'হা হা হা হা! ভাগ্যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আচ্ছা, ভূতকে এত ভয় কিসের বলুন দেখি? একটা লোক মরে গেছে বৈ তো নয়?'

'বলেন কি মশায়! ভূত হল গিয়ে একটা— প্রেতাত্মা। তার চালচলন রীতিনীতি স্বভাবচরিত্র কিছুই জানা নেই— ভয় করবে না?'

'তা বটে।— আচ্ছা, মনে করুন—না থাক—'

আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল। এ কাহার হাত ধরিয়া চলিয়াছি?

তবু মনে সাহস আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, 'আপনার নাম তো বললেন না। কোথায় থাকেন বলবেন কি?'

'কোথায় থাকি? যেখানে দেখা হয়েছিল, তারই কাছাকাছি থাকি।'

'আজ আমার যে উপকার করলেন, জন্মেও তা ভুলব না। আবার আমাদের দেখা হবে নিশ্চয়!'

'দেখা— বোধ হয়— আর হবে না— তবে যদি আবার কখনো এমনি বিপদে পড়েন— হয়তো...'

'আচ্ছা, আপনি কি করেন? কোনও কাজকর্ম করেন নিশ্চয়— তাও কি বলতে দোষ আছে?'

'আমি কিছু করি না, এমনি ঘুরে বেড়াই— বেকার।'

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ।...

'আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়ে সব ভাল আছে— কোনও ভাবনা নেই।'

আমি চমকাইয়া উঠিলাম।

'আপনি আমার মনের কথা জানলেন কি করে?'

আবার হাসির শব্দ হইল।

'এ রকম অবস্থায় পড়লে মানুষের মনে স্বভাবত কি চিন্তা আসে তা আন্দাজ করা কি খুব শক্ত?'

'না— তা বটে। কিন্তু— কিন্তু— আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে আছে, আপনি জানলেন কি করে?'

'ওটাও আন্দাজ।'

দীর্ঘ নীরবতা। এ কে? কোন্ জগতের অধিবাসী?

আমি মরীয়া হইয়া আরম্ভ করিলাম, 'দেখুন—'

'ওকথা জিজ্ঞাসা করবেন না।'

আমার সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, 'আ— আ— আমায় ছেড়ে দিন— আমি—' গলা দিয়া আর আওয়াজ বাহির হইল না।

'ভয় পাবেন না— এতক্ষণ যখন এসেছেন, তখন আরও খানিকটা আসুন। আপনার বাড়ি প্রায় এসে পড়েছে।'

পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতে লাগিল, গলা এমনভাবে বুজিয়া গেল যেন শত চেষ্টা করিয়াও একটা কথা পর্যন্ত বলিতে পারিব না। বরফের মতো হাতখানা আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

সহসা শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিল। সে দাঁড়াইল, আমার হাত ছাড়িয়া দিল।

'এইবার আপনি একলাই যেতে পারবেন। এখান থেকে গুণে একশ' পা এগিয়ে যান, গিয়ে ডানদিকে ফিরলে সামনেই পাবেন— সেই আপনার বাড়ি। ভোর হয়ে আসছে,— এবার আমাকে যেতে হবে।'

আমি অর্ধমূর্ছিতের মতো নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পুনরায় হাসির শব্দ হইল। কিন্তু এবার যেন শব্দটা বড় ব্যথাপূর্ণ।

সে বলিল, 'আপনি বড় ভয় পেয়েছেন। আচ্ছা চললাম তবে, এই নিন আপনার ছাতা, জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। ভোর হতে আর দেরি নেই— আচ্ছা— বিদায়।' শেষ কথাটা যেন গভীর দীর্ঘশ্বাসের মতো মিলাইয়া গেল।

আমি আমার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আছেন কি?'

উত্তর আসিল না।

মুখ তুলিয়া দেখিলাম— অতি দূরে পূর্ব আকাশের পুঞ্জিত মেঘ ভেদ করিয়া অল্প একটুখানি ফ্যাকাসে আলো দেখা দিয়েছে।

মরণ-ভোমরা

বড়দিনের ছুটি শেষ হইতে আর দেরি নাই। গত কয় দিন হইতে পছিয়াঁ বাতাস দিয়া দুর্জয় শীত পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর আমরা মাত্র তিনজন ক্লাবের সভ্য চারিদিকের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া চিম্‌নির গন্‌গনে আগুনের সম্মুখে বসিয়াছিলাম। বাহিরের আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ও প্রবল বায়ু মিলিয়া একটা দুর্যোগ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল।

অমূল্য বলিল, "আজ আর কেউ আসছে না, চলো বাড়ি ফেরা যাক। তিনজনে ভূতের মতো বসে থেকে কোনও লাভ নেই— চারজন হলেও না হয় বৃজ্ খেলা যেত।"

বরদা স্তিমিতনেত্রে আগুনের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। কতকটা যেন অন্যমনস্কভাবেই বলিল, "সেবারে এই ডিসেম্বর মাসে কসৌলী গিয়েছিলুম— বাপ! কী শীত! মাথার ঘিলু পর্যন্ত জমে যাবার উপক্রম। পালিয়েই আসতুম— যদি না একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে সব ওলট্-পালট্ করে দিত।— আচ্ছা, কত বড় গঙ্গাফড়িং তোমরা দেখেছ বলো দেখি?"

অমূল্য বলিল, "হুঁ, আষাঢ়ে গল্প ফাঁদবার মতলব। ওসব চালাকি চলবে না বরদা, আমি উঠলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কসৌলী গিয়েছিলে কেন?"

বরদা বলিল, "কুকুরে কামড়েছিল; সেই কথাই তো—"

অমূল্য বলিল, "জানি, সে বিষ এখনও তোমার শরীর থেকে বেরোয়নি। আমি আর এখানে থাকছি না, তোমার গঙ্গাফড়িং নিয়ে তুমি থাকো।"

অমূল্য উঠিয়া পড়িল, শালখানা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া ঘোমটার মতো করিয়া মাথায় দিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বার বন্ধ ছিল, ঠেলা দিয়া খুলিয়াই অমূল্য চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "কে রে!"

"মশায়, আসতে পারি কি?"

অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া দেখিলাম, ওভারকোট ও মাঙ্কি-ক্যাপে সর্ব অবয়ব আচ্ছন্ন করিয়া একটি লোক দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। মুখচোখ কিছুই দেখা গেল না, শুধু ব্যালাক্লাভা ও ওভারকোটের কলারের অন্তরালে একজোড়া কালো গোঁফের আভাস পাওয়া গেল মাত্র।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান?"

লোকটি বলিল, "এইটি কি বাঙালীদের ক্লাব?"

বরদা আহ্বান করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আসুন, ভেতরে এসে বসুন। অমূল্য, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসো হে, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।"

লোকটি ঘরে আসিয়া প্রথমে মাঙ্কি-ক্যাপ ও পরে ওভারকোট খুলিয়া চেয়ারের পিঠের উপর রাখিল, তখন প্রকাণ্ড খোলের ভিতর হইতে অতি ক্ষুদ্র শামুকের মতো তাহার চেহারাখানা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মানুষ যে এত শীর্ণ হইয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা এই লোকটিকে না দেখিয়া ধারণা করা কঠিন। বয়স বোধ করি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশি নয়, কিন্তু কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি বা মানসিক দুশ্চিন্তা তাহার নিরতিশয় ক্ষীণ শরীরটির প্রত্যেক অবয়বে যেন জরার ছাপ মারিয়া দিয়াছে। মাংসহীন মুখের উপর ঘনকৃষ্ণ একজোড়া গোঁফ মুখখানাকে আরও শুষ্ক শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছে। কপালে গভীর কালো রেখা— মুখের রঙ ফ্যাকাসে

পীতবর্ণ। মাথার দুই পাশে বড় বড় একজোড়া কান যেন পাখা মেলিয়া উড়িবার উপক্রম করিতেছে। তাহার মুখের সমস্ত প্রত্যঙ্গই মৃত বলিয়া মনে হয়— কেবল কালিমাবেষ্টিত বড় বড় দুইটা চক্ষু যেন দেহের শেষ প্রাণশক্তিটুকু হরণ করিয়া জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে।

অজীর্ণ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির তাড়নায় যাঁহারা শীতকালে সুজলা বাংলাদেশের মায়া কাটাইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে এই ধরনের চেহারা দুই-একটা যে দেখি নাই এমন নয়। বুঝিলাম, ইনিও একজন স্বাস্থ্যান্বেষী বায়ুভুক্ জীব। মনে মনে ভাবিলাম, কেবলমাত্র মুঙ্গেরের জলহাওয়া এই কঙ্কালে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে কি? ঘোর সন্দেহ হইল।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি ক্লাবের কোনও সভ্যকে খুঁজছেন?”

লোকটি একবার আমাদের তিনজনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার গোঁফজোড়া নড়িয়া উঠিল। তারপর অদ্ভুত রকমের একটা হাসি হাসিয়া বলিল, “তা হতেও পারে, এখনও ঠিক বলতে পারছি না।”

আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম। লোকটি পুনশ্চ বলিল, “আমি এ শহরে নবাগত। আজ তিন দিন হল এসেছি— ডাকবাংলোয় আছি; কিন্তু এ ক'দিন বাঙালীর সঙ্গে কথা না কয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি, মশায়। আজ সন্ধ্যেবেলা বেয়ারার কাছে খবর পেলুম, এখানে বাঙালীদের একটা ক্লাব আছে, তাই খোঁজ করতে করতে এসে হাজির হয়েছি। আর থাকতে পারলুম না।”

আমি বলিলাম, “বেশ করেছেন। যতদিন থাকেন নিয়মিত আসবেন, আমরা খুব খুশি হব। তা— স্বাস্থ্য উপলক্ষে এখানে আসা হয়েছে বুঝি?”

লোকটি বলিল, “না, স্বাস্থ্য তো আমার বেশ ভালই।”— কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটা তুলিয়া বলিল, “সে জন্যে নয়, মশায়; মৃত্যু আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই ভারতবর্ষময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি; কিন্তু রেহাই নেই। যেখানেই যাই, মৃত্যু আমার পেছনে লেগে আছে। মনে ভাবি, আর বাঙালীর সঙ্গে দেখা করব না; কিন্তু পারি না, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।”

কথাটা খাপছাড়া ঠেকিল, কিন্তু তবু মৃত্যু যে তাহাকে তাড়া করিয়াছে এবং অচিরাৎ ধরিয়া ফেলিবে, সে বিষয়ে অন্তত আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। তথাপি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, ‘এখানকার জলহাওয়া খুব ভাল, কিছু দিন থাকুন, নিশ্চয় সেরে উঠবেন।”

লোকটি পকেট হইতে চামড়ার সিগার-কেস্ বাহির করিয়া বলিল, “ধূমযাত্রা করেন কি?”— বলিয়া তিনটি ভীষণদর্শন সিগার আমাদের তিনজনকে দিয়া, একটি নিজে ধরাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল। আমরা নির্বাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। এই শরীরের উপর এইরূপ বিকটাকৃতি বিষাক্ত কড়া সিগার টানিয়া লোকটা কয় দিন বাঁচিবে?

আমাদের মুখের প্রতি কিন্তু তাহার নজর ছিল, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “আপনারা ভুল করছেন। আমি দেখতে একটু রোগা বটে, কিন্তু আমার শরীরে কোনও রোগ নেই। ধরুন তো আমার পাঞ্জা।”—এই বলিয়া কাঠির মতো অঙ্গুলিযুক্ত কঙ্কালসার হাতখানা আমার দিকে বাড়াইয়া দিল।

পাগল নাকি! আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, “না, না, সে কথা বলিনি। আমি বলছিলুম—”

“ধরুন পাঞ্জা—” লোকটির চক্ষু দু'টা ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমরা মনে মনে প্রমাদ গণিলাম; কোথা হইতে একটা উন্মাদ আসিয়া জুটিল! আমরা পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিতেছি দেখিয়া লোকটা নাছোড়বান্দা হইয়া বলিল, “আপনারা ভাবছেন, রোগা বলে আমার গায়ে জোর নেই। ভুল! ভুল! পাঞ্জায় গামা পালোয়ানও আমাকে হারাতে পারে না। ধরুন পাঞ্জা!”

কি করি, নিরুপায় হইয়াই তাহার পাঞ্জা ধরিলাম। নিজের দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে ভাল ধারণাই ছিল; ভয় হইল, বুঝি একটু চাপ দিলেই ঐ প্যাঁকাটির মতো আঙুলগুলা মট্‌মট্ করিয়া ভাঙিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার হাতে হাত দিয়াই বুঝিলাম, সে আশঙ্কা অমূলক। তাহার আঙুলগুলা ইস্পাতের তারের মতো আমার আঙুলগুলাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি যতই বলপ্রয়োগ করি, তাহার কব্জি ততই লোহার মতো শক্ত হইতে

থাকে। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। চাহিয়া দেখিলাম, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ নির্বিকার, দাঁতে সিগার চাপিয়া স্বচ্ছন্দে ধূম উদ্‌গিরণ করিতেছে।

ক্রমে আমার হাত অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। তারপর সবিস্ময়ে দেখিলাম, হাতখানা অজ্ঞাতসারে ঘুরিয়া যাইতেছে।

আমার কব্জির কাছে মট্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল। "ব্যাস্! কাবার!"— বলিয়া লোকটা পাঞ্জা ছাড়িয়া দিল। আমি স্তম্ভিতভাবে অবশ হাতখানা তুলিয়া বসিয়া রহিলাম।

খানিকক্ষণ কেহ কোনও কথা কহিল না, লোকটা অর্ধমুদিতনেত্রে সিগার টানিতে লাগিল।

অবশেষে অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়ের নামটি কি?"

সে বলিল, "ভূতনাথ শিকদার। দেখলেন তো যা বললুম সত্যি কি না? রোগ আমার শরীরে নেই মশায়, রোগ এইখানে।"— বলিয়া নিজের কপালে তর্জনী ঠেকাইল।

বরদা নিজের চেয়ারখানা ভূতনাথ শিকদারের পাশ হইতে একটু সরাইয়া লইয়া বলিল, "আপনি যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিলেন, তা তো চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না; ভোজবাজি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু শরীর যদি আপনার নীরোগই হয়, তবে আপনি এত রোগা কেন? মাথার কি কোনও অসুখ আছে?"

ভূতনাথ শিকদার বলিল, "মাথার অসুখ নেই, অসুখ আমার কপালের, ভাগ্যের। বলছি তো, মৃত্যু আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে।"

বরদা বলিল, "কথাটা আর একটু খোলসা করে না বললে ঠিক বুঝতে পারছি না।"

শিকদার চুরুটে তিন চারটা টান দিয়া যেন কি চিন্তা করিল, শেষে বলিল, "আচ্ছা, বলছি, কিন্তু এ কথা শোনবার পর আর আপনারা আমার মুখদর্শন করতে চাইবেন না। এই ভয়েই তো দেশ-দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—বাঙালীর ছায়া মাড়াতে চাই না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি না। আপনারা আমায় মাফ করবেন, আমি একটা মহা অলক্ষণ, যাদের সঙ্গে মিশি, তাদেরই অমঙ্গল হয়।"

তাহার কথাগুলা এমন একটা অবসন্ন করুণ রেশ রাখিয়া গেল যে, কিছু না-বুঝিয়াও আমার হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। হয়তো লোকটি জীবনে অনেক দুঃখশোক পাইয়াছে, তাই মাথাটা কিছু খারাপ হইয়া গিয়াছে—মনে করে, যাহার সহিত কথা কহিবে তাহারই অমঙ্গল ঘটিবে। আমার এক দূর-সম্পর্কীয় পিসীমার এইরূপ হইয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে স্বামী, তিন পুত্র ও সাতটি নাতি-নাতনী হারাইয়া তিনি প্রায় পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, সর্বদা চোখে কাপড় বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতেন, বলিতেন—আমি কাহারও মুখ দেখি না, আমার দৃষ্টি যাহার উপর পড়িবে, সে আর বাঁচিবে না। ভূতনাথ শিকদারেরও হয়তো সেই রকম কিছু হইয়া থাকিবে।'

আমি বলিলাম, "তা হোক, আপনি বলুন। ও সব অলক্ষণ-কুলক্ষণ আমরা মানি না।"

শিকদার বলিল, "আপনাদের তরুণ বয়স, ও সব না-মানাই স্বাভাবিক। ভূত-প্রেত, পরকাল, সূক্ষ্মদেহ এ সব আপনাদের মানতে বলছি না, কিন্তু আসন্ন দুর্ঘটনা যে আগে থাকতে মানুষের জীবনে ছায়াপাত করে, এ কথাও কি আপনারা স্বীকার করেন না?"

আমরা চুপ করিয়া রহিলাম। শিকদার বলিতে লাগিল, "তবে ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি। আমার জীবন কেন যে মনুষ্যসমাজ থেকে একটা ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা শুনলে আপনারা হয়তো আমাকে পাগল মনে করবেন; কিন্তু বাস্তবিক আমি পাগল নই, আপনাদের মতো সহজ মানুষ। পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে, হেসে-কেঁদে সাধারণ মানুষের মতো জীবন কাটাতে চাই; কিন্তু পারি না। কেন পারি না, জানেন? ভয়! দারুণ ভয়ে আমি কারুর সঙ্গে মিশতে পারি না। একটা মহা আতঙ্ক সব সময় আমাকে গ্রাস করে আছে। যখন একলা থাকি বেশ থাকি, কিন্তু আপনারাই বলুন তো, মানুষ একলা সঙ্গীহীনভাবে কত দিন থাকতে পারে? তাই মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়তে হয়।

"আমি বিবাহ করিনি, কেন করিনি তা সহজেই বুঝতে পারবেন। বাপ-মা অনেকদিন গত হয়েছেন,

আত্মীয়স্বজনও এখন বড় কেউ নেই, চিৎপুর রোডে পৈতৃক বাড়িখানা এখনও বিক্রি করিনি, টাকাও যথেষ্ট আছে, কিন্তু তবু একটা সৃষ্টিছাড়া অন্ধকার ধূমকেতুর মতো কেবল শূন্যের মাঝখানে ছুটে বেড়াচ্ছি—কেন?

"যখন আমার ষোল বছর বয়স, তখন একদিন গ্রীষ্মের দুপুরবেলায় তিনজন সমবয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে আমি আমাদের বাড়ির তেতলায় একটা ঘরে বসে তাস খেলছিলুম। সেই দিনটা হচ্ছে আমার জীবনের একটা অভিশাপ। স্কুলে গরমের ছুটি হয়ে গেছে, রোজই আমাদের এই রকম খেলা বসে। তেতলার এই ঘরটি দিব্যি নিরিবিলি, চিৎপুর রোডের চিৎকার সেখান পর্যন্ত পৌঁছয় না, শুধু মাঝে মাঝে ট্রামের ঢং ঢং শব্দ শোনা যায়। সে দিন আমরা চারজন নিবিষ্টমনে বসে খেলছি, এমন সময় খোলা জানলা দিয়ে একটা কালো ভোমরা ঘরে ঢুকে আমাদের ঘিরে ভন্‌ভন্‌ করে ঘুরতে লাগল। খেলায় এত তন্ময় ছিলুম যে প্রথমটা লক্ষ্যই করিনি, কিন্তু সেটা যখন মাথার চারিদিকে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করলে, তখন আমরা চারজনেই উঠে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু সেও কিছুতেই যাবে না; পাখা দিয়ে, ব্যাড্‌মিন্টনের ব্যাট্‌ দিয়ে যতই তাকে মারবার চেষ্টা করি, সেও ততই আমাদের লক্ষ্য এড়িয়ে কখনও নিচুতে, কখনও প্রায় কড়িকাঠের কাছে উঠে ঘরতে থাকে। আমরা যেই আবার খেলতে বসি, অমনই আমাদের কানের কাছে এসে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে উড়তে আরম্ভ করে।

"প্রায় আধ ঘণ্টা তার পেছনে লেগে থাকবার পর যখন আমরা হয়রান হয়ে পড়েছি, তখন ভোমরাটা ভন্‌ভন্‌ করে এসে একবার আমাদের মাথার চারিদিকে চক্র দিয়ে নিজে থেকেই জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরের তপ্ত বাতাসে তার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল।

"গোপাল বললে, 'দেখ ভাই, আশ্চর্য ভোমরা! একবার আমি ব্যাড্‌মিন্টন ব্যাট্‌ দিয়ে মারলুম, ঠিক মনে হল ভোমরাটা তাঁতের ভেতর দিয়ে গলে গেল।'

"বীরেন বললে, 'দূর! অত বড় ভোমরা কখনও অতটুকু ফাঁক দিয়ে গলতে পারে?'

"হরিপদ বললে, 'কিন্তু এই কলকাতা শহরে ভোমরা এলো কোত্থেকে, ভাই? কাছেপিঠে কোথাও বাগানও তো নেই!'

"সত্যি তো, ভোমরা এলো কোত্থেকে? আমরা নানারকম আঁচ-আন্দাজ করতে লাগলুম, কিন্তু কোনওটাই বেশ লাগসই হল না। তখন আমাদের বয়স কম, ভোমরা কোথা থেকে এলো, এ সমস্যা নিয়ে বেশি মাথা ঘামালুম না; কিন্তু ভোমরাটাকে মন থেকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতেও পারলুম না।

"পরদিন দুপুরে গোপাল তাস খেলতে এলো না। তিনজনে খেলা ভাল জমল না, সারা দুপুর গল্প করে আর গোপালকে গালাগাল দিয়ে কাটিয়ে দিলুম।

"গোপাল গ্রে স্ট্রীটে থাকত। বিকেলবেলা তার বাড়ি গিয়ে দেখলুম, সে বিছানায় শুয়ে আছে, মাথায় বরফ দেওয়া হচ্ছে। আমায় দেখে চিনতে পারলে কি না বোঝা গেল না,— চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে লাল। শুধু একবার গেঙিয়ে গেঙিয়ে কি একটা কথা বললে— মনে হল যেন বললে— ভোমরা!

"তার চারিদিকে ডাক্তার আর বাড়ির লোক ভিড় করেছিল; কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না, গোপালের কি হয়েছে। পরে শুনেছিলুম—সর্দিগর্মি। সান্‌-স্ট্রোক্‌।

"আমি চুপি চুপি চোরের মতো বাড়ি ফিরে এলুম; তার সেই অস্পষ্ট কথাটা আমার মাথার মধ্যে কেবলই গুমরে গুমরে উঠতে লাগল— ভোমরা! ভোমরা!

"পরদিন গোপাল মারা গেল। সেই থেকে, কি করে জানি না, আমার মনে গেঁথে গেল যে, সেই ভোমরাটা ছিল মৃত্যুর দূত। গোপালের দিন যে ফুরিয়ে এসেছে, এই খবরটা সে আমাদের দিতে এসেছিল।

"তারপর থেকে এই কুড়ি বছরের মধ্যে কতবার ভোমরা দেখেছি জানেন?— তিনশ' একুশবার। আর, একবারও আমার ভোমরা দেখা নিষ্ফল হয়নি!"

নির্বাপিত সিগারটা আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া শিকদার আর একটা সিগার ধরাইল। আমরা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

শিকদার বলিল, "প্রথম প্রথম মনে হত, বুঝি আমার মনের ভুল; কিন্তু তা নয়— ভোমরাটাকে সকলেই দেখতে পায় এবং দেখার তিন দিনের মধ্যে যারা দেখেছে, তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু অনিবার্য। বাবা মারা যাবার আগে ভোমরা দেখলুম,— মা'র বেলাতেও দেখা পেলুম।

"ক্রমে মানুষের সঙ্গ আমার কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠল— সর্বদাই আতঙ্ক, কি জানি কখন ভোমরা দেখে ফেলি। হয়তো পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব মিলে গল্প করছি, হঠাৎ ভোমরা দেখা দিলেন। দুম্ করে বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ল। আমার এই সুস্থ সবল বন্ধুদের মধ্যে একজনের মেয়াদ ফুরিয়েছে— তিন দিনের মধ্যে তাঁকে যেতে হবে।

"একটা উৎকট কৌতূহল হত; জানতে ইচ্ছে করত, এদের মধ্যে কাকে ভোমরা নোটিশ দিয়ে গেল। মনে মনে আন্দাজ করবার চেষ্টা করতুম— এবার কার পালা; কিন্তু আন্দাজ ঠিক হত না। ভোমরার মৃত্যু-পরোয়ানার মধ্যে ঐটুকু ছিল কৌতুক—কার ওপর সমন জারি করে গেল, শেষ পর্যন্ত বোঝা যেত না।

"একবারকার ঘটনা বলি। বর্ধমানে মামার বাড়ি গিয়েছি; মামার অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। পৌঁছনোর পরদিন সকালবেলা আমরা সকলে মিলে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় ভোমরার আবির্ভাব হল। আমার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল। সুবী বলে মামার একটা বছর দশেকের মেয়ে দেয়ালের ধারে বসে চা তৈরি করছিল, ভোমরাটা উড়তে উড়তে দেয়ালে ঠোকর খেয়ে টপ্ করে পড়ল একেবারে সুবীর মাথায়। সুবী হাঁউমাউ করে উঠে দাঁড়াতেই জ্বলন্ত স্টোভটা উল্টে গিয়ে তার কাপড়ে আগুন ধরে গেল। ভোমরা ভোঁ করে উড়ে পালাল।

"আমরা পাঁচজনে মিলে সুবীর কাপড়ের আগুন নেবালুম বটে, কিন্তু তার পা দুটো ঝলসে সাদা হয়ে গেল। ডাক্তার এসে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে বলে গেলেন— সিরিয়াস্ কিছু নয়, খুব বেঁচে গেছে।

"আমি মনে মনে বললুম— বেঁচে মোটেই যায়নি,— এ ভোমরার নোটিশ, ব্যর্থ হবার নয়। ঘা থেকে সেপ্‌টিক্, তারপরেই সাফ।

"দুপুরবেলা সুবীর জ্বর এলো। সন্ধ্যের সময় আমি একটা ছুতো করে ঊর্ধ্বশ্বাসে বর্ধমান ছেড়ে পালালুম। সুবীটা বড় ভাল মেয়ে ছিল, মামাতো ভাইবোনের মধ্যে তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতুম।

"বাড়ি ফিরে এসে কাউকে কিছু বললুম না। যথাসময়ে টেলিগ্রাম এলো— সুবীর কিছু হয়নি, মামা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন!

"ভোমরার অভিসন্ধি বোঝবার চেষ্টা করেছিলুম, তাই সে আমার সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করে গেল।

"আমার মনের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন,— সর্বদা যেন মৃত্যুর দূতকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি। অনেক ভেবে ভেবে একটা মতলব ঠিক করলুম,— দিনের বেলা যতদূর সম্ভব একলা থাকতুম, রাত্তিরে বাড়ি থেকে বার হতুম। মনের ভাবটা এই যে, রাত্তিরে তো আর ভোমরা আসতে পারবে না।

"কিন্তু আমার ফন্দি খাটল না। দিন-রাত্রি নির্বিচারে ভোমরা আসতে লাগল— রাত্তিরে কানামাছির মতো টাউরি খেতে খেতে আসে, আবার টাউরি খেতে খেতে চলে যায়।

"আমার মানসিক অবস্থা ক্রমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই জিজ্ঞাসা করে, 'তুই অমন কুনো হয়ে যাচ্ছিস কেন? চেহারাটাও দিন দিন ভূতে-পাওয়া গোছের হয়ে যাচ্ছে। হয়েছে কি?'

"আমি চুপ করে থাকি— কি বলব? সত্যি কথা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারি না।

"অতঃপর বাবা-মা মারা যাবার পর থেকে এই নিরুদ্দেশ-যাত্রা শুরু হয়েছে। মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু মৃত্যু-দূত আমার সঙ্গ ছাড়ে না। এক এক সময় হাত জোড় করে ডাকি, 'মরণ-ভোমরা! তুমি এবার আমাকে নাও, এই দুঃসহ শাস্তি থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও।'— কিন্তু আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় না। এ সংসারে কেবল আমিই যেন অমর, সকলের মৃত্যুর পরোয়ানা বয়ে বেড়াচ্ছি।"

শিকদারের কণ্ঠস্বর একটা গভীর নিরাশার মধ্যে মিলাইয়া গেল। তাহার কথাগুলো ঘরের মধ্যে যেন

একটা অবাস্তব দুঃস্বপ্নের জাল বুনিয়া দিয়াছিল। আমরা আগুনের দিকে তাকাইয়া মোহাচ্ছন্নের মতো বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি শেষ কবে মরণ-ভোমরা দেখেছেন?"

শিকদার চোখের উপর দিয়া ডান হাতখানা একবার চালাইয়া বলিল, "সাত দিন আগে, আগ্রায়। তাজ দেখতে গিয়েছিলুম, সেখানে একটি বাঙালী দম্পতির সঙ্গে দেখা হল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে তাজ দেখতে এসেছে— ছেলেমানুষ, নবপ্রণয়ী। প্রণয়ের মহাতীর্থে নিজেদের সম্মিলিত ভালবাসা বোধ হয় নিবেদন করতে এসেছিল। তার পর... ভোমরা... সেই রাত্রেই আগ্রা ছেড়ে চলে এলুম।"

চারজনেরই সিগার নিবিয়া গিয়াছিল, পুনশ্চ ধরাইয়া নিঃশব্দে টানিতে লাগিলাম।

মিনিট পনের সকলেই চুপচাপ।

হঠাৎ শিকদার বলিল, "একটু গরম বোধ হচ্ছে না? জানলাটা খুলে দিতে পারি?"

বদ্ধ ঘরে সিগারের কটু ধোঁয়া ও আগুনের উত্তাপে সত্যই দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিতেই শিকদার উঠিয়া পশ্চিমদিকের জানালাটা খুলিয়া দিল।

বরদা আমার কানে কানে বলিল, "একেবারে বদ্ধ পাগল— মনোম্যানিয়াক্। ওর চোখের চাউনি দেখছ?"

শিকদার জানালা খুলিয়া দিতেই একটা এলোমেলো কন্‌কনে হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাদের উত্তপ্ত মুখের উপর যেন ঠাণ্ডা হাত বুলাইয়া দিল। টেবিলের উপর আলোটা নিব-নিব হইয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল।

শিকদার ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়াছে, এমন সময়—

ভন্‌ন্‌—

ও কিসের শব্দ? চারিজনেই চেয়ারের উপর সোজা শক্ত হইয়া বসিলাম।

পরক্ষণেই খোলা জানালা দিয়া একটা কালো কুচকুচে ভোমরা পাখার শব্দে আমাদের মগজ ভরিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

ভোমরা টেবিলের উপরের বাতিটাকে একবার প্রদক্ষিণ করিল; তারপর সোঁ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া ছাদে বাধা পাইয়া টপ্ করিয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ তাহার গুঞ্জন নিস্তব্ধ।

আবার ভন্ করিয়া শব্দ হইল। ভোমরা মেঝে হইতে উঠিয়া একবার বিদ্যুদ্বেগে ঘরময় উড়িয়া বেড়াইল। তারপর আমাদের কানের পাশ দিয়া ছুটিয়া গিয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার গুঞ্জন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে মিলাইয়া গেল।

শিকদার উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দু'টা পাগলের মতো। প্রায় চিৎকার করিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন!— আমি একটা অভিসম্পাত। আর কখনও আমার দেখা পাবেন না!"— বলিয়া ওভারকোট ও টুপি ফেলিয়াই ঝড়ের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমরা তিন বন্ধু বিহ্বল জিজ্ঞাসুভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। বুকের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল।

তিন দিনের মধ্যে কাহাকে যাইতে হইবে?

৫ পৌষ ১৩৩৮

অশরীরী

পুরাতন উই-ধরা ডায়েরিখানি সাবধানে খুলিয়া বরদা বলিল, ‘অদ্ভুত জিনিস, কিন্তু আগে থাকতে কিছু বলব না। আমাদের আবদুল্লা কুঁজড়াকে জান তো? সাহেবদের কুঠি থেকে পুরানো বই সের দরে কিনে বিক্রি করতে আসে? তারি কাছ থেকে এটা কিনেছি, ঝাঁকায় করে এক গাদা বই নিয়ে এসেছিল, বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখি একটা বাংলায় লেখা ডায়েরি। নগদ দু-পয়সা খরচ করে তৎক্ষণাৎ কিনে ফেললুম।’

অমূল্য দৈবক্রমে আজ ক্লাবে আসে নাই, তাই বাকবিতণ্ডায় বেশি সময় নষ্ট হইল না। বরদা বলিল, ‘পড়ি শোনো। বেশি নয়, শেষের কয়েকটা পাতা খালি পড়ে শোনাব। আর যা আছে তা না শুনলেও কোনও ক্ষতি নেই। এ ডায়েরির লেখক কে তা ডায়েরি পড়ে জানা যায় না। তবে তিনি যে কলকাতা হাইকোর্টের একজন য়্যাড্‌ভোকেট ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।’

ল্যাম্পটা উস্কাইয়া দিয়া বরদা পড়িতে আরম্ভ করিল,— ৭ ফেব্রুয়ারি— আজ মুঙ্গেরে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্টেশন হইতে পীর-পাহাড় প্রায় মাইল-তিনেক দূরে— শহরের বাহিরে। মুঙ্গের শহরের যতটুকু দেখিলাম, কেবল ধূলা আর পুরাতন সেকেলে বাড়ি। যা হোক, আমাকে শহরের মধ্যে থাকিতে হইবে না ইহাই রক্ষা। স্টেশন হইতে আসিতে পথে কেল্লার ভিতর দিয়া আসিলাম। কেল্লাটা মন্দ নয়। পুরাতন মীরকাশিমের আমলের কেল্লা— গড়খাই দিয়া ঘেরা। প্রাকারের ইট-পাথর অনেকস্থানে খসিয়া গিয়াছে। বড় বড় গাছ উচ্চ প্রাচীরের উপর জন্মিয়া শুষ্ক গড়খাইয়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একদিন এই গড়ের প্রাচীরে সতর্ক সান্ত্রী পাহারা দিত, প্রহরে প্রহরে দুর্গদ্বারে নাকাড়া বাজিত, সন্ধ্যার সময় লোহার তোরণ-দ্বার ঝনৎকার করিয়া বন্ধ হইয়া যাইত— কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না।

পীর-পাহাড়ের বাড়িখানি চমৎকার। এমন বাড়ি যাহার, সে চিরদিন এখানে থাকে না কেন এই আশ্চর্য। যা হোক, পাহাড়ের উপর নির্জন প্রকাণ্ড বাড়িখানিতে একাকী একমাস থাকিতে পারিব জানিয়া ভারি আনন্দ হইতেছে। বন্ধু কলিকাতায় থাকুন, আমি এই অবসরে তাঁহার বাড়িটি ভোগ করিয়া লই।

কলিকাতা হাইকোর্টে প্রায় দেড়মাস ধরিয়া প্রকাণ্ড দায়রা মোকদ্দমা চালাইবার পর সত্য সত্যই বিশ্রাম করিতে হইলে এমন শান্তিপূর্ণ স্থান আর নাই। আমার শরীর যে ভাঙিয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ শুধু অত্যধিক পরিশ্রম নয়— মানুষের সহিত অবিশ্রাম সংঘর্ষ। যে-লোক মিথ্যা কথা বলিবে বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে তাহার পেট হইতে সত্য কথা টানিয়া বাহির করা এবং যে-হাকিম বুঝিবে না তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা কিরূপ বুকভাঙা ব্যাপার তাহা যিনি এ পেশায় ঢুকিয়াছেন তিনিই জানেন। মানুষ দেখিলে এখন ভয় হয়, কেহ কথা কহিবার উপক্রম করিলেই পলাইতে ইচ্ছা করে। তাই একেবারে নিঃসঙ্গ ভাবে চলিয়া আসিয়াছি, বামুন-চাকর পর্যন্ত সঙ্গে লই নাই। ইক্‌মিক্ কুকার সঙ্গে আছে, তাহাতেই নিজে রাঁধিয়া খাইব।

কি সুন্দর স্থান! পাহাড়ের ঠিক মাথার উপর বাড়িটি, চারিদিকের সমতলভূমি হইতে প্রায় তিন-চার শ’ ফুট উচ্চে। ছাদের উপর দাঁড়াইলে দেখা যায়, একদিকে দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গার চর। তাহার উপর এখন সরিষা জন্মিয়াছে— সবুজ জমির উপর হলুদ বর্ণ ফুলের স্ফুলিঙ্গ। চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু স্নিগ্ধ হইয়া যায়। অন্যদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় অগণ্য অসংখ্য তালগাছের মাথা জাগিয়া আছে, আরও কত প্রকারের ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল; তাহার ভিতর দিয়া গেরিমাটি-ঢাকা পথটি বহু নিম্নে গোলাপী ফিতার মতো পড়িয়া আছে। এ যেন কোন্ স্বর্গলোকে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়িতে একটা মালী ছাড়া আর কেহ নাই, সে-ই বাড়ির তত্ত্বাবধান করে

এবং দু'চারটা মৃতপ্রায় গোলাপ গাছে জল দেয়। জল পাহাড়ের উপর পাওয়া যায় না, পাহাড়ের পাদমূলে রাস্তার ধারে একটি কূয়া আছে সেখান হইতে আনিতে হয়। মালীটার সহিত কথা হইয়াছে আমার জন্য দু-ঘড়া জল রোজ আনিয়া দিবে, তাহাতেই আমার স্নান ও পান দুই কাজই চলিয়া যাইবে।

মালীটাকে বলিয়া দিয়াছি, পারতপক্ষে যেন আমার সম্মুখে না আসে। আমি একলা থাকিতে চাই।

৮ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে এত ঘুমাইয়াছি যে, জীবনে বোধ হয় এমন ঘুমাই নাই। রাত্রি নয়টার সময় শুইতে গিয়াছিলাম, যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা সাতটা— ভোরের রৌদ্র খোলা জানালা দিয়া বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে।

গোছগাছ করিয়া সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছি। সঙ্গে কিছু চাল ডাল আলু ইত্যাদি আনিয়াছিলাম, তাহাতে আরও তিন-চার দিন চলিবে। ফুরাইয়া গেলে মালীকে দিয়া শহরের বাজার হইতে আনাইয়া লইব। ট্রাঙ্কগুলা খুলিয়া দেখিলাম প্রয়োজনীয় দ্রব্য সবই আছে। দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম সাবান তেল আয়না চিরুনি কিছুই ভুল হয় নাই। এক বাণ্ডিল ধূপের কাঠিও রহিয়াছে দেখিলাম, ভালই হইল। এখনও অবশ্য একটু শীত আছে, কিন্তু গরম পড়িতে আরম্ভ করিলে মশার উপদ্রব বাড়িতে পারে। চাকরটার বুদ্ধি আছে দেখিতেছি, কতকগুলা বই ও কাগজ পেনসিল ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছে। যদিও এই একমাসের মধ্যে বই স্পর্শ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তবু হাতের কাছে দু'একখানা থাকা ভাল।

বইগুলা কিন্তু একেবারেই বাজে। পরলোক ভূতদর্শন, উন্মাদ ও প্রতিভা— এ-সব বই আমি পড়ি না। চাকরটা বোধ হয় ভাবিয়াছে আইন ছাড়া অন্য যে-কোনও বই পড়িলেই আমি ভাল থাকিব। সে একটু-আধটু লেখাপড়া জানে— সাধে কি বলে, স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

এখানেও একটা ছোটখাটো লাইব্রেরি আছে দেখিতেছি। একটা ক্ষুদ্র আলমারিতে গোটাকয়েক পুরাতন উপন্যাস, অধিকাংশই সম্মুখের ও পশ্চাতের পাতা ছেঁড়া। যা হোক, পড়িবার যদি ইচ্ছা হয়— বইয়ের অভাব হইবে না।

দুপুরবেলাটা ভারি আনন্দে কাটিল। শূন্য বাড়িময় একাকী ঘুরিয়া বেড়াইলাম। পাহাড়ের উপর এই বৃহৎ বাড়ি কে তৈয়ার করিয়াছিল— ইহার কোনও ইতিহাস আছে কি? কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিব।

বাড়ি যে-ই তৈয়ার করুক, তাহার রুচির প্রশংসা করিতে হয়। যে-পাহাড়ের উপর বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখিতে একটি উল্টানো বাটির মতো,— কবি হইলে আরও রসাল উপমা দিতে পারিতাম,— হয়তো সাদৃশ্যটাও আরও বেশি হইত,— কিন্তু আমার পক্ষে উল্টানো বাটিই যথেষ্ট। শাদা বাড়িখানা তাহার উপর মাথা তুলিয়া আছে। বাড়িখানা যেমন বৃহৎ তেমনি মজবুত— মোটা মোটা দেওয়ালের মাঝখানে বিশাল এক একটা ঘর, নিজের বিশালতার গৌরবে শূন্য আসবাবহীন অবস্থাতেও সর্বদা গম্‌গম্ করিতেছে। বাড়ির সম্মুখে খানিকটা সমতল স্থান আছে, তাহাতে গোলাপ বাগান। গোলাপ বাগানের শেষে ফটক, ফটকের বাইরেই নীচে যাইবার ঢালু পাথরভাঙা পথ বাঁকিয়া বাড়ির কোল দিয়া নামিয়া গিয়াছে। ফটকের সম্মুখে কিছুদূরে একটা প্রকাণ্ড কূপ, গভীর হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার তল পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না। কূপের চারিপাশে আগাছা জন্মিয়াছে, একটা শিমুল গাছ তাহার মুখের বিরাট গর্তটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কূপের ভিতর এক খণ্ড পাথর ফেলিয়া দেখিলাম, অনেকক্ষণ পরে একটা ফাঁপা আওয়াজ আসিল। কূপটা নিশ্চয় শুষ্ক।

সন্ধ্যার সময় কূপের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। নীচে বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, দূরে দূরে দু'একটি প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু উপরে এখনও বেশ আলো আছে। পশ্চিম দিকটা গৈরিক ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। দেখিতে ভারি চমৎকার। এই বাড়িতে আমার দুই দিন কাটিল।

হঠাৎ কাঁধের উপর একটা স্পর্শ অনুভব করিয়া দেখি, এক ঝলক রক্ত সেখানে পড়িয়াছে। কিন্তু তখনই বুঝিতে পারিলাম, রক্ত নয়— ফুল। শিমুল গাছটায় দু'-চারটা ফুল ধরিয়াছিল, ইতিপূর্বে লক্ষ্য করি নাই।

ফুলটি হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইল, এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ফুল দিয়া আমাকে

স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন।

৯ ফেব্রুয়ারি। আজ শরীরটা ভাল ঠেকিতেছে না; বোধ হয় একটু জ্বরভাব হইয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা উত্তাপ অনুভব করিতেছি। মোকদ্দমা লইয়া যে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়াছি তাহার কুফল এখনও শরীরে লাগিয়া আছে; অকারণে স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হইয়া ওঠে। আজ উপবাস করিয়াছি, আশা করি কাল শরীর বেশ ঝর্‌ঝরে হইয়া যাইবে।

১০ ফেব্রুয়ারি। প্রাচীন গ্রীসে সংস্কার ছিল, প্রত্যেক গাছ লতা নদী পাহাড়ের একটি করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। আধুনিক বিজ্ঞান-শাসিত যুগে কথাটা হাস্যকর হইলেও উপদেবতা অধিষ্ঠিত গাছপালার কথা কল্পনা করিতে মন্দ লাগে না। সাঁওতালদের মধ্যেও এইরূপ সংস্কার আছে শুনিয়াছি। যাহারা বনে জঙ্গলে বাস করে তাহাদের মধ্যে এই প্রকার বিশ্বাস হয়তো স্বাভাবিক। মানুষ যেখানেই থাকুক, দেবতা সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। আমরা সভ্য হইয়া ইট-পাথরের মন্দিরের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, যাহারা বনের মানুষ তাহারা গাছপালা নদী-নালাতেই দেবতার আরোপ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। আত্মবিশ্বাসের যেখানে অভাব, সেইখানেই দেবতার জন্ম। মানুষ সহজ অবস্থায় ভূত-প্রেত উপদেবতা, এমন কি দেবতা পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে না; ও-সব বিশ্বাস করিতে হইলে রীতিমতো মস্তিষ্কের ব্যাধি থাকা চাই। কিন্তু সে যাহাই হোক, উপদেবতার কথা কল্পনা করিতে বেশ লাগে। আমার ঐ শিমুল গাছটার যদি একটা দেবতা থাকিত তাহাকে দেখিতে কেমন হইত? কিংবা অতদূর যাইবার প্রয়োজন কি, এই পাহাড়টারও তো একটা দেবতা থাকা উচিত — তিনিই বা কিরূপ দেখিতে শুনিতে? তিনি যদি হঠাৎ একদিন আমাকে দেখা দেন তবে কেমন হয়?

১১ ফেব্রুয়ারি। দিনের বেলাটা পাহাড়ের উপরেই এধার-ওধার ঘুরিয়া এবং রান্নাবান্নার কাজে বেশ একরকম কাটিয়া যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত এই তিন-চার ঘণ্টা সময় যেন কিছুতেই কাটিতে চায় না। এখন কৃষ্ণপক্ষ যাইতেছে, সূর্যাস্তের পরই চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া যায়। তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠে সমস্ত দৃশ্য লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া যায়, কেবল আকাশের তারাগুলা যেন অত্যন্ত নিকটে আসিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকে। আমি ইক্‌মিক্ কুকারে রান্না চড়াইয়া দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মধ্যে নীরবে বসিয়া থাকি। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় ঘরটা সম্পূর্ণ আলোকিত হয় না— আনাচে-কানাচে অন্ধকার থাকিয়া যায়।

প্রকাণ্ড বাড়িতে আমি একা।

১২ ফেব্রুয়ারি। মনটা অকারণে বড় অস্থির হইয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে কেবলি মনে হইতেছে যেন কাহার অদৃশ্য চক্ষু আমাকে অনুসরণ করিতেছে, বার বার ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে দেখিতেছি। অথচ বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেহ নাই। স্নায়বিক উত্তেজনা— তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বড় অস্থির বোধ হইতেছে,— নার্ভের কোনও ঔষধ সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত।

১৩ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমার স্নায়ুগুলা এখনও ধাতস্থ হয় নাই— কিংবা—

না, না, ও-সব আমি বিশ্বাস করি না।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে যেন আমার সর্বাঙ্গে অতি লঘুস্পর্শে হাত বুলাইয়া দিতেছে! কি অপূর্ব রোমাঞ্চকর সে স্পর্শ তাহা বলিতে পারি না। মুখের উপর হইতে আঙুল চালাইয়া পায়ের পাতা পর্যন্ত লইয়া যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ঘর অন্ধকার ছিল; এই শারীরিক সুখস্পর্শের মোহে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন থাকিয়া, ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল কে যেন নিঃশব্দে শয্যার পাশ হইতে সরিয়া গেল।

এতক্ষণে ঘুমের আবেশ একেবারে ছুটিয়া গিয়াছিল, ভাবিলাম— চোর নয় তো? কিন্তু চোর গায়ে হাত বুলাইয়া দিবে কেন? তাছাড়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছি। আমি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম— কে? কোনও সাড়া নাই। গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। বালিশের পাশে দেশলাই ছিল, আলো জ্বালিলাম। ঘরে কেহ নাই,

দরজা পূর্ব্ববৎ বন্ধ। ভাবিলাম, ঘুমাইয়া নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিয়াছি। এমন অনেক সময় হয়, ঘুম ভাঙিয়াছে মনে হইলেও ঘুম সত্যই ভাঙে না— নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিস্থলে মনটা অর্ধচেতন অবস্থায় থাকে।

দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলাম, খোলা বারান্ডায় আসিয়া দেখিলাম এক আকাশ নক্ষত্র জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। ঘরের বদ্ধ বায়ু হইতে বাহিরে আসিয়া বেশ আরাম বোধ হইল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বাড়ির চারিদিকে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করিবার পর একটু গা শীত-শীত করিতে লাগিল, আবার ঘরে ফিরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইলাম। আলোটা নিবাইলাম না, কমাইয়া দিয়া মাথার শিয়রে রাখিয়া দিলাম।

এটা কি সত্যই স্বপ্ন?— রাত্রে আর ভাল ঘুম হইল না।

১৪ ফেব্রুয়ারি। কাল আর কোনও স্বপ্ন দেখি নাই। আধ-আশা আধ-আশঙ্কা লইয়া শুইতে গিয়াছিলাম— হয়তো আজ আবার স্বপ্ন দেখিব; কিন্তু কিছুই দেখি নাই। আজ শরীর বেশ ভাল বোধ হইতেছে।

চাল ডাল কেরোসিন তৈল ইত্যাদি ফুরাইয়া গিয়াছিল, মালীকে দিয়া বাজার হইতে আনাইয়া লইয়াছি। মালীটা জাতে গোয়ালা হইলেও বেশ বুদ্ধিমান লোক, সেই যে, তাহাকে আমার সম্মুখে আসিতে মানা করিয়া দিয়াছিলাম তারপর হইতে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে আমার কাছে আসে না। কখন জল দিয়া যায় আমি জানিতেও পারি না। আমিও আসিয়া অবধি পাহাড় হইতে নীচে নামি নাই, সুতরাং মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ এ-কয়দিন হয় নাই বলিলেই চলে। নীচে রাস্তা দিয়া মানুষ চলাচল করিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এতদূর হইতে তাহাদের মুখ দেখিতে পাই নাই।

আজ বাড়িতে চিঠি দিয়াছি, লিখিয়াছি— বেশ ভাল আছি। কিন্তু তাহাদের চিঠিপত্র দিতে বারণ করিয়া দিয়াছি। আমার এই বিজন বাসের মাধুর্য চিঠিপত্রের দ্বারাও খণ্ডিত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নয়। বাহিরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটিতেছে-না-ঘটিতেছে তাহার খোঁজ রাখিতে চাই না।

১৫ ফেব্রুয়ারি। আজ আবার মনটা অস্থির হইয়াছে। কি যেন হইয়াছে, অথচ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। শরীর তো বেশ ভালই আছে। তবে এমন হইতেছে কেন?

কাল, ভাবিতেছি, একবার শহরটা দেখিয়া আসিব। শুনিয়াছি নবাবী আমলের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে।

কাছেই কোথায় নাকি সীতাকুণ্ড নামে গরম জলের একটা প্রস্রবণ আছে, বন্ধু বলিয়া দিয়াছিলেন সেটা দেখা চাই। অতএব সেটাও দেখিতে হইবে।

১৬ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে আবার সেইরূপ ঘটিয়াছে। স্বপ্ন নয়— এ স্বপ্ন নয়! স্পষ্ট অনুভব করিলাম, কে আমার পাশে বসিয়া অতি কোমল হস্তে ধীরে ধীরে আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া নিস্পন্দ বক্ষে শুইয়া রহিলাম। বালিশের তলায় ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিতেছে শুনিতে পাইলাম, সুতরাং এ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা হইতেই পারে না।

অদৃশ্য হাতটা কতবার আমার আপাদমস্তক বুলাইয়া গেল তাহা বলিতে পারি না। একবার হাতখানা যখন আমার বুকের কাছে আসিয়াছে তখন হাত বাড়াইয়া আমি সেটা ধরিতে গেলাম। মনে হইল আমার মুঠির মধ্যে হাতটা গলিয়া মিলাইয়া গেল। হাতবুলানোও বন্ধ হইল। অনুভবে বুঝিলাম, সে শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছে, এখনও যায় নাই। আমি চোখ চাহিয়া শুইয়া রহিলাম— সেও দাঁড়াইয়া রহিল। ঘর অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না,— চোখ খুলিয়া থাকা বা বুজিয়া থাকায় কোনও প্রভেদ নাই। উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম কোনও শব্দ হয় কি-না। দরজায় কোথাও ঘুণ ধরিয়াছে— তাহারই শব্দ শুনিতেছি। আর কোনও শব্দ নাই।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা বুঝিলাম, সে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল; আজ আর আসিবে না। ঘুমাইয়া পড়িলে হয়তো থাকিত। আমি যখনই ঘুমাই, তখনই কি সে আমার সুপ্ত শরীরের উপর পাহারা দেয়?

কিন্তু আশ্চর্য! আজ আমার একটুও ভয় করিল না কেন?

১৭ ফেব্রুয়ারি। আমার শিমুল গাছ রক্তরাঙা ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। গাছে পাতা নাই, কেবলই

ফুল।

সেদিন যে আমার কাঁধের উপর এক ঝলক রক্তের মতো ফুল পড়িয়াছিল— সে কি স্বাভাবিক? এত স্থান থাকিতে আমার কাঁধের উপরই বা পড়িল কেন? তবে কি কোনও অদৃশ্য হস্ত গাছ হইতে ফুল ছিঁড়িয়া আমার গায়ে ফেলিয়াছিল? কে সে? বৃক্ষদেবতা? না, আমারই মতো মানুষের দেহ-বিমুক্ত আত্মা? তাই কি? একটা দেহহীন আত্মা! সে আমাকে পাইয়া খুশি হইয়াছে তাহাই কি আকারে ইঙ্গিতে জানাইতে চায়? সে আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চায় তাই কি সেদিন ফুল দিয়া আমার সংবর্ধনা করিয়াছিল!

তবে কি সত্যই প্রেতযোনি আছে? দেহমুক্ত অশরীরী আত্মা? বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু there are more things in heaven and earth—

একটা বিষয়ে ভারি আশ্চর্য লাগিতেছে,— ভয় করে না কেন? এই নির্জন স্থানে একলা আছি, এ অবস্থায় ভয় হওয়াই তো স্বাভাবিক!

১৮ ফেব্রুয়ারি। আনমনে দিন কাটিয়া গেল। শূন্য বাড়িময় কেবল ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

পছিয়াঁ হাওয়া দিতেছে— খুব ধূলা উড়িতেছে। গঙ্গার চরের দিকটা বালুতে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না।

আজ কিছু ঘটে নাই। মনটা উদাস বোধ হইতেছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি। দিনটা যেন রাত্রির প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কিছু অনুভব করি না কেন?

সন্ধ্যার সময় দেখিলাম পশ্চিম আকাশে সরু একটি চাঁদ দেখা দিয়াছে— যেন অসীম শূন্যে অপার্থিব একটু হাসি! অল্পক্ষণ পরেই চাঁদ অস্ত গেল, তখন আবার নীরন্ধ্র অন্ধকার জগৎ গ্রাস করিয়া লইল।

ইক্‌মিক্ কুকারে রান্না চড়াইয়া অন্যমনে বসিয়া ছিলাম। আলোটা সম্মুখের ভাঙা টেবিলে বসানো ছিল। অদূরে কতকগুলা ধূপ জ্বালিয়া দিয়াছিলাম, তাহারই সুগন্ধ ধূমে ঘরটি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

আর তো যা-হোক একটা কিছু না পড়িয়া থাকা যায় না। বসিয়া বসিয়া সহসা কি মনে হইল, বাক্স হইতে সেই প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বইখানা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

গল্প— নেহাত গল্প! সত্য অনুভূতির ছায়া মাত্র এ-সব কাহিনীতে নাই। আমি যেমন করিয়া তাহাকে অনুভব করিয়াছি, চোখে না দেখিয়াও সর্বাঙ্গ দিয়া তাহার সামীপ্য উপলব্ধি করিয়াছি— সেরূপ ভাবে আর কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে?

ইহারা লিখিতেছে, চোখে দেখিয়াছে। চোখে দেখা কি যায়? যে আমার কাছে আসে, সে কেমন দেখিতে? আমারই মতো কি তার হস্ত পদ অবয়ব আছে? মানুষের চেহারা, না অন্য কিছু!

বই হইতে চোখ তুলিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় আমার দৃষ্টির সম্মুখে এক আশ্চর্য ইন্দ্রজাল ঘটিল। ধূপের কাঠিগুলি হইতে যে ক্ষীণ ধূমরেখা উঠিতেছিল তাহা শূন্যে কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে যেন একটা বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতে লাগিল। অদৃশ্য কাচের শিশিতে রঙীন জল ঢালিলে যেমন তাহা শিশির আকারটি প্রকাশ করিয়া দেয়, আমার মনে হইল ঐ ধোঁয়া যেন কোনও অদৃশ্য আধারে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তদাকারত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ধূসর রঙের একটি বস্ত্রের আভাস দেখা দিল। বস্ত্রের ভিতর মানুষের দেহ ঢাকা রহিয়াছে, বস্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে তাহার পরিচয় পাইতে লাগিলাম।... ধূম কুণ্ডলী মূর্তি গড়িয়া চলিল; আবছায়া মূর্তির ভিতর দিয়া ওপারের দেয়াল দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তবু তাহার ডৌল হইতে বেশ বুঝা যায় যে, একটা মানুষের চেহারা। ধূম পাকাইয়া পাকাইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে ক্রমে মূর্তির গলা পর্যন্ত পৌঁছিল। এইবার তাহার মুখ দেখিতে পাইব... কি রকম সে মুখ? বিকট? ভয়ানক? কিন্তু ঠিক এই সময় সহসা সব ছত্রাকার হইয়া গেল। জানালা দিয়া একটা দমকা হাওয়া আসিয়া ঐ ধূমমূর্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। মুখ দেখা হইল না।

প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম যদি আবার দেখিতে পাই। কিন্তু আর সে মূর্তি গড়িয়া উঠিল না।

২০ ফেব্রুয়ারি। সে আছে, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আমার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা নয়। দিনের বেলা সে কোথায় থাকে জানি না, কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আমার মুখের দিকে

চোখ মেলিয়া থাকে। আমি তাহাকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না তাহাই কি মিথ্যা! বাতাস দেখিতে পাই না, বাতাস কি মিথ্যা? শুনিয়াছি একপ্রকার গ্যাস আছে যাহা গন্ধহীন ও অদৃশ্য, অথচ তাহা আঘ্রাণ করিলে মানুষ মরিয়া যায়। সে গ্যাস কি মিথ্যা?

না, সে আছে। আমার মন জানিয়াছে সে আছে।

২১ ফেব্রুয়ারি। কে সে? তাহার স্পর্শ আমি অনুভব করিয়াছি, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না কেন? ছুঁইতে গেলেই সে মিলাইয়া যায় কেন? সে দেখা দিতে চেষ্টা করে জানি, কিন্তু দেখা দিতে পারে না কেন? রক্তমাংসের চক্ষু দিয়া কি ইহাদের দেখা যায় না?

আমি এখন শয়নের পূর্বে ডায়েরি লিখিতেছি, আর সে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আমার লেখা পড়িতেছে। আমি জানি। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মুখ ফিরাইলে তাহাকে দেখিতে পাইব না— সে মিলাইয়া যাইবে।

কেন এমন হয়? তাহাকে কি দেখিতে পাইব না? দেখিবার কি দুর্দম আগ্রহ যে প্রাণে জাগিয়াছে তাহা কি বলিব! তাহার এই দেহহীন অদৃশ্যতাকে যদি কোনও রকমে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারিতাম! কোনও কি উপায় নাই?

২২ ফেব্রুয়ারি। কাল রাত্রে সে আর আসে নাই। সমস্ত রাত্রি তার প্রতীক্ষা করিলাম, কিন্তু তবু সে আসিল না। কেন আসিল না? তবে কি আর আসিবে না?

নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতেছে। আমার প্রতি রজনীর সহচর সহসা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে! আর যদি না আসে?

২৩ ফেব্রুয়ারি। জানিয়াছি— জানিয়াছি! সে নারী!

এ কি অভাবনীয় ব্যাপার, যেন ধারণা করিতে পারিতেছি না। আজ সকালে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইতে গিয়া দেখি, একগাছি দীর্ঘ কালো চুল আমার চিরুনিতে জড়ানো রহিয়াছে। এ চুল আমার চিরুনিতে কোথা হইতে আসিল! বুঝিয়াছি— বুঝিয়াছি এ তাহার চুল! সে নারী! সে নারী!

কখন তুমি আমার চিরুনিতে কেশ প্রসাধন করিয়া অভিজ্ঞানখানি রাখিয়া গিয়াছ? কি সুন্দর তোমার চুল! তুমি আমায় ভালবাস তাই বুঝি আমার চিরুনিতে কেশ প্রসাধন করিয়াছিলে? আমার আরসীতে মুখ দেখিয়াছিলে কি? কেমন সে মুখ? তাহার প্রতিবিম্ব কেন আরসীতে রাখিয়া যাও নাই? তাহা হইলে তো আমি তোমাকে দেখিতে পাইতাম।

ওগো রহস্যময়ি, দেখা দাও! এই সুন্দর সুকোমল চুলগাছি যে-তরুণ তনুর শোভাবর্ধন করিয়াছিল সেই দেহখানি আমাকে একবার দেখাও। আমি যে তোমায় ভালবাসি। তুমি নারী তাহা জানিবার পূর্ব হইতেই যে তোমায় ভালবাসি।

কেমন তোমার রূপ? যে-শিমুল ফুল দিয়া প্রথম আমায় সম্ভাষণ করিয়াছিলে তাহারই মতো দিক্-আলো-করা রূপ কি তোমার? তাই কি নিজের রূপের প্রতিচ্ছবিটি সেদিন আমার কাছে পাঠাইয়াছিলে? অধর কি তোমার অমনই রক্তিম বর্ণ, পায়ের আলতা কি উহারই রঙে রাঙা!

কেমন করিয়া কোন্ ভঙ্গিতে বসিয়া তুমি আমার চিরুনি দিয়া চুল বাঁধিয়াছিলে? কেমন সে কবরীবন্ধ! একটি রক্তরাঙা শিমুল ফুল কি সেই কবরীতে পরিয়াছিলে?

আমার এই ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কখনও আমি নারীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া দেখি নাই। আজ তোমাকে না দেখিয়াই তোমার প্রেমে আমি পাগল হইয়াছি। ওগো অশরীরিণি, একবার রূপ ধরিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াও।

২৪ ফেব্রুয়ারি। তাহার প্রেমের মোহে আমি ডুবিয়া আছি। আহার নিদ্রায় আমার প্রয়োজন কি? আমার মনে হইতেছে এই অপরূপ ভালবাসা আমাকে জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে, আমার অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা জীর্ণ করিয়া জঠরস্থ অম্লরসের মতো আমাকে পরিপাক করিয়া ফেলিতেছে। এমন না হইলে ভালবাসা?

২৫ ফেব্রুয়ারি। আজ সকালে হঠাৎ মালীটার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, তাহাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। মানুষের মুখ আমি দেখিতে চাই না।

সমস্ত দিন কিছু আহার করি নাই। ভাল লাগে না— আহারে রুচি নাই। তা ছাড়া রান্নার হাঙ্গামা অসহ্য।

গরম পড়িয়া গিয়াছে। মাথার ভিতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। কাল সারা রাত্রি জাগিয়াছিলাম।

কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সে কাল আমার পাশে আসিয়া শুইয়াছিল। স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, তাহার অস্পষ্ট মধুর দেহ-সৌরভ আঘ্রাণ করিয়াছি। কিন্তু তাহাকে ধরিতে গিয়া দেখিলাম শূন্য— কিছু নাই। জানি, সে আমার চোখে দেখা দিবার জন্য, আমার বাহুতে ধরা দিবার জন্য আকুল হইয়া আছে। কিন্তু পারিতেছে না। তাহার এই ব্যর্থ আকুলতা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি।

মধ্যরাত্রি হইতে প্রভাত পর্যন্ত খোলা আকাশের তলায় পায়চারি করিয়াছি, সেও আমার পাশে পাশে বেড়াইয়াছে। তাহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কি করিলে তাহার দেখা পাইব। সে উত্তর দেয় নাই— কিংবা তাহার উত্তর আমার কানে পৌঁছায় নাই।

সকাল হইতেই সে চলিয়া গেল। মনে হইল, ঐ রক্তরাঙা শিমুল গাছটার দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চর্মচক্ষে তাহাকে দেখিতে পাওয়া কি সম্ভব নয়?

২৬ ফেব্রুয়ারি। না, রক্তমাংসের শরীরে তাহাকে পাইব না। সে সূক্ষ্মলোকের অধিবাসিনী; স্থূল মর্ত্যলোক হইতে আমি তাহার নাগাল পাইব না। আমার এই জড়দেহটাই ব্যবধান হইয়া আছে।

২৭ ফেব্রুয়ারি। আহার নাই নিদ্রা নাই। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। আয়নায় নিজের মুখ দেখিলাম! এ কি সত্যই আমি— না আর কেহ?

আমি তাহাকে চাই, যেমন করিয়া হোক চাই। স্থূল শরীরে যদি না পাই— তবে—

২৮ ফেব্রুয়ারি। হাঁ, সেই ভাল। আর পারি না।

শিমুল গাছের যে ডালটা কূপের মুখে ঝুঁকিয়া আছে তাহাতে একটা দড়ি টাঙাইয়াছি। আজ সন্ধ্যায় যখন তাহার আসিবার সময় হইবে— তখন—

সখি, আর দেরি নাই, আজ ফাগুনের সন্ধ্যায় যখন চাঁদ উঠিবে তুমি কবরী বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিও। তোমার রক্তরাঙা ফুলের থালা সাজাইয়া রাখিও। আমি আসিব। তোমাকে চক্ষু ভরিয়া দেখিব। আজ আমাদের পরিপূর্ণ মিলনরাত্রি...

বরদা আস্তে আস্তে ডায়েরি বন্ধ করিয়া বলিল, 'এইখানেই লেখা শেষ!'

১৬ ফাল্গুন ১৩৩৯

সবুজ চশমা

বরদা বলিল, "আমিও একদিন তোমাদের মতো নাস্তিক ছিলুম।"

আমরা সকলে উৎসুকভাবে নিরুত্তর রহিলাম, কারণ, এরূপ ভূমিকার উদ্দেশ্য আমাদের অজ্ঞাত ছিল না; কেবল অমূল্য মুখ বিকৃত করিয়া হাসিল।

বরদা টেবিলের উপর হইতে পা নামাইয়া বলিল, "কিন্তু একবার এমন একটা ব্যাপার ঘটল যে, তারপর প্রেতযোনিতে অবিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব। অনেক দিন আগেকার কথা— প্রায় দশ বছর হল। সে রকম ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা জীবনে কখনও হয়নি। রেলে কাটা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলুম।"

অমূল্য সক্ষোভে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "আমাদের ভাগ্যই মন্দ— কাকে দোষ দেব?"

পাছে আবার ঝগড়া বাধিয়া যায়, তাই পৃথ্বী তাড়াতাড়ি বলিল, "কাউকে দোষ দিতে হবে না। বরদা, তুমি আরম্ভ করে দাও।"

বরদা শত্রুমিত্র সকলকে সমান অগ্রাহ্য করিয়া অবিচলিতভাবে একটা চুরুট ধরাইল, তারপর আরম্ভ করিল— "কিউল জংসনের মতো এমন লক্ষ্মীছাড়া স্টেশন বোধ হয় পৃথিবীতে আর নেই। লুপ লাইন থেকে যে দিকেই যেতে চাও কিউলে অন্তত তিনটি ঘণ্টা বিশ্রাম করতে হবে।

সেবার বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিলুম— এলাহাবাদে। সন্ধ্যের সময় মুঙ্গের থেকে বেরিয়ে রাত্রি আটটা নাগাদ কিউল পৌঁছুনো গেল। সেখানে পশ্চিমের ট্রেন আসবে রাত্রি এগারোটায়— সুতরাং অফুরন্ত অবকাশ। আমার সঙ্গে কেবল একটা স্যুট্‌কেস ছিল; সেটা কুলির জিম্মা করে দিয়ে লম্বা কাঁকর-ঢাকা প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করতে লাগলুম। ক্রমে ট্রেন বেরিয়ে গিয়ে স্টেশনটা একেবারে খালি হয়ে গেল। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আর গাড়ি নেই।

কিন্তু একলা শূন্য প্ল্যাটফর্মে কাঁহাতক পায়চারি করা যায়? ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়াবার পর দেখলুম, কেউ কোথাও নেই, স্টেশন স্টাফও বোধ করি এই অবসরে একটু নিদ্রা দিয়ে নিচ্ছে; গ্যাসের বড় বড় ল্যাম্পগুলো জনহীন প্ল্যাটফর্মে অনর্থক আলো বিকীর্ণ করছে। আমিও এদিক-ওদিক চেয়ে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে ঢুকে পড়লুম, ভাবলুম, নিরিবিলি একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।— অ্যাঁ? হ্যাঁ, টিকিট ইন্টার ক্লাসেরই ছিল।

ওয়েটিং রুমের মাঝখানে একটি বড় গোছের গোল টেবিল, তার ওপর কেরোসিনের ল্যাম্প ঘোলাটেভাবে জ্বলছে। টেবিলের চারপাশে দশ-বারোখানা চেয়ার, আরাম-কেদারাও আছে। একটি চেয়ারে বসে একজন ভদ্রলোক ঝিমুচ্ছিলেন, একটা চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ তাঁর সামনে টেবিলের ওপর রাখা ছিল। আমি ঢুকতেই তিনি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা নিজের কাছে টেনে নিলেন।

আর কেউ যে ওয়েটিং রুমে আছে, তা প্রত্যাশা করিনি। যা হোক, অনধিকার প্রবেশের সঙ্কোচ দমন করে একটা চেয়ার টেনে বসলুম; ভদ্রলোক মিট্‌মিট্‌ করে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। বয়স্থ লোক, মুখে দাড়ি আছে,— ওস্তাগারের তৈরি ঝল্‌ঝলে কোট-প্যান্টলুন পরা, কিন্তু তবু বাঙালী বলে সন্দেহ হল। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলুম, 'মশায়ের কোন্‌ দিকে যাওয়া হচ্ছে?'

ভদ্রলোক ব্যাগটি তুলে নিজের কোলের ওপর রাখলেন; এমন সন্দিগ্ধ-চোখে আমার দিকে চাইতে লাগলেন, যেন তাঁর ঐ ব্যাগটি চুরি করবার জন্যই আমি ঢুকেছি। তারপর সতর্কভাবে বললেন, 'আমি বিলেত যাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললুম, 'অ্যাঁ?'

তিনি আবার বললেন, 'বিলেত যাচ্ছি। আপনি?'

লজ্জিতভাবে বললুম, 'আমি এই— কাছেই, এলাহাবাদ যাচ্ছি।'

'এলাহাবাদ? এলাহাবাদে কি করেন?'

'কিছু করি না— মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। আপনি কি কখনও সেখানে ছিলেন?'

তাঁর সতর্ক সাবধান ভাব অনেকটা কেটে গেল, তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেখানে আমি লিটন কলেজে ফিজিক্সের প্রফেসর ছিলুম— আমার নাম বিরাজমোহন সেন।'

বিরাজমোহন সেন! নামটা খুব পরিচিত, আমার মামাদের মুখে তাঁর অনেক গল্প শুনেছি; মামারা তাঁর কাছে পড়েছিলেন। বিরাজবাবু একজন নামজাদা প্রফেসর ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নিতে হয়। আমি সচকিত হয়ে উঠলুম, তারপর খুব ভাল করে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করলুম; কিন্তু তাঁর চেহারায় মাথা খারাপের কোনও লক্ষণই দেখতে পেলুম না। প্রকাণ্ড কপালখানা বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় দিচ্ছে,— উঁচু বাঁকা নাক, চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু নেই— যা পাগলামি বলে মনে করা যেতে পারে। আমি বললুম, 'আমি আপনার নাম শুনেছি— আমার মামারা আপনার ছাত্র!'

'তাই না কি? কি নাম তাদের বল তো।'

আমি নাম বলতেই তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন, 'শৈল, নীরজ! বিলক্ষণ! তাদের খুব চিনি। তুমি তাদের ভাগ্নে? বেশ বেশ! বড় খুশি হলুম।' বলে তিনি ব্যাগটা আবার টেবিলের উপর রাখলেন।

আমার বড় হাসি পেল, জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনার ঐ ব্যাগটিতে কোনও মূল্যবান জিনিস আছে— না?'

'মূল্যবান!' তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, তা বলতে পার। এমন মূল্যবান জিনিস পৃথিবীতে আর নেই।'

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি জিনিস?'

তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'একটা চশমা। বিলেতে নিয়ে যাচ্ছি স্যর অলিভার লজকে দেখাব বলে।'

আরও আশ্চর্য হয়ে গেলুম, বললুম, 'চশমা! স্যর অলিভার লজকে দেখাবেন? কিসের চশমা?'

তিনি উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন, মাথা নীচু করে বসে রইলেন, তারপর হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ভূত বিশ্বাস কর?'

'ভূত?'

'হ্যাঁ— প্রেতযোনি।'

মনে হল মাথা খারাপের কথাটা হয়তো নেহাত মিথ্যে নয়; নইলে আপাতদৃষ্টিতে এমন একজন বিজ্ঞ লোক আবোল-তাবোল কথা কয় কেন? বললাম, 'যা চোখে দেখা যায় না, তা বিশ্বাস করি না।'

তিনি একটু হাসলেন, 'যা চোখে দেখা যায় না, তাই যদি অবিশ্বাস কর, তা হলে তো পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসই অবিশ্বাস করতে হয়। এক বিন্দু জলে লক্ষ কোটি বীজাণু আছে, সে কি চোখে দেখা যায়? মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। এক্সরে দিয়ে জ্যান্ত মানুষের শরীরের গোটা কঙ্কালটা দেখা যায়— শাদা চোখে কি দেখতে পাও?'

আমি বললুম, 'তা পাই না বটে, কিন্তু ভূত যে মাইক্রোস্কোপ কিংবা এক্সরে দিয়েও দেখা যায় না।'

তিনি আবার হাসলেন, গূঢ় রহস্যময় হাসি। তারপর বললেন, 'তা বটে, কিন্তু শাদা চোখেও যে অনেকে দেখেছে!'

আমি বললুম, 'তারা হয় ভ্রান্ত, নয় ঠগ।'

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'পৃথিবীতে সকলকে ভ্রান্ত কিংবা ঠগের পর্যায়ে ফেলা যায় না— খাঁটি লোকও আছে। শিশির ঘোষ জোচ্চোর ছিলেন না, নির্বোধও ছিলেন না। কিন্তু তোমার এখন বয়স কম, নাস্তিকতাই

তোমার বয়সের ধর্ম। আমিও তোমার মতোই অবিশ্বাসী ছিলুম— বেশি দিন নয়, দু' বছর আগে পর্যন্ত আমি প্রেতযোনি সম্বন্ধে ঘোর নাস্তিক ছিলুম। তারপর হঠাৎ একদিন সব ওলট্-পালট্ হয়ে গেল। যে অপূর্ব জিনিস না জেনে আবিষ্কার করে ফেললুম, তাতে জীবনের ধারাটাই বদলে গেল।'

'কি আবিষ্কার করলেন?'

তিনি কিছুক্ষণ স্থির থেকে বললেন, 'একটা চশমা,— বাইনকুলারের লেন্সও বলতে পার।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'সেই চশমাই কি আপনার ব্যাগে রয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ চশমাই স্যর অলিভার লজকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি ব্যাপার, আমাকে সব বলুন, আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে।'

তিনি বললেন, 'লোকের কাছে বলে যে রকম হাস্যাস্পদ আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তাতে কাউকে বলতে ইচ্ছে করে না। যা হোক, তুমি যখন আগ্রহ প্রকাশ করছ, তখন শোনো—

'আমি বিজ্ঞানের অধ্যাপক; বিজ্ঞানের রাজ্যে বাতিক খেয়াল কল্পনার স্থান নেই— সেখানে নীরস নিষ্ঠুর সত্যের কারবার। সুতরাং ভূতপ্রেত সম্বন্ধে আমার মনে যে একটা মজ্জাগত বিরুদ্ধতা থাকবে, তা সহজেই অনুমান করতে পারবে। ভেবে দেখ, নিঃসংশয়ে ভূতপ্রেত বিশ্বাস করা যেতে পারে, এমন জোরালো প্রমাণ আজ পর্যন্ত কিছু পাওয়া গেছে কি? সবই ধোঁয়া-ধোঁয়া— অনিশ্চিত— বৈজ্ঞানিক কেউ কেউ স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞান স্বীকার করেনি। বিজ্ঞান চায় নিরেট স্থূল সত্য, আবছায়া অস্পষ্ট কিছু সে চায় না।

'তাই শিক্ষার গুণে আমিও চিরদিন ভূতপ্রেতকে ঠাট্টাই করে এসেছি— কোনান্ ডয়েল, স্যর অলিভার লজ— এদের ভ্রান্ত খেয়ালী মনে করেছি,— কখনও ভাবিনি যে, আমিই একদিন অন্যকে বিশ্বাস করাবার জন্য ছুটোছুটি করে বেড়াব আর তারা আমাকে পাগল মনে করে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। এইটেই বোধ হয় আমার জীবনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস।

'বছর দুই আগে কলেজের ল্যাবরেটরিতে আমি দূরবীনের লেন্স নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছিলুম। একটা বড় সবুজ রংয়ের ক্রিস্ট্যাল এক দিন কুড়িয়ে পেয়েছিলুম— সেইটে— কিন্তু তুমি বোধ হয় আর্টস স্টুডেন্ট, সব কথা বুঝবে না। মোটামুটি বলে রাখি, একটা অদ্ভুত ফিকে সবুজ রংয়ের ক্রিস্ট্যাল হাতে এসে পড়েছিল; তাই থেকে নিজের হাতে কতকগুলো লেন্স তৈরি করেছিলুম। যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে হাতে করে ঘষে ঘষে লেন্স তৈরি করা সহজ নয়, বিস্তর সময় লাগে, তা ছাড়া সব-সময় নির্ভুল হয় না— বাঁকাচোরা থেকে যায়। কিন্তু আমার খেয়াল হয়েছিল, তাই নিজের হাতেই তৈরি করছিলুম।

'একদিন দুপুরবেলা,— তখনও লেন্স সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি— কেমন হচ্ছে দেখবার জন্যে আমি সেগুলোকে ফ্রেমের ওপর বসিয়ে চোখে পরলুম। চশমার দোকানে চোখ পরীক্ষা করবার সময় যে-রকম ফ্রেম চোখে পরিয়ে দিয়ে তাতে বিভিন্ন শক্তির কাচ বসিয়ে বসিয়ে পরখ করে, দেখেছ বোধ হয়?'

আমি ঘাড় নাড়লুম। বিরাজবাবু বলতে লাগলেন— 'দুপুরবেলা ল্যাবরেটরিতে কেউ ছিল না, আমি দোর বন্ধ করে একা কাজ করছিলুম। কিন্তু চশমা চোখে দিয়ে মুখ তুলেই দেখলুম একজন লোক ঠিক আমার সামনের চেয়ারে বসে একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে রয়েছে। লোকটা সায়েব, টক্‌টকে গোলাপী রং, মুখে ছুঁচোলো দাড়ি। তার অদ্ভুত বেশভূষা— মধ্যযুগে য়ুরোপীয়রা যে রকম মখমলের জরিদার পোষাক পরত, সেই রকম। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি চশমা খুলে ফেললুম,— দেখলুম, কেউ কোথাও নেই, চেয়ার খালি।

'খানিকক্ষণ কিছুই বুঝতে পারলুম না; তারপর আবার চশমা পরে দেখলুম,— লোকটা বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে চলে গেল।'

বিরাজবাবু চুপ করলেন। আমি রুদ্ধ শ্বাসে প্রশ্ন করলুম, 'তারপর?'

বিরাজবাবু বললেন, 'এমনই অভাবনীয় এই ঘটনা যে, ব্যাপারটা ভাল করে হজম করতেই কয়েক দিন কেটে গেল। শেষে বুঝলুম ভুল নয়, সত্যিই অজ্ঞাতসারে একটা অপূর্ব জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছি— যার সাহায্যে সূক্ষ্ম দেহও প্রত্যক্ষ করা যায়!

'এ জিনিস নিয়ে কি করব, প্রথমটা ভেবেই পেলুম না। শেষে ঠিক করলুম আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বলব। তাঁর কাছে গেলুম, একটু উত্তেজিত ভাবেই আমার আবিষ্কারের কথা বললুম। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "সেন, আপনার শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনি কিছুদিন ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করুন।"

'নিরাশ হয়ে তাঁর কাছ থেকে ফিরে এলুম। তারপর প্রফেসরদের মধ্যে আমার অন্তরঙ্গ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বললুম। তাঁরাও আমাকে ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করবার উপদেশ দিলেন। আশ্চর্য আমাদের দেশের লোকের মনোভাব! কেউ একবার জিনিসটা দেখতে চাইলেন না— একবার বললেন না, দেখি আপনার কথা সত্যি কি মিথ্যে।

'মরীয়া হয়ে আমি য়ুনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যান্সেলারকে এক দরখাস্ত করলুম। তাঁকে সব কথা জানিয়ে লিখলুম যে, তিনি যদি ইচ্ছে করেন, আমি সর্বসমক্ষে ডিমন্স্ট্রেট্ করে দেখাতে রাজী আছি।

'হপ্তাখানেক পরে আমার চিঠির জবাব এল। ইতিমধ্যে বোধ হয় আমার পাগলামির কানাঘুষো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল; ভাইস্-চ্যান্সেলার সাহেব বিনীতভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি যদি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার দরখাস্ত করি, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হবে।— রাগের মাথায় কাজ ছেড়ে দিলুম।

'তারপর সারা ভারতবর্ষে যত বিজ্ঞ সুধী আছেন, সকলের দোরে দোরে চশমা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি,— এমন সব লোকের কাছে গিয়েছি— যাঁদের পৃথিবী-জোড়া নাম; কিন্তু সকলের কাছেই এক উত্তর পেয়েছি। কেউ হেসেছেন, কেউ তাড়িয়ে দিয়েছেন, কেউ বলেছেন সময় নেই; কিন্তু আমার কথাটা সত্যি কি মিথ্যে, তা যাচাই করে দেখবার কৌতূহল কারুর হল না।

'যখন দেখলুম, এ দেশে এই মহামূল্য আবিষ্কারের মর্ম কেউ বুঝবে না, তখন স্থির করলুম— বিলেত যাব। সেখানে অন্তত একজন লোক আছেন— যিনি প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী— যিনি আমার কথা না শুনে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

'ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছিল। বললে বিশ্বাস করবে না, চশমার ওপর নানারকম অলৌকিক উৎপাত হতে শুরু করেছিল। প্রেতলোকের যবনিকা মানুষের চোখ থেকে সরে যায়, এটা বোধ হয় তাদের অভিপ্রেত নয়, তাই রোজ চশমাটার ওপর নতুন নতুন দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। কখনও অকারণে হাত থেকে পড়ে যায়, কখনও ট্রেনে ব্যাগসুদ্ধ হারিয়ে যায়, কখনও চোরে চুরি করতে আসে— এই ধরনের ব্যাপার। যখনই চশমা চোখে দিই, দেখি, ওরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, চশমাটা ভেঙে ফেলবার ইঙ্গিত করছে। একবার একটা অদৃশ্য হাত আমার চুল ধরে এমন নাড়া দিলে যে, চশমাটা চোখ থেকে ছিটকে মেঝেয় পড়ল। ভাগ্যে কার্পেট ছিল, নইলে সেই দিনই ওটা যেত। যা হোক, অনেক কষ্টে অনেক যত্নে এখন পর্যন্ত তাকে অটুট রেখেছি— জানি না, শেষ পর্যন্ত স্যার অলিভার লজের কাছে নিয়ে যেতে পারব কি না। এ হচ্ছে যাকে বলে একটা freak, এর অবিকল নকল কখনও তৈরি হবে না।'

ভদ্রলোকের অত্যাশ্চর্য কথাগুলো আমার বদ্ধমূল অবিশ্বাসের গোড়ায় যেন প্রবল নাড়া দিয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা, এই চশমা যে-কেউ চোখে দিলেই ভূত দেখতে পাবে?'

'হ্যাঁ— নিশ্চয় পাবে— যদিও সে পরীক্ষা করবার সুযোগ আজ পর্যন্ত পাইনি। আমি নিজে যতবার পরেছি, ততবারই দেখেছি।'

আমি আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে বললুম, 'তাহলে আমাকে একবার দেখাতে পারেন?'

'নিশ্চয় পারি।'— তিনি সানন্দে ব্যাগটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললেন, 'দেখাবার জন্যে আমি ছটফট

করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কেউ দেখছে না।'

ব্যাগ খুলে তিনি সযত্নে একটি তুলোয় মোড়া চামড়ার কেস্ বার করলেন, তারপর অতি সন্তর্পণে কেস্‌টি খুললেন। কেসের মধ্যে একটি মজবুত গোছের চশমা— ঠিক চশমা নয়, আজকাল একরকম বাইনকুলার চশমা বেরিয়েছে, অনেকটা সেইরকম দেখতে। সামনে কতকগুলো সবুজ কাচ লাগানো— তার আশেপাশে পেতলের স্ক্রু। টর্টইজ-শেলের মোটা-মোটা আর্ম। বিরাজবাবু উঠে এসে সাবধানে আমার নাকের ওপর চশমাটি বসিয়ে দিলেন।

প্রথমে কিছুই দেখতে পেলুম না— কেবল সবুজ ধোঁয়া। বিরাজবাবু স্ক্রু ঘোরাতে ঘোরাতে কম্পিতস্বরে বললেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছ? এবার? এবার? এবার?'

ক্রমশ চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হতে লাগল— মনে হল যেন ধোঁয়া আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর বায়স্কোপের ছবির মতো স্পষ্ট জিনিস দেখতে পেলুম।

ঘরে কেরোসিনের যে ল্যাম্পটা জ্বলছিল, তাতে সামান্য আলো হচ্ছিল, কিন্তু চশমার ভেতর দিয়ে দেখলুম,— আলো ঢের বেশি; উজ্জ্বল অথচ মোলায়েম। সে রকম অলৌকিক আলো কখনও দেখিনি— কোথা থেকে আসছে বোঝা যায় না অথচ সর্বত্র সমান ভাবে পড়েছে,— কোথাও ছায়া নেই। আশ্চর্য আলো — এইটেই বোধ হয় প্রেতলোকের দীপ্তি!

কিন্তু আলোর কথা থাক! সেই আলোতে যা দেখলুম, তা ভয়াবহ কিছু না হলেও হৃৎপিণ্ডটা একবার ডিগবাজি খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দেখলুম, টেবিল ঘিরে প্রত্যেক চেয়ারে একটি করে লোক বসে আছেন— তাঁদের পেছনে মাথার পর মাথা, ঘরের মধ্যে তিল ফেলবার জায়গা নেই! আর, সবাই তীব্র নির্নিমেষ চোখে আমার পানে তাকিয়ে রয়েছেন।

বিরাজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখতে পাচ্ছ?'

গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না, তাই উত্তর দেওয়া হল না। ডান দিকে মাথা ফিরিয়ে দেখি, আমার গা ঘেঁষে একটি প্রেত দাঁড়িয়ে মুখের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে আছেন। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি— ঠিক তাই। আমার মাথার চুলগুলো শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল, হৃৎপিণ্ডটা আবার সচল হয়ে গলার কাছে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল।

এঁদের যে কত রকম চেহারা, তা বর্ণনা করা যায় না। সাহেব আছেন, চীনাম্যান আছেন, ভারতীয় লোক আছেন, আবার নিকষকান্তি নিগ্রোও রয়েছেন— কোনও ভেদজ্ঞান নাই। একজন শীর্ণকায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ এবং একটি পালক-দেওয়া টুপি পরা যোল শতাব্দীর সায়েব পাশাপাশি বসে রয়েছেন দেখলুম। সকলেরই দৃষ্টি আমার ওপর— ভাবে মনে হল, কেউ আমার প্রতি সন্তুষ্ট নন। যেন দাবি জন্মাবার আগেই আমি তাঁদের রাজ্যে ঢুকেছি বলে তাঁরা আমার ওপর ভয়ঙ্কর চটেছেন।

ক্রমে তাঁদের মধ্যে একটা আলোচনা শুরু হল দেখলুম; কানে কিছুই শুনতে পেলুম না, কিন্তু মুখ আর হাত নাড়া দেখে আন্দাজ হল যে, খুব উত্তেজিতভাবে তর্ক চলছে— এবং আমি যে এই তর্কের লক্ষ্যবস্তু তাতেও সন্দেহ রইল না। শেষে সেই পৈতে-পরা শীর্ণ ব্যক্তিটি আমার দিকে ফিরে আঙুল দেখিয়ে খুব তীব্রভাবে কি বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোনও ফল হল না, তিনি কি বললেন আমি এক বর্ণও শুনতে পেলুম না।

অনেকক্ষণ বক্তৃতা দেবার পর তিনি টেবিলের ওপর একটা নিঃশব্দ চপেটাঘাত করে চুপ করলেন। তখন আবার তাঁদের মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হল।

এই সমস্ত ব্যাপার দেখতে দেখতে আমার মনের অবস্থাটা কি রকম হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলিনি; বলবার দরকারও নেই। তোমরা সহজেই আন্দাজ করে নিতে পারবে। চশমার ভিতর দিয়েই যে এই ভূতের রাজ্য দেখতে পাচ্ছি, চশমা খুলে ফেললে আর দেখতে পাব না, এ কথা সাফ ভুলে গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল শাদা চোখেই এঁদের দেখছি। যেন নির্জন মনুষ্যহীন একটা জায়গায় একপাল ভূতের মধ্যে এসে

পড়েছি, তারা আমাকে ঘিরে বসে আমার ভাগ্য বিচার করছে।

তাদের তর্কের উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। আমার মনে হল আমাকে নিয়ে এরা ভীষণ কাণ্ড একটা কিছু বাধাবে। আমার বুদ্ধি বিবেচনা যা সামান্য অবশিষ্ট ছিল তাদের কাণ্ড দেখে তাও লুপ্ত হয়ে গেল। চশমাটা খুলে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যেত, কিন্তু তা না করে আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালুম।

অমনি তারাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, তারপরে কি একটা ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প করে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে আস্তে আস্তে আমার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না, বিকট চিৎকার করে চেয়ার উল্টে ফেলে দরজার দিকে দৌড় মারলুম।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দৌড়ুতে দৌড়ুতেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম, তারা তেমনই ভিড় করে আমার পিছনে তেড়ে আসছে। এই সময় একটা বিরাট রৈরৈ শব্দ কানে গেল— 'খবরদার!' 'হুঁসিয়ার!' 'ট্রেন আতা হ্যায়!' সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত ট্রেনের ফোঁস ফোঁস হড়্-হড়্ শব্দ! ঠিক প্ল্যাটফর্মের কিনারায় পৌঁছে আমি হ্যাঁচকা মেরে নিজেকে সামলে নিলুম— গরম এঞ্জিনটা সোঁ সোঁ শব্দ করে আমার প্রায় নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁচকা দিয়ে নিজেকে সামলালুম বটে, কিন্তু ভারি চশমাটা নাকের উপর থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল ঠিক লাইনের ওপরে, আর গাড়ির চাকাগুলো গড়্গড়্ করে সেটাকে গুঁড়ো করে দিয়ে চলে যেতে লাগল।

আমার হাতে পায়ে আর জোর ছিল না, অবশভাবে আমি প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপরেই শুয়ে পড়লুম। চেতনা লুপ্ত হয়ে আসছিল, মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করছিল— তারই মধ্যে ক্ষীণভাবে শুনতে লাগলুম, মন্দীভূত ট্রেনের চাকার আর লোহালক্কড়ের শব্দ— মনে হল, যেন এতক্ষণে সে প্রেতগুলো সবাক হয়ে আমাকে ঘিরে বিচিত্র স্বরে মহা আনন্দের হাসি হাসছে।

মিনিট কয়েক পরে সংজ্ঞা হয়ে দেখলুম, আমার চারিদিকে অসংখ্য লোকের ভিড় জমে গেছে, আর বিরাজবাবু পাগলের মতো আমার দুটো নড়া ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছেন— আর বলছেন, 'কি করলে— আমার চশমা কই? আমার চশমা কই? আমার চশমা—'

মূর্ছা যাওয়াই সদ্‌যুক্তি বিবেচনা করে আমি আবার মূর্ছিত হয়ে শুয়ে পড়লুম।

২৬ শ্রাবণ ১৩৪০

বহুরূপী

এটা বরদার গল্প হইলে কখনই বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্যাপারটা আমার চোখের সম্মুখেই ঘটিয়াছিল, সুতরাং হাসিয়া উড়াইয়া দিবার আর পথ নাই। যদিও বরদা মূলতঃ এই ঘটনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল, তবু এত বড় ভোজবাজি তাহার মতো মিথ্যেবাদীর পক্ষেও অসম্ভব বলিয়া মনে করি।

গত শীতকালে বরদার মস্তকে হঠাৎ বিষয়বুদ্ধি চাগাড় দিয়া উঠিয়াছিল। শহর হইতে মাইল পনের দূরে— বেহারের গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে দেহাত বলে— সেই অজ পাড়াগাঁয়ে বরদার কিছু ধান জমি ও কয়েক ঘর কায়েমী প্রজা ছিল। এতকাল ফৌজদার সিং নামক জনৈক শিশোদীয়বংশীয় রাজপুত এই সকল বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু হঠাৎ বরদা শিশোদীয় রাজপুতের সততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া স্বয়ং দুর্জয় শীতে ধান কাটাইবার জন্য প্রস্থান করিল। দশ দিনের মধ্যে তাহার আর কোনও খবরই পাওয়া গেল না।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ক্লাবে বসিয়া অনর্গল মিথ্যা কথা না বলিলে যাহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়, সঙ্গীহীন পাড়াগাঁয়ে তাহার এই দীর্ঘ প্রবাস কি করিয়া কাটিতেছে, এই প্রশ্ন আমাদের উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। সেখানে বরদা কাহাকে আষাঢ়ে গল্প শুনাইতেছে? আমরা ভাবিয়াছিলাম, দু'দিন যাইতে না যাইতেই সে পলাইয়া আসিবে— কিন্তু এ কি! দশ দিন কাটিয়া গেল এখনও তাহার দেখা নাই। তাহার বাড়িতে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বরদা নিজের কাছারি বাড়িতে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে, শীঘ্র গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা নাই; ধান কাটানো যে কিরূপ আনন্দদায়ক কার্য তাহাই উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া লম্বা চিঠি লিখিয়াছে। শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

অমূল্য বলিল, 'ধান-টান সব মিছে কথা, যা হয়েছে আমি বুঝেছি। বরদার বৌ ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বঙ্গ-মহিলা হলেও ধৈর্যের একটা সীমা আছে তো।'

তা সে কারণ যাহাই হোক, বরদার অভাবে ক্লাবের সান্ধ্য অধিবেশনগুলি নিঝুম ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতে লাগিল। বরদা যতই মিছে কথা বলুক, সে একজন সত্যকার মজলিশি লোক তা ক্রমশ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম; এমন কি অমূল্যকে দেখিয়াও মনে হইতে লাগিল, তর্ক করিবার একজন প্রতিপক্ষের অভাবে সে ভিতরে ভিতরে বিশেষ মুষড়িয়া পড়িয়াছে।

অবশেষে চৌদ্দ দিনের দিন বরদার চিঠি আসিল; তাহার বাড়ির চাকর রঘুয়া চিঠিখানা ক্লাবে দিয়া গেল। ক্লাবের সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বরদা চিঠি দিয়াছে; পাঠ করিয়া তাহার দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের যথার্থ কারণ অজ্ঞাত রহিল না। বরদা লিখিয়াছে—

বন্ধুগণ, তোমরা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস কর না; আমি কাল্পনিক ভূতের গল্প বানাইয়া বলি এরূপ ইঙ্গিতও মাঝে মাঝে করিয়া থাক। তোমাদের মতো অন্ধ নাস্তিকের বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই; তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিজের চোখে ভূত দেখিতে চাও? স্বকর্ণে ভূতের কথা শুনিতে চাও? ভূতের সহিত করকম্পন করিতে চাও?

আমি এখানে আসিবার পর আমার কাছারি বাড়িতে একটি অশরীরী আত্মার সহিত পরিচয় হইয়াছে। অত্যন্ত মিশুক লোক, প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমাদের গল্প-গুজব আলাপ-আলোচনা হয়। তিনি

তোমাদের সহিত আলাপ করিতে রাজী হইয়াছেন। যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, সকলে মিলিয়া এখানে চলিয়া এস। এক রাত্রি থাকিলেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে।

কবে আসিতেছ জানাইও। এখানে আসিতে হইলে তারাপুর পর্যন্ত বাসে আসিতে হয়, সেখান হইতে আমার আস্তানা পদব্রজে আড়াই মাইল। রাস্তাঘাট নাই বটে, কিন্তু এসময়ে কোনও কষ্ট হইবে না। তারাপুর থানায় খোঁজ লইলে সেখানকার চৌকিদার পথ দেখাইয়া দিবে। ইতি

তোমাদের বরদা

চিঠি পড়িয়া অমূল্য বলিল, 'হুঁ, এই চৌদ্দ দিন জিরিয়ে নিয়েছে কিনা, একটা বড় রকম বুজরুকি দেখাবে।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু ভূতের সঙ্গে করকম্পনটা হবে কি করে?'

পৃথ্বী বলিল, 'সেটা যথাস্থানে পৌঁছে পরীক্ষা করে দেখা যাবে। তা হলে কবে যাওয়া স্থির করছ?'

গবেষণার পর স্থির হইল আগামী মঙ্গলবার আমি, অমূল্য, পৃথ্বী ও চুনী এই চারজন, পূর্বাহ্নে কোনও খবর না দিয়াই বরদার আড্ডায় গিয়া হানা দিব। বড়দিনের ছুটি আসিয়া পড়িয়াছে, প্রেতাত্মার সহিত করকম্পনের মহাসৌভাগ্য যদি নাও ঘটে তবু একটা আউটিং তো হইবে। ওদিকটাতে শিকারও ভাল পাওয়া যায়।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা চারিজন বৈকালে আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় বাস হইতে অবতরণ করিয়া হাঁটা পথ ধরিলাম। ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়া যাহাদের চলা অভ্যাস নাই তাহাদের পক্ষে এই পথে পদক্ষেপ সর্বদা নিরুদ্বেগ নয়, মাঝে মাঝে অতর্কিতভাবে পথিপার্শ্বস্থ পঙ্কশয্যায় বিশ্রাম করিবার সুযোগ ঘটিয়া যায়। কিন্তু সে যাহাই হোক, আড়াই মাইল পথ যে এত দীর্ঘ হইতে পারে, তাহা পূর্বে কখনও ভাবিতে পারি নাই! অমূল্য শ্লেষ করিয়া বলিল, মাইলগুলা সম্ভবত ভৌতিক মাইল, তাই তাহাদের আদি অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

এই অতি-প্রাকৃত আড়াই মাইলের শেষে যখন বরদার আস্তানায় আসিয়া পৌঁছিলাম তখন পৃথিবীপৃষ্ঠে দিনের আলো আর নাই, কেবল পশ্চিম আকাশে শীর্ণ সন্ধ্যালোক মুমূর্ষুর প্রাণশক্তির মতো নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছে।

চারিদিকে কোথাও মানুষের বসতি নাই, আবছায়া ধানক্ষেতের মাঝখানে বিঘাখানেক পতিত জমি, তাহারই একপ্রান্তে একটি জীর্ণ ইটের ঘর— চারিপাশে অপরিসর একটু বারান্দা, মাথার উপর খড়ের ছাউনি। পতিত জমির উপর স্থানে স্থানে খড়ের স্তূপ রাখা আছে। প্রথমটা লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, ঠিক স্থানে পৌঁছিয়াছি কি না সন্দেহ হইতে লাগিল। অনতিদূরে একটা শিকলে বাঁধা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া ছিল, কাছে গিয়া দেখিলাম বরদার কুকুর—খোক্কস। খোক্কসের সহিত আমাদের প্রণয় ছিল, কিন্তু সে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিল না, নিদ্রালুভাবে একবার তাকাইয়া আবার থাবার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

কিন্তু বরদা কোথায়? ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে না; এদিক ওদিক চাহিতে দেখি খড়ের একটি গাদার তলা হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি প্রাণী বাহির হইয়া আসিতেছে। মূর্তিটি ক্রমে খাড়া হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া ফৌজী সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা ভাবিয়াছিলাম বুঝি বরদার শিশোদীয়বংশীয় রাজপুত; কিন্তু দেখিলাম— তাহা নয়, নেপাল হইতে অবতীর্ণ চন্দ্রবংশীয় একজন ক্ষত্রিয়। সম্ভবত বরদার দেউড়ি পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিধানে খাকি পোষাক, পায়ে বুট জুতা, কোমরে কুক্রি— রীতিমতো যোদ্ধৃবেশ। তাঁহাকে বরদার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি চন্দ্রবংশীয় ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না।

শীতে এতখানি পথ হাঁটিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; আমরা আর বাক্যব্যয় না করিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নির্বিকার মুখে আবার খড়ের গাদার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমরা যেখানে ছিলাম সেখান হইতে ঘরটা বোধ করি ত্রিশ কদম দূরে। বারান্দাসুদ্ধ ঘরের ভিত মাটি হইতে হাত দুই উঁচুতে অবস্থিত। বারান্দায় উঠিয়া সম্মুখেই ঘরের দ্বার; আমি সর্বপ্রথম উপরে উঠিয়া দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়াই চমকাইয়া উঠিলাম!— অন্ধকার দরজার মুখে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পরক্ষণেই বরদা সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'এস। খবর না দিয়ে এলে যে; আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না?'

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। বরদা একটা তেলের ল্যাম্প জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখিল।

অমূল্য ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল, 'ঘরেই ছিলে তো— সাড়া দিচ্ছিলে না কেন?— দেয়ালা হচ্ছিল বুঝি?'

উত্তরে বরদা কেবল হাসিল। বলিল, 'বসো সবাই। শীতে নিশ্চয় কালিয়ে গিয়েছ। চা তৈরি আছে— দিচ্ছি।' বলিয়া প্রকাণ্ড একটা থার্মোফ্লাস্ক হইতে ধূমায়িত চা ঢালিয়া সকলকে দিতে লাগিল।

চা খাইতে খাইতে বরদার ঘরের চতুর্দিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘরের কোথাও এতটুকু প্লাস্টার নাই, নোনাধরা লাল ইটগুলি সারি সারি দাঁত বাহির করিয়া আছে; মেঝে মাটির, গোময় দিয়া লিপ্ত। এক কোণে একটি ক্ষুদ্র চারপাইয়ের উপর বরদার লেপ-বিছানা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। আর এককোণে একটি বড় কাঠের সিন্দুক, তাহার উপর চায়ের সরঞ্জাম স্টোভ ইত্যাদি রাখা আছে; ঘরের মধ্যস্থলে একটি কেরোসিনকাঠের টেবিল, এবং তাহাই ঘিরিয়া কয়েকটি কঞ্চির মোড়ার উপর বসিয়া অনুজ্জ্বল ল্যাম্পের আলোয় আমরা কয়জন চা পান করিতেছি।

খোলা দরজা দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছিল, বরদা সেটা বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিল; তৃপ্তভাবে দুই হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল, 'আমার ঘরটি কেমন দেখছ? ঘর ছিল না, কেবল চারিটি পুরানো দেওয়াল দাঁড়িয়ে ছিল; আমি এসে খড়ের চাল তুলে বাসের উপযোগী করে নিয়েছি।— বেশ হয়নি?'

'খাসা হয়েছে!'

'পেয়াদা সেপাই চিরকাল বাইরে খড়ের ছাপ্পর তৈরি করে তার মধ্যে থাকে; এবারও তাই আছে। কিন্তু আমি ভাই পারলুম না। তেরপলের তলায় এক রাত্তির শুয়েছিলুম— বাপ কি শীত! ঘরের মধ্যে এক রকম ভালই আছি। আচ্ছা, ঘরটা তোমাদের বেশ ইয়ে বোধ হচ্ছে না?'

আমরা সকলেই ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলাম। 'ইয়ে' বলিয়া বরদা ঠিক কি বুঝাইতে চাহিল জানি না, কিন্তু এই ঘরে পদার্পণ করিবার পর হইতেই আমার মনের উপর কেমন একটা ছায়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, মনের সে পরিহাস-তরল ভাব আর ছিল না। কোথায় এ ঘরের কি গলদ আছে— বুঝিতে পারিতেছিলাম না, অথচ অপরিচিত অন্ধকার পথে চলিবার সময় যেমন চক্ষু-কর্ণের তীক্ষ্ণতা অজ্ঞাতসারেই বাড়িয়া যায়, তেমনি একটা দুর্লক্ষ্য অবাস্তবতার সংশয় আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিশয় সতর্ক ও সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল।

চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া অমূল্য বলিল, 'তারপর, তোমার ভূত কই?'

বরদার হাসিমুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হইয়া গেল। সে যেন কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হইয়া কি শুনিল, তারপর অমূল্যর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, 'ভয় নেই, তাঁর পরিচয় পাবে; মিছে তোমাদের এত দূর ডেকে আনিনি।'

চুনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কতক্ষণে তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে? তাঁর আসার সময়ের কিছু স্থিরতা আছে কি?'

বরদা বলিল, 'কিছু না। শুধু তাই নয়, কোন্ রূপে তিনি আসবেন, তারও স্থিরতা নেই।'

আমরা মোড়া টানিয়া আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিলাম। পৃথ্বী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'সেটা কি রকম!'

বরদা বলিল, 'তিনি মানুষের রূপ ধারণ করে আসেন বটে, কিন্তু চেহারা সব সময় এক রকম হয় না।'

'তার মানে কি?'

'তার মানে—' বরদা যেন একটু ইতস্তত করিল— 'অশরীরী আত্মাকে স্থূল দেহ ধারণ করতে হলে কিছু জান্তব মাল-মশলার দরকার হয়, তার নাম বিজ্ঞানের ভাষায় এক্‌টোপ্লাজম্। এই এক্‌টোপ্লাজম্ প্রয়োজন মতো

না পেলে চেহারা একটু অন্যরকম হয়ে যায়।'

অমূল্য বলিল, 'ও, তোমার সেই পুরাতন থিওরি! কিন্তু তোমার ইনি এক্‌টোপ্লাজম্ পান কোথা থেকে!'

বরদা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, 'বোধ হয় খোক্কসের গা থেকে। তিনি যতক্ষণ থাকেন, কুকুরটা নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে,— নড়েচড়ে না, ডাকেও না— তবে শুধু যে এক্‌টোপ্লাজমের তারতম্যে চেহারার তারতম্য হয় তা নয়, অন্য কারণও আছে।'

'অন্য কারণটি কি?'

'ইচ্ছা। প্রেতযোনি ইচ্ছা করলেই চেহারা বদল করতে পারে; কারণ, তাদের দেহের উপাদান মানুষের দেহের উপাদানের মতো কঠিন বস্তু নয়।'

এই সময়ে বরদাকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম। এ কয়দিনে তাহার কি একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরোক্ষ বিশ্বাসের গণ্ডী ছাড়াইয়া যেন সে সাক্ষাৎ উপলব্ধির দৃঢ়তর ভিত্তির উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার্কিকের যুযুৎসা একেবারেই নাই, মুখে একটা নিঃসংশয় প্রসন্নতার ভাব, ঠোঁটের কোণে একটু সকৌতুক কোমলতা ক্রীড়া করিতেছে। বরদার এই অবস্থান্তর আমার মনের ছায়াকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিল।

পৃথ্বী বলিল, 'থিওরি যাক। এখন ঘটনাগুলো বল শুনি— তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কতদূর দাঁড়িয়েছে, কোথায় প্রথম সাক্ষাৎ হল ইত্যাদি। অর্থাৎ তোমাকে আগাগোড়া গল্পটা বলবার সুযোগ দিচ্ছি। আরম্ভ কর।'

বরদা একটু হাসিয়া বলিল, 'বেশ।' তারপর আবার যেন কান পাতিয়া কি শুনিল— 'দ্যাখো, একটা কথা তোমাদের বলে রাখি। যদি কোনও সময় বুঝতে পারো যে তিনি এসেছেন— ভয় পেও না। ভয় পেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

চারিদিকে সচকিতভাবে একবার চাহিয়া আমরা আশ্বাস দিলাম, ভয় পাইব না। বরদা তখন বলিতে আরম্ভ করিল—

'প্রথম যে-রাত্রে এ ঘরে শুই, সে-রাত্রে কিছু বুঝতে পারিনি। দ্বিতীয় রাত্রে হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল; শুনতে পেলুম, ঘরের মধ্যে কে খস্‌খস্ করে চলে বেড়াচ্ছে। দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলাম, ভাবলুম, সিঁদ কেটে চোর ঢুকেছে। বালিশের তলায় টর্চ ছিল, হঠাৎ জ্বেলে ঘরের চারিদিকে ফেললুম। কেউ কোথাও নেই।

'আবার আলো নিভিয়ে যেই শুয়েছি অমনি খস্‌খস্ শব্দ আরম্ভ হল। আবার আলো জ্বাললুম। এই রকম তিন-চার বার হল। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারলুম। চিরজীবন এই বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, তবু বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। আলো নিভিয়ে গলার স্বর যথাসাধ্য সংযত করে বললুম, 'আপনি কে আমি জানি না; কিন্তু আপনার যদি কিছু বলবার থাকে আমাকে বলতে পারেন।'

'মনে হল, কে যেন আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলুম, "আপনি ভয় পাবেন না।"

'লেপের মধ্যে থেকেও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, বললুম, "না।"

'তিনি মৃদু কণ্ঠে একটু হাসলেন! যেন আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। হাসি শুনে আমার মনে সাহস হল; ভারি সহানুভূতিপূর্ণ নরম হাসি— একটু করুণ। আমি বললুম, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।"

'চোখে কিছুই দেখতে পেলুম না, অনুভবে বুঝলুম, তিনি আমার বিছানার পাশে বসলেন। তারপর নিঃশ্বাসের মতো মৃদুস্বরে বললেন, "আমি এই ঘরটাতে থাকি। আপনি এসে পর্যন্ত আলাপ করবার জন্য ছটফট করছি, কিন্তু পাছে আপনি ভয় পান— তাই সাহস হচ্ছিল না।"

'আমি কি বলব ভেবে পেলুম না। তিনি বলতে লাগলেন, "এইখানে প্রায় পঁচিশ বছর আছি। ঘরটা আমিই তৈরি করিয়েছিলুম, তারপর মৃত্যুও হল এইখানেই। প্লেগ হয়েছিল, সৎকার করবার লোক ছিল না, মৃতদেহটাকে শেয়াল-কুকুরে ছেঁড়াছেঁড়ি করলে... সেই থেকে এ জায়গা ছেড়ে যাবার আমার উপায় নেই... একলাই থাকি। আপনি এসেছেন দেখে ভারি আনন্দ হল; কারুর সঙ্গে তো মিশতে পারি না,— দুটো কথা কইবারও সুযোগ হয় না। সবাই ভয় পায়; অথচ আমি— আমরা কারো অনিষ্ট করতে চাই না— ক্ষমতাও

নেই।— কেন বলুন দেখি সবাই ভয় পায়?"

'এ প্রশ্নের উত্তর জানি না, তাই জবাব দেওয়া হল না। তিনি বললেন, "আমি যদি মাঝে মাঝে এসে আপনার সঙ্গে গল্পসল্প করি, আপনার কষ্ট হবে না তো?"

'আমি বললাম, "না, বরং খুশি হব।"

'তিনি গাঢ় স্বরে বললেন, "ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমাকে চোখে দেখলে কি আপনি খুব ভয় পাবেন? সত্যি বলছি আমার চেহারা বীভৎস নয়— সাধারণ মানুষের মতো।"

'বুকের ভেতর দুরু দুরু করে উঠল, কিন্তু বললুম, "না, ভয় পাব না।"

'তিনি বললেন, "তবে আলোটা জ্বালুন।"

'মনকে দৃঢ় করে টর্চ জ্বাললুম। মুহূর্তের জন্য তাকে দেখতে পাওয়া গেল। আমাদেরই সমবয়স্ক একটি যুবক, ময়লা রং, বড় বড় চুল— আগ্রহভরা চোখে আমার পানে চেয়ে রয়েছেন। নিতান্তই সহজ মানুষের চেহারা, ভয় পাবার কিছু নেই, কিন্তু তবু বুদ্ধি-বিবেচনা কোনও কাজেই লাগল না, সমস্ত অন্তরাত্মা যেন ভয়ে আঁতকে উঠল। মূর্তিও সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। শুনতে পেলুম, বাইরে খোক্কস কুকুরটা কান্নার মতো একটা আওয়াজ করে ডেকে উঠল।'

বরদা চুপ করিল।

ফুসফুস হইতে অবরুদ্ধ বাষ্প মুক্ত করিয়া বলিলাম, 'তারপর?'

বরদা বলিল, 'তারপর—' সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, পূর্বের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। তারপর আমাদের দিকে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, 'সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে— হ্যাঁ, তারপর ক্রমে ভয় কেটে গেল। এখন রোজই তিনি আসেন, অনেক কথাবার্তা হয়। তোমাদের সঙ্গেও দেখা করবার জন্যে তিনি উৎসুক ছিলেন— কিন্তু—। আর সময় নেই—এস।'

বরদা আমার দিকে প্রসারিত করতল বাড়াইয়া দিল। কিছু না বুঝিয়া তাহার সহিত শেকহ্যান্ড করিলাম। বরদার হঠাৎ হইল কি? আমাদের বিদায় করিতে চায় নাকি?

অমূল্য বলিল, 'কিন্তু কই, তিনি এখনও দেখা দিলেন না?'

বরদা আবার বসিয়া পড়িল, মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, 'হয়তো দেখা দিয়েছেন— তোমরা জানতে পারনি—'

এই সময় বাহিরে দ্রুত পদধ্বনি শুনা গেল। আমরা চমকিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। পদশব্দ বারান্দার উপরে উঠিল, তারপর বদ্ধ দরজায় সজোরে ধাক্কা পড়িল। হৃদ্‌যন্ত্রটাও ওই ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়া উঠিল; আমরা প্রশ্ন-বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম— এ সময় হঠাৎ কে আসিল? তবে কি—

বরদার মুখে একটা ম্লান হাসি ক্রীড়া করিতেছিল; সে পূর্ণ চক্ষে আমার পানে চাহিয়া বলিল, 'বুঝতে পারছ না?'

আমি নীরবে মাথা নাড়িলাম।

বরদা ব্যথিত অবসন্ন কণ্ঠে বলিল, 'এখনি বুঝতে পারবে; দোর খুলে দাও—'

দ্বার খুলিয়া দিব? কিন্তু দ্বারের ওপারে কী আছে?

আবার সজোরে ধাক্কা পড়িল; বরদা আবার চোখের নীরব ইঙ্গিতে আমাকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিল। আমি মোহাচ্ছন্নের মতো উঠিয়া গিয়া দ্বারের হুড়কা খুলিয়া দিলাম।

অধীর হস্তে কবাট ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল— বরদা!

বরদা বলিয়া উঠিল, 'আরে, তোমরা এসেছ? আমি একটা কাজে বেরিয়েছিলুম—' আমাদের মুখ দেখিয়া বরদা অর্ধপথে থামিয়া গেল।

আমরা সকলে, যে মোড়ায় বরদা বসিয়াছিল সেই দিকে ফিরিলাম। দেখিলাম, মোড়ায় যে বসিয়াছিল সে

নাই— মোড়া খালি।

এই সময় বাহিরে বরদার কুকুরটা কান্নার মতো একটা দীর্ঘ একটানা সুরে ডাকিয়া উঠিল।

বরদা সেই ডাক শুনিয়া তীক্ষ্ণ চক্ষে আমাদের পানে চাহিল, তারপর ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, 'অ্যাঁ! তবে কি —?'

আমি অতি কষ্টে গলা হইতে আওয়াজ বাহির করিলাম, 'হ্যাঁ। অতিথি-সৎকারের কোনও ত্রুটি হয়নি। কিন্তু ভাই, আজ রাত্রেই আমরা বাড়ি ফিরব।'

১২ ভাদ্র ১৩৪৪

প্রতিধ্বনি

মানুষের চরিত্র যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে সে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অবিচলিত ভাবে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ ঘটে নাই। বরং একটানা সঙ্গতি দেখিলেই কেমন একটা বিস্ময় জাগে, সন্দেহ হয় কোথাও বুঝি কিছু গলদ আছে।

কিন্তু যে লোকটার জীবনধারা গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্রায় একই খাতে প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি, সে যদি কেবল একটা বাড়ি কিনিবার ফলে অকস্মাৎ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে বন্ধুবান্ধবদের মনে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। সোমনাথ সম্বন্ধে আমরাও একটু বিশেষ রকম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম।

সোমনাথ বরদার আষাঢ়ে গল্পের আসরে বড় একটা যোগ দিত না বটে, তবু সে আমাদের সকলেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। একেবারে প্রাণখোলা লোক— অত্যন্ত মিশুক ও আমুদে— হাসিয়া-খেলিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিতেছিল। বাপ মৃত্যুকালে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং অন্নচিন্তা ছিল না। বিবাহের তিন-চার বছরের মধ্যে স্ত্রীও মারা গিয়াছিল, কিন্তু নিঃসন্তান অবস্থায় বিপত্নীক হইয়াও সে আর বিবাহ করে নাই। প্রাণখোলা লোক হইলেও তাহার সুবুদ্ধির দ্বারে যে অর্গল ছিল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মারাত্মক রকম বদ্‌খেয়ালও তাহার কিছু ছিল না। বিহার-প্রান্তের বৈচিত্র্যহীন শহরে জীবনটা নেহাত একঘেয়ে হইয়া পড়িলে কলিকাতায় গিয়া কিছু দিন নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ করিয়া আসিত। তারপর আবার হৃষ্ট মনে বিলিয়ার্ড খেলায় মনোনিবেশ করিত। তাহার জীবনে একটি মাত্র নেশা ছিল— ঐ বিলিয়ার্ড খেলা। সিগারেট পর্যন্ত তাহাকে কোনও দিন খাইতে দেখি নাই; কিন্তু শহরে থাকিয়াও সন্ধ্যার পর বিলিয়ার্ড খেলিবার জন্য ক্লাবে আসে নাই, এমন একটা দিনও মনে করিতে পারি না।

বাড়ি কেনার ব্যাপারটাও যে বিলিয়ার্ড খেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পৈতৃক বাড়ি ছিল—মন্দ বাড়ি নয়—একটু সেকেলে-গোছের হইলেও ভদ্রলোকের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী। তবু সে সতের হাজার টাকা খরচ করিয়া আর একখানা বাড়ি কিনিয়া বসিল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে এক বিলিয়ার্ড ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

আমাদের মিউনিসিপ্যাল সীমানার এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে একটি পুরাতন বাড়ি ছিল এবং বাড়িতে একটি অতি পুরাতন মেম বাস করিত। বস্তুত বাড়ি অথবা বুড়ি কোন্‌টি বেশি পুরাতন এ লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক দিন তর্ক হইয়া গিয়াছে। শেষে আমাদের মধ্যে কেহ একজন গেজেটিয়ার খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল যে, বাড়িটাই অগ্রজ। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে এক নীলকর সাহেব এই কুঠি তৈয়ার করাইয়াছিল, ক্রমে নীলের ব্যবসা উঠিয়া যাওয়ায় উহা পারিবারিক বাসভবনে পরিণত হইয়াছিল। তারপর তিন পুরুষ ধরিয়া নীলকর সাহেবের বংশধরেরা এইখানেই বাস করিতেছে। বুড়ি শেষ উত্তরাধিকারিণী।

আমাদের তর্কের নিষ্পত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু আর একটা প্রশ্ন উঠিয়াছিল— বাড়ি অথবা বুড়ি শেষ পর্যন্ত কোন্‌টি টিকিয়া থাকিবে? কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বুড়ি হারিয়া গেল। একদিন শুনিলাম তাহার গঙ্গালাভ হইয়াছে।

বুড়ি চিরকুমারী, তাই সাক্ষাৎ ওয়ারিস কেহ ছিল না। অল্প দিন পরে শোনা গেল বাড়ি বিক্রয় হইবে। নেহাত খেয়ালের বশেই একদিন বৈকালে আমরা কয়েকজন দেখিতে গেলাম। সোমনাথের মোটর আছে, তাহার মোটরে চড়িয়াই অভিযান হইল।

ফাঁকা মাঠের মতো বিস্তৃত গঙ্গার তীরে অনুচ্চ পাঁচিলে ঘেরা 'ভিলা'-জাতীয় বাড়ি। চতুষ্কোণ বাড়ি, চারিদিকে নীচু বারান্দা— মধ্যস্থলটা প্রায় দ্বিতলের মতো উঁচু হইয়া আছে। একটা প্রকাণ্ড ঝাউগাছ নিতান্ত সঙ্গীহীন ভাবে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ির পিছন দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত; সম্মুখে ফটকের স্তম্ভে শ্বেত পাথরের ফলকের উপর নাম লেখা আছে— "Echoes" —প্রতিধ্বনি।

বাড়ির একজন মুসলমান চৌকিদার ছিল, সেও বোধ করি বুড়ির সমসাময়িক। চাবি খুলিয়া বাড়ির ভিতরটা আমাদের দেখাইল। সুসজ্জিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি, চেয়ার সোফা পালঙ্ক ঘরে ঘরে যেমন ছিল তেমনি সাজানো আছে। বাড়ির ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড হল-ঘর। ছাদ খুব উচ্চ— বহু ঊর্ধ্বে কাচে ঢাকা স্কাই-লাইট দিয়া আলো আসার ব্যবস্থা। তবু ঘরটি ছায়াচ্ছন্ন।

চৌকিদার সুইচ্‌ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, কয়েকটা বাল্‌ব একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। তখন দেখিলাম, ঘরের মাঝখানে একটি বিলিয়ার্ড টেবিল রহিয়াছে। টেবিলের উপর সবুজ আবরণে ঢাকা তিনটি বাল্‌ব, কেবলমাত্র টেবিলের সমতল পৃষ্ঠের উপর আলো ফেলিয়াছে। ঘরে অন্য আভরণ বিশেষ কিছু নাই। দেয়ালের ধারে দুইটি সেটি, একধারে বিলিয়ার্ড-যষ্টি রাখিবার র‍্যাক্‌— তাহাতে সারি সারি কয়েকটি 'ক্যু' রাখা আছে। দেয়ালের গায়ে একটি কালো রঙের মার্কিং বোর্ড, কত দিনের পুরানো বলা যায় না, তাহাতে অঙ্কের চিহ্নগুলি একেবারে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারিদিকে তাকাইয়া সোমনাথ মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাঃ!'

সত্যই ঘরের আধা অন্ধকার মোলায়েম আবহাওয়া মনের উপর একটা অনির্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করে, ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমি তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। তাই সোমনাথকে সমর্থন করিয়া আমিও ঐ জাতীয় একটা কিছু বলিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার কানের কাছে কে যেন চাপা গলায় বলিল, 'আ—ঃ!'

চমকিয়া পিছনে তাকাইলাম।

আমার সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও পিছনে তাকাইয়াছিল— কিন্তু পিছনে কেহই নাই। আমরা উদ্বিগ্নভাবে পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময় করিতে লাগিলাম। তখন বৃদ্ধ চৌকিদার ভাঙা গলায় বুঝাইয়া দিল যে উহা প্রতিধ্বনি। এ ঘরে প্রতিধ্বনি আছে, কথা কহিলে অনেক সময় কথার ভগ্নাংশ ফিরিয়া আসে।

আশ্বস্ত হইলাম বটে, কিন্তু মনে একটু ধোঁকা লাগিয়া রহিল। চৌকিদার অতগুলা কথা কহিল, কই তাহার একটা কথাও তো ফিরিয়া আসিল না।

যা হোক, পরিদর্শন শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার পথে সোমনাথ একবার বলিল, 'খাসা বাড়িখানি। আর ঐ বিলিয়ার্ড-রুমটা— চমৎকার।'

বিলিয়ার্ড-রুমের চমৎকারিত্ব তাহাকে কত দূর মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম দিন-দশেক পরে, যখন শুনিলাম সে বাড়িখানি খরিদ করিয়াছে। তারপর আরও বিস্ময়কর সংবাদ, সে পৈতৃক বাড়ির বাস তুলিয়া দিয়া নবক্রীত বাড়িতে উঠিয়া গেল। গৃহপ্রবেশের দিন আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইল বটে, কিন্তু কেন জানি না সমস্ত ব্যাপারটাতে আনন্দ-উৎসবের স্পর্শ লাগিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল এটা সোমনাথের চিরবিদায় ভোজ।

দাঁড়াইলও তাই। দুই মাইল দূরে উঠিয়া গেলে পুরাতন বন্ধু কিছু পর হইয়া যায় না, কিন্তু সোমনাথ যেন মনের দিক দিয়াও আমাদের অনেক দূরে সরিয়া গেল। মাঝে মাঝে সে ক্লাবে আসিত এবং আগের মতো হাসিগল্প করিবার চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু দেখিলাম তাহার মনটা আগাগোড়া বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্বে যেমন সমস্ত গল্প কৌতুক ও খেলায় মনপ্রাণ ঢালিয়া যোগ দিতে পারিত, এখন আর তেমন পারে না। তাহার প্রাণখোলা হাসিটাও যেন কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, যে এত দিন রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল সে যেন অকস্মাৎ অবাস্তব ছায়ায় পরিণত হইয়াছে।

ক্লাবে বসিয়া সোমনাথ সম্বন্ধেই কথা হইতেছিল।

পৃথ্বী বলিল, 'ক্ষুধিত পাষাণ। বাড়িটা সোমনাথকে গিলে খেয়েছে।— কদ্দিন এদিকে আসেনি?'

আমার হিসাব ছিল, বলিলাম, ‘আমাদের “জনা” অভিনয়ের রাত্রে তাকে শেষ দেখেছি। মাসখানেক হল।’

অমূল্য বলিল, ‘ক্ষুধিত পাষাণ-টাষাণ নয়। আসলে নিজের বিলিয়ার্ড টেবিল পেয়েছে, রাতদিন তাই খেলছে।’

বরদা এক পাশে বসিয়া ছিল, কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, ‘হুঁ।’

অমূল্য ভ্রূ তুলিয়া তাহার দিকে ফিরিল, ‘হুঁ মানে? বলতে চাও কি? তাকে ভূতে পেয়েছে?’

বরদা উত্তর দিল না, কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর চক্ষু নামাইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ‘যে-রাত্রে সোমনাথ আমাদের নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিল, সে-রাত্রির কথা মনে আছে?’

‘কোন্ কথা?’

‘খাওয়া-দাওয়ার পর তুমি আর সোমনাথ বিলিয়ার্ড খেলেছিলে— বোধ হয় ভোলনি। আমি বসে তোমাদের খেলা দেখছিলুম। সে সময় তোমার নিজের খেলার কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য করনি?’

লক্ষ্য যে করিয়াছিলাম তাহা নিজের কাছেও এত দিন স্পষ্টভাবে স্বীকার করি নাই, অথচ বরদা তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। ভাল খেলোয়াড় বলিয়া আমার অহঙ্কার নাই, কিন্তু সেদিন আমার খেলা আশ্চর্য রকম খুলিয়া গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রত্যেক বার বল মারার সময় মনে হইয়াছিল আমি খেলিতেছি না, আর কেহ আমার হাত ধরিয়া খেলিয়া দিতেছে। আমি হয়তো ‘পট রেড্’ মারিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বলের সহিত ‘ক্যু’-এর সংস্পর্শ ঘটিবার পূর্ব মুহূর্তে যেন একটা অদৃশ্য হাত আমার হাতে ঈষৎ নাড়া দিয়া আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। ফলে আমার বল ‘রেড্’কে স্পর্শ করিয়া সমস্ত টেবিল ঘুরিয়া একটা অসম্ভব পকেটে প্রবেশ করিয়াছে। এমনি অনেক বার ঘটিয়াছিল। ক্রমে আমার মনে এমন একটা মোহাচ্ছন্ন ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল যে, যন্ত্রচালিতের মতো খেলিয়া গিয়াছিলাম। সোমনাথ সেদিন আমাকে হারাইতে পারে নাই।

খেলার শেষে মোহের অবস্থা কাটিয়া গেলে এই বলিয়া নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, খেলার ক্ষেত্রে দৈবাৎ এ-রকম অঘটন ঘটিয়া যায়, নিকৃষ্ট খেলোয়াড়ও হঠাৎ ভাল খেলিয়া ফেলে। কিন্তু ইহার মধ্যে অলৌকিক কিছু আছে, তাহা তখন ভাবি নাই। আজ বরদা স্মরণ করাইয়া দিতেই সমস্ত ঘটনা মনে পড়িয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকিয়া উঠিলাম।

আমি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছি দেখিয়া বরদা বলল, ‘তাহলে লক্ষ্য করেছিলে। আমি আর একটা জিনিস শুনেছিলুম যা তোমরা কেউ শোননি। খেলায় তন্ময় ছিলে বলেই বোধ হয় শুনতে পাওনি।’

‘কি?’

‘হাততালির শব্দ। সোমনাথ একটা খুব সুন্দর মার মেরেছিল; তিনটে বলে ঠোকাঠুকি হয়ে তিনটেই একই পকেটে গেল। ঠিক তারপর কে যেন খুব মোলায়েম হাতে হাততালি দিয়ে উঠল।’

অমূল্য বলিল, ‘ওটা প্রতিধ্বনি। যেখানে সহজ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা সম্ভব সেখানে ভূত-প্রেত টেনে আনার মানে বুঝি না।— বলে বলে ঠোকাঠুকি হওয়ার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলে সেটা হাততালির মতোই মনে হয়।’

বরদা বলিল, ‘আশ্চর্য বলতে হবে। বল ঠোকাঠুকি তো বরাবরই হচ্ছিল, তবে প্রতিধ্বনিটা ঠিক সেই সময়েই হল কেন?’

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। এইখানে একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। ‘বহুরূপী’ নাম দিয়া যে ব্যাপারটা পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা ঘটিবার পর হইতে বরদার গল্প সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব বেশ একটু পরিবর্তিত হইয়াছিল। সকলেরই নাস্তিকতার গোড়া একটু আলগা হইয়া গিয়াছিল। চুনী তো বিস্তর বই কিনিয়া মহা উৎসাহে প্রেততত্ত্বের চর্চা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। অমূল্য যদিও এখনও তর্ক করিতে ছাড়ে নাই, তবু তাহার ঝাঁজ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল।

হৃষী আমাদের আলোচনাকে সিধা পথে ফিরাইয়া আনিল, বলিল, ‘সে যা হোক, কথাটা শেষ পর্যন্ত

দাঁড়াচ্ছে কি?— সোমনাথ যে বাড়ি কিনে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেল, আমাদের সংসর্গ পর্যন্ত ছেড়ে দিলে, এর কারণটা তো কেউ দেখাতে পারল না। তাকে ভূতে পেয়েছে এ-কথায় শ্রদ্ধা করা যায় না। তবে হয়েছে কি তার?'

বরদা আস্তে আস্তে বলিল, 'আমার কি মনে হয় জান? সোমনাথ আমাদের চেয়ে ঢের বেশি মনের মতো সঙ্গী পেয়েছে। পুরানো বাঁধনের পাশে খুব শক্ত নূতন বাঁধন পড়েছে, তাই পুরানো বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে।'

বরদার কথার ইঙ্গিতটা ভুল করিবার মতো নয়, কিন্তু এতই উহা আজগুবি যে নির্বিচারে মানিয়া লওয়াও যায় না। অমূল্য আমাদের সকলের মনের ভাব যেন প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, 'অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও, এক দঙ্গল ভূতের সঙ্গে সোমনাথের এতই দহরম-মহরম হয়ে গেছে যে, মানুষের সঙ্গ আর তার ভাল লাগছে না?'

এবারও বরদা সোজাসুজি উত্তর দিল না, বরঞ্চ যেন নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এমনি ভাবে চুপ করিয়া রহিল। মিনিট দুই-তিন পরে কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল, 'Echoes— প্রতিধ্বনি! অদ্ভুত নাম বাড়িটার। যে-লোক বাড়ি তৈরি করিয়েছিল সেই হয়তো নামকরণ করেছিল। কিংবা তার পরবর্তীরা বাড়ির আবহাওয়া দেখে নাম রেখেছিল— প্রতিধ্বনি!'

চুনী এতক্ষণ বসিয়া আলোচনা শুনিতেছিল, কথা বলে নাই। এখন একবার গলা খাঁকারি দিয়া বলিল, 'কিছু দিন থেকে একটা থিওরি আমার মাথায় ঘুরছে—'

'কিসের থিওরি?'

'এই সব হানা-বাড়ি সম্বন্ধে। এখনও থিওরিটা খুব স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করেনি, তবু—'

'কি থিওরি তোমার শুনি।'

চুনী একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'ঐ প্রতিধ্বনি শব্দটার মধ্যেই আমার থিওরির বীজ নিহিত রয়েছে। দেখ, শব্দের যেমন প্রতিধ্বনি আছে, তেমনি বাস্তব ঘটনারও প্রতিধ্বনি থাকতে পারে না কি? প্রতিধ্বনি না বলে তাকে প্রতিবিম্বও বলতে পার— ব্যাপারটা মূলে একই। ধ্বনির প্রতিধ্বনি সব সময় থাকে না, এই ঘরের মধ্যে তোমরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও এতটুকু প্রতিধ্বনি পাবে না। আবার এমন এক-একটা স্থান আছে যেখানে চুপি চুপি একটা কথা উচ্চারণ করলেও কোন্ অদৃশ্য প্রতিবন্ধকে ধাক্কা খেয়ে সেটা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে। আমার মনে হয় হানা-বাড়িগুলোও এই জাতীয় স্থান। গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো তারা অতীতের কতকগুলো বাস্তব ঘটনা সঞ্চয় করে রাখে, তারপর সুবিধে পেলেই তার প্রতিধ্বনি করতে থাকে। বরদা, তোমার কি মনে হয়?'

থিওরিটা অভিনব বটে, কিন্তু বরদার মুখ হইতে ইহার অনুমোদন আশা করা যায় না। সে গোঁড়া ভূত-বিশ্বাসী, অথচ থিওরি সত্য হইলে ভৌতিক কাণ্ড মাত্রেই একটা যান্ত্রিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়— প্রেতযোনির স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছু থাকে না।

বরদা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তাহলে তোমার মতে প্রেতযোনি নেই! যেগুলোকে ভৌতিক phenomenon বলে মনে হয় সেগুলো অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র?'

চুনী বলিল, 'না, তা ঠিক নয়। আমি বলতে চাই, প্রেতযোনি থাকে থাক, কিন্তু হানাবাড়িতে সাধারণত যে-সব ব্যাপার ঘটে থাকে, সেগুলো হয়তো অধিকাংশই এই প্রতিধ্বনি-জাতীয়।'

আমি বলিলাম, 'সোমনাথের বাড়িতে প্রতিধ্বনি আছে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেটা কোন্ জাতীয়?'

চুনী বলিল, 'সেইটেই আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তোমরা কেউ রাজী আছ?'

'কি করতে হবে?'

'আমি স্থির করেছি একদিন সোমনাথের বাড়িতে গিয়ে রাত্রি যাপন করব। সে হঠাৎ এমন বদলে গেল কেন, তার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ত আবশ্যক, সুতরাং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও পরীক্ষাটা তুচ্ছ হবে না; আর যদি সে এমন কিছু পেয়ে থাকে যার তুলনায় তার আজন্মের সমস্ত বন্ধন ঢিলে হয়ে গেছে, তাহলে সেই অপূর্ব বস্তুটি কি তাও আমাদের জানা দরকার।'

অমূল্য একটু মুখ বাঁকাইয়া কবিতা আবৃত্তি করিল—

‘যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারই খানিক
মাগি আমি নতশিরে—

যদি সুবিধে হয় গোটাকয়েক প্রেতাত্মা বরদার জন্যে চেয়ে নিয়ে এস, আমাদের এই ক্লাব-ঘরে পুষে রাখা যাবে।’

আমি চুনীর দিকে ফিরিয়া বলিলাম, ‘বেশ, আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজী আছি। কালই চল তাহলে, শনিবার আছে।’

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সোমনাথের বাড়ির সম্মুখে যখন পৌঁছিলাম, তখন ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে। প্রকাণ্ড হাতার মাঝখানে বাড়িখানা যেন একেবারে জনশূন্য মনে হইল।

বাড়ির বারান্দায় উঠিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমি ও চুনী পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলাম। চাকর-বাকর কেহই কি নাই? সব গেল কোথায়?

হাঁক দিব মনে করিতেছি, এমন সময় ভিতর হইতে খট্ খট্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ভুল হইবার নয়, বিলিয়ার্ড বলের ঠোকাঠুকি লাগার শব্দ। আশ্চর্য বোধ হইল। এই ভর-সন্ধ্যাবেলা সোমনাথ বিলিয়ার্ড খেলিতেছে! কাহার সহিত খেলিতেছে?

দু’জনে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কোনও ঘরে এখনও বাতি জ্বলে নাই, কেবল বিলিয়ার্ড-রুম হইতে আলো আসিতেছে। আমরা নিঃশব্দে দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

টেবিলের উপরকার সবুজ শেড-ঢাকা বাতি তিনটি শুধু জ্বলিতেছে— তাহাদের আলোকচক্রের বাহিরে ঘর অন্ধকার। এই আলো-অন্ধকারের সীমানায় টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া সোমনাথ আত্মনিমগ্ন ভাবে ‘ক্যু’-এর মুখাগ্রে খড়ি লাগাইতেছে। ঘরে আর কেহ নাই।

চুনী বলিয়া উঠিল, ‘কি হে, একলাই খেলছ?’

‘কে?’ সোমনাথ চমকিয়া মুখ ফিরাইল। তারপর দ্রুত দ্বারের কাছে আসিয়া সুইচ্ টিপিল; ঘরের অন্য আলোগুলা জ্বলিয়া উঠিল। আমাদের দেখিয়া সে প্রথম কিছুক্ষণ নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া রহিল, যেন ভাল করিয়া চিনিতেই পারিল না। আমরাও অপ্রতিভভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বুঝিলাম, আমাদের সহিত তাহার মনের সংযোগ এমন পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে যে, সহসা জোড়া লাগাইতে পারিতেছে না।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত হাসির একটি চেষ্টা করিয়া সে বলিল, ‘আরে তোমরা! তারপর— হঠাৎ? কি ব্যাপার?’

সোমনাথের কণ্ঠে যে সহজ অকৃত্রিম সমাদরের সুর শুনিতে আমরা অভ্যস্ত তাহা যেন ফুটিল না। আমি সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, ‘ব্যাপার কিছু নয়, তোমার ঘরকন্না দেখতে এলুম।— একলা বিলিয়ার্ড খেলছিলে নাকি?’

‘একলা!’ কথাটা বলিয়াই সে সামলাইয়া লইল, মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, ‘হ্যাঁ, একলাই খেলছিলুম।— এস, বাইরে বসা যাক।’

ঘরের আলো নিবাইয়া সোমনাথ আমাদের বারান্দায় লইয়া গিয়া বসাইল। এতক্ষণে বাহিরেও অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ঝাউগাছটাতে অসংখ্য জোনাকি জ্বলিতেছিল। সে বলিল, ‘আলো জ্বেলে দেব, না অন্ধকারেই বসবে?’

চুনী বলিল, ‘ক্ষতি কি, অন্ধকারেই বসা যাক।’

বেতের মোড়ায় তিনজনে চুপচাপ বসিয়া আছি, কাহারও মুখে কথা নাই। হঠাৎ সোমনাথ বলিল, ‘চা খাবে?’

চুনী উত্তর দিল, ‘না, আমরা চা খেয়ে বেরিয়েছি।’— তারপর একবার গলাটা ঝাড়িয়া বলিল, ‘তুমি দিন-দিন যে-রকম ডুমুরফুল হয়ে উঠছ, ভয় হল দু’-দিন বাদে হয়তো চিনতেই পারবে না। তাই আজ তোমার বাড়িতে রাত কাটাব বলে এসেছি। পুরানো বন্ধুত্ব মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নিতে হবে তো?’

এক মুহূর্ত সোমনাথ জবাব দিল না, তারপর যেন একটু বেশি মাত্রায় ঝোঁক দিয়া বলিয়া উঠিল, ‘বেশ তো বেশ তো। তা, দাঁড়াও আমি আসছি।’

‘কোথায় যাচ্ছ?’

‘বাবুর্চিটাকে খবর দিই, তোমাদের খানার ব্যবস্থা করুক।’ সোমনাথ উঠিয়া গেল।

মনে মনে ভারি কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিলাম। বন্ধুত্বের দাবিতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে গিয়া অপর পক্ষের মনে অনাগ্রহের আভাস পাইলে গ্লানির আর অন্ত থাকে না। সোমনাথ বাহিরে হৃদ্যতার ভান করিতেছে বটে, কিন্তু অন্তরের সহিত আমাদের সাহচর্য চায় না— তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। আগেকার অবাধ স্বচ্ছন্দ আত্মীয়তা আর নাই। শুধু তাই নয়, আমরা হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, যেন তাহার সুনিয়ন্ত্রিত কার্যধারায় আমরা বিঘ্ন ঘটাইয়াছি। চুনী খাটো গলায় বলিল, ‘কি হে, কি রকম মনে হচ্ছে?’

‘সুবিধের নয়। ফিরে গেলেই বোধ হয় ভাল হত।’

‘উঁহু— থাকতে হবে।’

চুনী আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু থামিয়া গেল। পরিপূর্ণ অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিলাম না, অস্পষ্ট শব্দে বুঝিলাম সোমনাথ ফিরিয়া আসিয়া মোড়ায় বসিল। মোড়ার মচমচ শব্দ যে শুনিয়াছিলাম তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

চুনী সহজ আলাপের সুরে সোমনাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ‘তারপর, একলা থাকতে তোমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না?’

সোমনাথ উত্তর দিল না।

এই সময়, কেন জানি না, আমার ঘাড়ের রোঁয়া হঠাৎ শক্ত হইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। চুনীও হয়তো কিছু অনুভব করিয়া থাকিবে, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সে হঠাৎ দেশলাই জ্বালিল। দেখিলাম সোমনাথের মোড়ায় কেহ বসিয়া নাই।

দেশলাইয়ের কাঠি শেষ পর্যন্ত জ্বলিয়া আস্তে আস্তে নিবিয়া গেল। অবরুদ্ধ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া চুনী মৃদুস্বরে বলিল, ‘প্রতিধ্বনি।’

এইবার সোমনাথের স্পষ্ট পদশব্দ শুনিতে পাইলাম, শব্দটা কাছে আসিলে চুনী বলিয়া উঠিল, ‘সোমনাথ?’

‘হ্যাঁ।’

‘আলোটা জ্বেলে নাও ভাই, অন্ধকার আর ভাল লাগছে না।’ কথার শেষে হাসিতে গিয়া তাহার গলাটা কাঁপিয়া গেল।

বারান্দার আলো জ্বালিয়া দিয়া সোমনাথ আসিয়া বসিল। সাদা ঢাকনির মধ্যে মৃদুশক্তি বাল্‌ব স্নিগ্ধ আলো বিকীর্ণ করিতে লাগিল। অন্ধকারের চেয়ে এ ভাল, তবু পরস্পর মুখ দেখা যায়।

সোমনাথ বলিল, ‘বাবুর্চিকে বলে এলুম। শুধু মুর্গির কারি আর পরটা। তার বেশি কিছু যোগাড় হয়ে উঠল না।’

ইতিমধ্যে যে ক্ষুদ্র ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ না করিয়া চুনী বলিল, ‘যথেষ্ট যথেষ্ট। অমৃতের ব্যবস্থা থাকলে পাঁচ রকম ব্যঞ্জনের দরকার হয় না— কিন্তু তুমি বাবুর্চি রেখেছ যে!’

সোমনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'রাখিনি ঠিক। বাড়ির যে বুড়ো চৌকিদারটা ছিল সে-ই রেঁধে দেয়—'

'রাঁধুনী বামুন পেলে না?'

'দরকার বোধ করি না। আমি একলা মানুষ—'

'চাকরও তো দেখছি না। চাকর রাখনি কেন?'

'রেখেছিলাম একজন, কিন্তু—'

'রইল না?' চুনী মোড়া টানিয়া লইয়া সোমনাথের নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল, বলিল, 'আসল কথাটা কি বল তো সোমনাথ। বাড়িতে কিছু আছে— না?'

মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব আনিয়া সোমনাথ বলিল, 'কি থাকবে?'

'সেই কথাই তো জানতে চাইছি। শহরের এক টেরে এই পুরনো বাড়ি, চাকর-বামুন থাকতে চায় না— কিছু থাকা বিচিত্র নয়।'

সোমনাথের চোখের উপর অদৃশ্য পর্দা নামিয়া আসিল। সে হাসিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, 'পাগল না ক্ষ্যাপা। ওসব কিছু নয়। শহর থেকে দূর পড়ে তাই চাকর-বাকর থাকতে চায় না।'

বুঝিলাম, কিছু বলিবে না। ইচ্ছা করিলে যে অনেক কিছু বলিতে পারে তাহাও বুঝা গেল; কারণ সোমনাথ মনের ভাব গোপন করিতে পারে না, মুখে চোখে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু লুকাইতে চায় কেন? যাহা সে জানিয়াছে তাহার অংশীদার রাখিতে চায় না— কৃপণের মতো একা ভোগ করিতে চায়? কিংবা অবিশ্বাসীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয়ে বলিতে চায় না?

চুনী কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়। সোজাসুজি জেরায় ফল হইল না দেখিয়া সে অন্য পথ ধরিল। কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর হানাবাড়ি সম্বন্ধে নিজের থিওরির কথা পাড়িল। বেশ ফলাও করিয়া লেকচারের ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করিয়া নিজের থিওরির সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিতে লাগিল। সোমনাথও দেখিলাম একমনে গালে হাত দিয়া শুনিতেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের চারিপাশে যে একটি অতীন্দ্রিয় ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা বোধ করি ইহারা দু'জনে জানিতে পারে নাই। প্রথমটা আমিও লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু হঠাৎ এক সময় মনে হইল কাহারা নিঃশব্দে আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া একাগ্র মনে চুনীর কথা শুনিতেছে। চোখে কিছুই দেখিলাম না, এমন কি কানে কিছু শুনিয়াছিলাম এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না, তবু কেমন করিয়া এই অদৃশ্য আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিলাম তাহা আমার কাছে এক প্রহেলিকা। কিন্তু জানিতে যে পারিয়াছিলাম তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ইহা অনুমান বা উত্তেজনাজনিত কল্পনার রূপায়ণ নয়— স্পর্শ করিবার মতো অত্যন্ত বাস্তব অনুভূতি। অপরিস্ফুট আলোকে তাহাদের দেখিতে পাইতেছি না বটে, কিন্তু তাহারা যে আমাদের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ ভাবে চুনীর কথা শুনিতেছে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির মতোই সত্য।

ক্রমে একটি অতিমৃদু সুগন্ধ নাকে আসিতে লাগিল। তাজা ফুলের বা আতর এসেন্সের গন্ধ নয়— পপৌরির মতো একটু বাসি অথচ সুমিষ্ট সৌরভ। ধীরে ধীরে গন্ধ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন বুঝিতে পারিলাম, জিয়ানো ল্যাভেন্ডার ফুলের গন্ধ।

চুনী তখনও থিওরি ব্যাখ্যা করিতেছিল, তাই গন্ধ নাকে গেলেও সে বোধ হয় উহা লক্ষ্য করে নাই। আলোচনা শেষ করিয়া সে বলিল, 'অবশ্য এটা আমার মনগড়া কাল্পনিক থিওরি। তবু কিছু ভিত্তি কি এর নেই? তোমার কি রকম মনে হচ্ছে?'

সোমনাথ মুখ তুলিয়া বোধ করি একটা কিছু উত্তর দিতে যাইতেছিল, চুনী সচকিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, 'গন্ধ! কিসের গন্ধ!'

আমি বলিলাম, 'পেয়েছ তাহলে। ল্যাভেন্ডারের গন্ধ।'

সোমনাথের চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,

'ল্যাভেন্ডারের গন্ধ! না না, ও তোমাদের ভুল। গন্ধ কই? আমি তো কিছু পাচ্ছি না।'

চুনী বলিল, 'সত্যি পাচ্ছ না?'

'না— কিচ্ছু না—' বলিয়া সজোরে মাথা নাড়িল। সে যেন জোর করিয়াই গন্ধটা উড়াইয়া দিতে চায়।

কিন্তু গন্ধকে উড়াইয়া লইয়া গেল অন্য জিনিস। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বাড়ির ভিতর দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গন্ধটুকু এক নিমেষে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিস্মিতভাবে বাহিরের দিকে তাকাইলাম; ঝাউগাছের জোনাকিমণ্ডিত বিরাট দেহ অন্ধকারে চোখে পড়িল। ঝাউগাছ একেবারে নিস্তব্ধ; অল্পমাত্র বাতাস বহিলে যে-গাছ মর্মরধ্বনি করিয়া উঠে, তাহাতে শব্দমাত্র নাই।

সোমনাথ আবার মোড়ায় বসিয়া পড়িয়াছিল; চুনী প্রখর জিজ্ঞাসু নেত্রে চারিদিকে চাহিতেছিল। আমি নিম্নস্বরে বলিলাম, 'চলে গেছে— যারা এসেছিল তারা আর নেই।— চুনী, গন্ধটাও কি প্রতিধ্বনি?'

তারপর, গরুর গাড়ি যেমন অসমতল পথ দিয়া চলে, তেমনি অসংলগ্ন বাধাবহুল আলোচনার ভিতর দিয়া আহারের পূর্বের ঘণ্টা-দুই সময় কাটিয়া গেল। সোমনাথ মুহ্যমান হইয়া রহিল, আমরাও মনের মধ্যে নামহীন অস্বাচ্ছন্দ্য লইয়া বসিয়া রহিলাম। অসাধারণ আর কিছু অনুভব করিলাম না। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা যেন আমাদের অধিকার-বহির্ভূত কৌতূহল দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে চলিয়া গিয়াছে।

নিঃশব্দে আহার শেষ হইল; বুড়া চৌকিদার পরিবেশন করিল। অনুভবে বুঝিলাম সেও আমাদের উপর খুশি নয়। তাহার সাদা ভ্রূযুগল নীরবে আমাদের ধিক্কার দিতে লাগিল। অবরোধের পর্দার ভিতর উঁকি মারিবার চেষ্টা করিয়া আমরা যেন বর্বরোচিত অশিষ্ট করিয়াছি।

বারান্দার এক প্রান্তে তিনটি ক্যাম্প-খাট পাড়িয়া শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলাম। কোনও মতে রাত্রিটা কাটিলে যেন বাঁচা যায়।

তিনজনে পাশাপাশি শুইয়া আছি; কথাবার্তা নাই। চুনী শুইয়া শুইয়া সিগারেট টানিতেছে, অন্ধকারে তাহার সিগারেটের আগুন উজ্জ্বল হইয়া আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। সোমনাথ একেবারে নিশ্চল হইয়া আছে; হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটা জোনাকি আমাদের বিছানার চারিপাশে উড়িয়া উড়িয়া যেন পাহারা দিতেছে।

নানা কথা মনে আসিতে লাগিল। আজ যাহা যাহা ঘটিয়াছে, চুনীর থিওরির সহিত তাহা একেবারে বে-খাপ নয়। তবু যাহারা চুনীর কথা শুনিতেছিল তাহারা কি শুধুই অতীতের প্রতিবিম্ব? সোমনাথ এ-বিষয়ে এমন একগুঁয়ে ভাবে নীরব কেন? অতীতের ছায়ার সহিত বর্তমানের মানুষের এমন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ঘটে কি করিয়া? আর, যদি সজীব স্বতন্ত্র আত্মা হয়, তবে উহারা কাহারা? ল্যাভেন্ডার ফুলের গন্ধ কেন আসিল? সেকালে ইংরেজ মেয়েদের ল্যাভেন্ডার ফুল একটা সৌখীনতা ছিল শুনিয়াছি। সেই গন্ধ অতীতের কোন্ দেহ-সৌরভের সহিত মিশিয়া ভাসিয়া আসিল!...

বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক মুহূর্তে সমস্ত চেতনা সতর্ক হইয়া জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে শুইয়া রহিলাম, তারপর বাড়ির ভিতর হইতে পরিচিত খট্‌খট্ শব্দ কানে আসিল।

ঘাড় তুলিয়া দেখিলাম, চুনী বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। সে নিঃশব্দপদে উঠিয়া আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, 'শুনতে পাচ্ছ?— সোমনাথ বিছানায় নেই, কখন উঠে গেছে। এস— দেখা যাক। শব্দ করো না।'

তন্দ্রার মধ্যে এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, রেডিয়াম-যুক্ত হাতঘড়ি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। রাত্রি সাড়ে এগারোটা। অন্ধকারে পা টিপিয়া দু'জনে বিলিয়ার্ড-ঘরের দিকে চলিলাম।

দ্বার পর্যন্ত গিয়া আমরা আর অগ্রসর হইলাম না। টেবিলের উপর তেমনি তিনটি আলো জ্বলিতেছে— বাকি ঘর অন্ধকার। সোমনাথ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বল মারিতেছিল, তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। মুখের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে— সন্ধ্যাবেলার সেই অবসাদগ্রস্ত মুহ্যমান ভাব আর নাই। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, খেলার আনন্দ প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মনে পড়িল, কয়েক মাস আগে

সোমনাথ এমনিই ছিল, বাড়ি কিনিবার পর হইতে তাহার এই প্রাণখোলা আমোদে-মাতিয়া-ওঠা মূর্তি আর দেখি নাই।

বল মারিয়া সোমনাথ লঘু কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর নিজেই সচকিতে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া মৃদু স্বরে কি একটা বলিল। পরক্ষণে আর একটি সুমিষ্ট হাসির শব্দ কানে আসিল। হয়তো ইহা সোমনাথের হাসির প্রতিধ্বনি, কিন্তু পর্দায় ও মিষ্টতায় এত প্রভেদ যে, রমণীকণ্ঠের হাসি বলিয়া ভ্রম হয়।

খেলা চলিতে লাগিল। সোমনাথ একা খেলিতেছে, তবু যেন একা খেলিতেছে না; কাহারও সঙ্গে কৌতুকপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলিতেছে। সম্মোহিতের মতো দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; সোমনাথ খেলিতেছে, মৃদুস্বরে কাহাদের সহিত কথা কহিতেছে, সন্তর্পণে গলা নামাইয়া হাসিতেছে। প্রতিধ্বনিও তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিয়াছে, কখনও ভারী গলায় গম্ভীর আওয়াজ হইতেছে, আবার কখনও কোমল কণ্ঠের অর্ধোচ্চারিত মৃদু-ভাষণ কানে কানে অর্থহীন কথা বলিয়া যাইতেছে।

সমস্তই যেন চুপি চুপি। লুকাইয়া লুকাইয়া আমোদ-কৌতুক চলিতেছে, তাই রঙ্গ-রস আরও গাঢ় হইয়াছে। বুঝিতে পারিলাম, আমরাই এই লুকোচুরির লক্ষ্যবস্তু, আমাদের জন্যই ইহারা প্রকাশ্য মজলিশ জমাইতে পারিতেছে না। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া রঙ্গ-ভঙ্গ করিয়াছিলাম, পাছে জাগিয়া উঠিয়া আবার বিঘ্ন করি তাই গভীর রাত্রে এই ত্রস্ত সতর্কতা।

আমাদের পাশ দিয়া কে একজন চলিয়া গেল। চুনী নিঃশব্দে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিলাম। চুনী জিজ্ঞাসা করিল, 'সোমনাথ ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলে?'

'না। চোখে দেখিনি— কিন্তু—'

'জানি। কিন্তু সেগুলো যে আমাদের মনের কল্পনা নয় তার প্রমাণ কি? সোমনাথ হয়তো পাগল হয়ে গেছে। তাই নিজের মনে হাসছে, কথা কইছে।'

'কিন্তু গন্ধ? আওয়াজ? এগুলো কি?'

'এগুলো প্রতিধ্বনি হতে পারে। হয়তো এই প্রতিধ্বনিই সোমনাথকে পাগল করে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা চোখে কিছু দেখিনি; শুধু শব্দ আর গন্ধ। অতীতের কতকগুলো শব্দ-গন্ধ এই বাড়িটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। তাতে দেহ-বিমুক্ত স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না।'

প্রমাণ যে হয় তার পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে পাইলাম। জোনাকির উল্লেখ আগে কয়েকবার করিয়াছি; এখন দেখিলাম— কয়েকটা জোনাকি আমাদের মুখের সামনে আসিয়া শূন্যে তাল পাকাইতে লাগিল। তাহাদের সঞ্চরমান নীল আলো ক্রমশ ঘনীভূত হইয়া জমাট আকার ধারণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি মুখ ঐ জোনাকির আলোয় শূন্যে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল জানি না, কিন্তু একটি পাংশু নীলাভ নারীমুখ স্পষ্ট আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল— যেন অন্ধকারের পটে জোনাকির আলো দিয়া একটি ছবি আঁকা হইতেছে! মোমে গড়া মুখোশের মতো নিশ্চল মুখ, কিন্তু চোখে কটাক্ষ রহিয়াছে। ক্ষণেকের জন্য একটি জীবন্ত মানুষী অস্তিত্বের স্পর্শ অনুভব করিলাম।

তারপর জোনাকিরা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। দেহের সমস্ত পেশী শক্ত করিয়া রহিলাম, বুকের স্পন্দন দপ্ দপ্ করিয়া কণ্ঠের কাছে ধাক্কা খাইতে লাগিল। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল জানি না।

আমিই প্রথম কথা কহিলাম, 'চুনী, এবার চোখে দেখা হয়েছে? এও কি প্রতিধ্বনি?'

চুনী উত্তর দিল না; আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে বিলিয়ার্ড-রুমে দাঁড়াইয়া সোমনাথের নিকট বিদায় লইলাম। চুনীর চোখের কোলে কালি পড়িয়াছিল; সম্ভবত আমার মুখখানাও নিশ্চিহ্ন ছিল না, কিন্তু আয়নার অভাবে নিজের অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

চুনী বলিল, 'একটা রাত্রি তোমাকে খুবই জ্বালাতন করলুম। কিছু মনে করো না সোমনাথ।'

সোমনাথ বলিল— 'না না— সে কি কথা—'

চুনী বলিল, 'যা হোক, আমাদের দিক থেকে অভিযান একেবারে নিস্ফল হয়নি, কতকগুলো নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল। আমাদের দুঃখ শুধু এই যে, তোমার অভিজ্ঞতা তুমি আমাদের কাছে লুকিয়েই রাখলে, প্রকাশ করলে না।'

সোমনাথ কুণ্ঠিত চক্ষে চাহিয়া রহিল।

'আমার থিওরি কাল তোমায় বলেছি, সেটা সত্যি কিনা ইচ্ছে করলেই তুমি বলতে পারতে।'

'কি— কি বলতে পারতুম?' সোমনাথ ঢোক গিলিল।

'এখনও বলতে পার। কাল রাত্রে আমরা যা যা অনুভব করেছি, সেগুলো কি এই বাড়িতে সঞ্চিত কতকগুলো স্মৃতির ছায়া, না সত্যিকার জীবন্ত কিছু আছে?'

সোমনাথ উত্তর দিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। উত্তর দিল প্রতিধ্বনি; কানের কাছে চুপি চুপি বলিল, 'আছে! আছে! আছে!'

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

পঞ্চভূত

মৃত্যুঞ্জয় ও শাশ্বতী— প্রেত দম্পতি। নিত্যানন্দ— জনৈক প্রেত। অবিনাশ— নবাগত প্রেত। অমরনাথ— মানুষ। স্থান— একটি পোড়ো বাড়ির এক কক্ষ। কাল— পূর্ণিমার সন্ধ্যা।

কক্ষটি প্রেতলোকের নীলাভ প্রভায় আলোকিত। আলোক তীব্র নয়, অথচ সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যায়। কেবল মেঝে হইতে এক হাত উঁচু পর্যন্ত অন্ধকার; তাই ঘরের আসবাবগুলি মনে হয় যেন অর্ধনিমজ্জিতভাবে মাথা জাগাইয়া আছে।

পিছনের দেয়ালের মাঝখানে একটি বড় জানালা। কবজা ভাঙিয়া যাওয়ার ফলে জানালার কবাট হেলিয়া খুলিয়া আছে; বাহিরে আবছায়া গাছপালার ভিতর দিয়া চন্দ্রোদয় হইতেছে। ভিতরে, জানালার দুই পাশে, খানিকটা সম্মুখ দিকে, দুইটি পুরানো ধরনের কৌচ। ঘরের ডান দিকের দেয়ালে একটি দরজা, কালো পর্দা দিয়া ঢাকা। বাঁ দিকের দেয়ালের গায়ে সেকেলে গঠনের একটি মেহগনি রঙের ড্রেসিং টেবিল। ঘরের প্রায় মাঝখানে সম্মুখের দিকে একটি ছোট গোল টেবিল ও দুটি চেয়ার রহিয়াছে। সব আসবাবের উপরেই ধূলার প্রলেপ; মনে হয়, দীর্ঘকাল এ ঘরে মানুষ পদার্পণ করে নাই।

ডান দিকের কৌচে শুইয়া শাশ্বতী ঘুমাইতেছে। শুইয়া আছে বলিয়া তাহাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। তাহার চেহারা মর্তলোকের কুড়ি বছর বয়সের মেয়ের মতো; পরনে নীলাভ শাড়ি। সে পাশ ফিরিয়া হাঁটু গুটাইয়া গালের তলায় করতল রাখিয়া ঘুমাইতেছে।

জানালার বাহিরে একটা পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল— পিউ কাঁহা— পিউ কাঁহা— পিউ কাঁহা—

সে থামিতেই একটা পেঁচা ডাকিল— ঘুৎ— ঘুৎ— ঘুৎ!

শাশ্বতী ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল; এখন তাহার কোমর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেল। সে হাই তুলিয়া আড়মোড়া ভাঙিয়া পিছনে জানালার ধারে তাকাইল।

শাশ্বতী: ওমা! কত বেলা হয়ে গেছে— চাঁদ উঠেছে! কী যে আমার ঘুম, কিছুতেই সকাল সকাল ভাঙে না। (অন্য কৌচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) উনি কখন উঠে গেছেন। কি দুষ্টু! আমাকে না জাগিয়ে দিয়েই বেরিয়ে যাওয়া হয়েছে—

শাশ্বতী উঠিয়া অলসপদে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; স্ত্রী-স্বভাববশত নিজের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া আঁচলে নাকের পাশ মুছিয়া খোঁপা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

শাশ্বতী: না, উনি এখুনি আবার ফিরে আসবেন। আজ দু'জনে মিলে বেড়াতে যাব। কোথায় যাব! চাঁদে বেড়াতে যাব? হ্যাঁ, সেই বেশ হবে; অনেকদিন যাইনি— (সানন্দে গাহিয়া উঠিল)

আজ পূর্ণিমারই রাত রে
পাখির কূজনে আমরা দু'জনে
চাঁদের ঘাটে উঠব গিয়ে জ্যোৎস্না-সাগর সাঁৎরে—।

এই পর্যন্ত গাহিয়া বাকি গানটুকু গুন্ গুন্ করিয়া গুঞ্জন করিতে করিতে শাশ্বতী চুলের বিনুনী খুলিয়া আবার বাঁধিতে লাগিল। চাঁদ ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে।

কালো পর্দা-ঢাকা দরজা দিয়া মৃত্যুঞ্জয় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার বয়স আন্দাজ ত্রিশ; গায়ে ধূসর রঙের পাঞ্জাবি। মুখ অত্যন্ত শুষ্ক ও বিষণ্ণ, যেন এইমাত্র কোনও গুরুতর দুঃসংবাদ শুনিয়াছে, কিন্তু শাশ্বতীকে তাহা বলিতে ভয় পাইতেছে। সে এক-পা এক-পা করিয়া শাশ্বতীর দিকে অগ্রসর হইল।

আয়নায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া শাশ্বতী সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল; খোঁপা জড়াইতে জড়াইতে বলিল—

শাশ্বতী: এই যে— ফিরে আসা হয়েছে। একলাটি কোথায় পালানো হয়েছিল?— আজ কিন্তু চাঁদে বেড়াতে যেতে হবে, তা বলে দিচ্ছি—

মৃত্যুঞ্জয় শাশ্বতীর পিছনে দাঁড়াইয়া একবার অধর লেহন করিল, তারপর ভগ্ন স্বরে বলিল—

মৃত্যুঞ্জয়: শাশ্বতী!

চমকাইয়া শাশ্বতী ফিরিয়া দাঁড়াইল। মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ দেখিয়া তাহার মুখেও উৎকণ্ঠার চকিত ছায়া পড়িল; সে মৃত্যুঞ্জয়ের একেবারে কাছে সরিয়া আসিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—

শাশ্বতী: কী, কী হয়েছে গা?

মৃত্যুঞ্জয় শাশ্বতীর দুই কাঁধে হাত রাখিয়া একটু ম্লান হাসিল।

মৃত্যুঞ্জয়: আর কি! ডাক এসেছে।

শাশ্বতী: ডাক এসেছে!

মর্মান্তিক সংবাদে শাশ্বতীর মুখখানা যেন শীর্ণ হইয়া গেল। সে বিহ্বলভাবে কিছুক্ষণ মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মৃত্যুঞ্জয়: (বিষণ্ণ কণ্ঠে) হ্যাঁ, ডাক এসেছে— যেতে হবে। আবার সেই মানুষ জন্ম— সেই ক্ষিদে-তেষ্টা, রোগ-যন্ত্রণা, টাকার জন্যে মারামারি কাড়াকাড়ি, অন্নের জন্যে হাহাকার—

শাশ্বতী: বোলো না— বোলো না। (মুখ তুলিয়া) ওগো তুমি চলে যাবে, আমি একলা থাকব কি করে?

মৃত্যুঞ্জয়: কি করবে বল— উপায় তো নেই, নিয়তি— হয়তো তোমারও কোনদিন ডাক পড়বে, তুমি কোথাকার এক মানুষের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মাবে—

শাশ্বতী: (অবসন্ন স্বরে) হয়তো তুমি জন্মাবে বাংলাদেশে, আমি জন্মাব তিব্বতে— কেউ কাউকে দেখতে পাব না। তুমি কোন্ একটা মেয়েকে বিয়ে করবে—

মৃত্যুঞ্জয়: আর তুমি কোন্ একটা তিব্বতী পরিবারে পাঁচ ভায়ের ঘরণী হয়ে বস্‌বে— উঃ! ভাবলেও অসহ্য মনে হয়।

শাশ্বতী: (সবেগে মাথা নাড়িয়া) না না কক্ষনো না। আমি এইখানে, এই ঘরে তোমার জন্যে পথ চেয়ে থাকব। আমি মানুষ হয়ে জন্মাতে চাই না।

মৃত্যুঞ্জয় হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসিল।

মৃত্যুঞ্জয়: আমিই কি চাই শাশ্বতী! স্থূল শরীরের বন্ধন থেকে একবার যে মুক্তি পেয়েছে, সে কি আর ফিরে যেতে চায়! ভেবে দেখ দেখি, কি সুখে আমরা আছি। শরীরের ক্ষুধা নেই অথচ তৃপ্তি আছে; বাসনা নেই প্রেম আছে, স্বাধীনতা আছে, অগাধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। এ ছেড়ে কি আবার ঐ অন্ধকূপে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে? কিন্তু উপায় যে নেই।

শাশ্বতী পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া লইল।

শাশ্বতী: এ জীবনের কেবল ঐ এক দুঃখ— কি জানি কবে ফিরে যেতে হবে। আমরা যেন জেলখানার পালিয়ে যাওয়া আসামী, মুক্তির মধ্যেও সদাই ভয়, কখন আবার ধরা পড়ব।

মৃত্যুঞ্জয় উঠিয়া শাশ্বতীর মুখোমুখি দাঁড়াইল।

মৃত্যুঞ্জয়: আর ভেবে কি হবে। যেতেই যখন হবে, তখন মন শক্ত করে তৈরি হওয়াই ভাল। তুমি

আমাকে ভুলে যাবে না? আমার জন্যে অপেক্ষা করবে?

শাশ্বতী: ওকথা বলতে পারলে? ভুলে যাব! আমার মন দেখতে পাচ্ছ না? ভুল্‌ব না ভুল্‌ব না— যখনই ফিরে আসবে, যতদিন পরে ফিরে আসবে, তোমার শাশ্বতী তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

মৃত্যুঞ্জয়: (শাশ্বতীর চিবুক তুলিয়া) এই ঘরে?

শাশ্বতী: (মৃত্যুঞ্জয়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া) হ্যাঁ— এই ঘরে। এ ঘর ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। মনে আছে, এই ঘরেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়।

মৃত্যুঞ্জয়: হ্যাঁ, সে আজ কতদিনের কথা। মানবজন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে শহরের বাইরে একটা নিরিবিলি আস্তানা খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। এই বন-বাদাড়ের মধ্যে বাড়িটা নজরে পড়ল; নেহাৎ ভাঙা বাড়ি নয়, অথচ লোকজনের যাতায়াত নেই— বাড়ির মালিক বাড়িতে তালা দিয়ে বিদেশে ব্যবসা করতে চলে গেছে। দেখেশুনে বেশ পছন্দ হল। ভেতরে ঢুকেই দেখি— তুমি। ঘরও পেলুম, মনের মানুষও পেলুম।

দু'জনে কিছুক্ষণ অতীতের স্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া রহিল। বাহিরে পেঁচা ডাকিল— ঘুৎ— ঘুৎ। চাঁদ ইতিমধ্যে আরও একটু উপরে উঠিয়াছে।

দরজার উপর হঠাৎ ধাক্কা পড়িল; কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

কণ্ঠস্বর: মৃত্যুঞ্জয়দা আছেন নাকি? আসতে পারি?

তাড়াতাড়ি বাহুমুক্ত হইয়া শাশ্বতী চোখ মুছিল; মৃত্যুঞ্জয় দ্বারের দিকে ফিরিল।

মৃত্যুঞ্জয়: কে— নিত্যানন্দ? এস।

নিত্যানন্দ প্রবেশ করিল। হালকা বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি পরা কুড়ি-একুশ বছরের যুবা; মুখে ছেলেমানুষী ও চটুলতা মাখানো; চট্‌পটে দ্রুতভাষী রঙ্গপ্রিয়। সে দ্রুতপদে তাহাদের কাছে আসিয়া জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে আক্ষেপসূচক চট্‌কার করিল।

নিত্যানন্দ: খোপের পায়রার মতো দু'জনের কূজন-গুঞ্জন হচ্ছে! হরি হরি! ওদিকে যে সব গেল।

মৃত্যুঞ্জয়: কী গেল?

নিত্যানন্দ: তোমাদের এই সাধের পায়রার খোপ— আর কি? আহা বৌদি, কত যত্ন করে বাসাটি বেঁধেছিলে— 'ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী তীরে কপোত মিথুন যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে —' কিন্তু এবার বাসা ছাড়তে হল। বাজপাখি হানা দিয়েছে।

শাশ্বতী: ঐ তোমার দোষ, নিতাই ঠাকুরপো, হেঁয়ালিতে ছাড়া কথা কইতে পার না। সত্যি কি হয়েছে বল না ভাই।

নিত্যানন্দ: শুনবে? তবে এক কথায় বলছি। এই বাড়ির মালিক এতদিন পরে আবার বাড়ি ফিরে আসছে।

শাশ্বতী ও মৃত্যুঞ্জয়: (যুগপৎ) অ্যাঁ— বল কি!

নিত্যানন্দ: তা নইলে আর এমন পূর্ণিমার ভর-সন্ধ্যেবেলা তোমাদের মিলন-কুঞ্জে এসে বাগড়া দিলুম! কি আর বলব বৌদি, ভারি দুঃখ হচ্ছে। কোথাকার একটা চোয়াড়ে পাষণ্ড মানুষ এসে তোমাদের এমন বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত করে দেবে। মানুষের সঙ্গে একবাড়িতে তোমরা তো আর থাকতে পারবে না।

মৃত্যুঞ্জয়: কিন্তু তুমি এ খবর পেলে কোত্থেকে?

নিত্যানন্দ: জানোই তো রোজ সন্ধ্যেবেলা ইস্টিশানের বাদুড় বটে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা আমার অভ্যেস; গাড়ি আসে, যাত্রীরা ওঠা-নামা করে— দেখতে বেশ লাগে। আজও গিয়ে বসেছিলুম। গাড়ি এল; একটা লোক চোরের মতো গাড়ি থেকে নামল! দেখেই কেমন খট্‌কা লাগল।— ঢুকে পড়লাম তার মনের মধ্যে। ঢুকে দেখি ও বাবা, মন তো নয়, একেবারে নরককুণ্ড।

শাশ্বতী: কি দেখলে?

নিত্যানন্দ: ব্যাটা এই বাড়ির মালিক। বিদেশে ব্যবসা করতে গিয়েছিল, সেখানে একটা লোককে খুন করে

পালিয়ে এসেছে। মতলব, এই বাড়িতে লুকিয়ে থাকবে। ব্যাটাকে পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে কিনা।

মৃত্যুঞ্জয়: কী সর্বনাশ! (শাশ্বতীর দিকে ফিরিয়া) শাশ্বতী— তুমি—

শাশ্বতী: না না, কক্ষনো না— আমি এ বাড়ি ছাড়ব না, আর ও লোকটার সঙ্গেও একবাড়িতে থাকতে পারব না। তোমরা যা হয় একটা উপায় কর।

নিত্যানন্দ: কিন্তু আর সময় নেই— এতক্ষণে ব্যাটা এসে পড়ল। (কান পাতিয়া) ঐ যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না! হুঁ— এসেছে।

মৃত্যুঞ্জয়: তাই তো, এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ।

শাশ্বতী: (দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া) আমি পারব না— পারব না—

নিত্যানন্দ: (ক্ষণেক ঘাড় চুলকাইয়া) দেখ, এক কাজ করা যাক। ক'জনে মিলে ব্যাটাকে ভয় দেখাই— তাহলে হয়তো পালাবে।

শাশ্বতী: (মুখ তুলিয়া সানন্দে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ!— এস, ভয় দেখাই। নিশ্চয় পালাবে তাহলে—

দ্বারের কাছে খুট্ করিয়া শব্দ হইল। সকলে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। চাঁদ এতক্ষণে জানালার মাথায় উঠিয়াছে। পেঁচা ডাকিল— ঘুৎ।

সন্তর্পণে কালো পর্দা সরাইয়া অমরনাথ মুণ্ড বাড়াইয়া চারিদিকে দেখিল। কিন্তু প্রেতলোকের দীপ্তি মানুষের নয়নগোচর নয়, সে অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না। তখন একটি বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালিয়া সে ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। টর্চের আলো শাশ্বতী, মৃত্যুঞ্জয় ও নিত্যানন্দের গায়ে পড়িল, কিন্তু অমরনাথের মর-চক্ষে তাহারা ধরা পড়িল না। সে তখন আশ্বস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল।

অমরনাথের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ; লম্বা-চৌড়া অথচ ভারি ধরনের চেহারা। মাংসল মুখে বসন্তের দাগ, চুল উস্কখুস্ক; চোখের দৃষ্টি আশঙ্কা ও সতর্কতায় প্রখর। তাহার একহাতে ছোট হ্যাণ্ড-ব্যাগ অন্য হাতে টর্চ; পরিধানে ময়লা ধুতি ও গলাবন্ধ কালো কোট।

অমরনাথ: যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্দি। এখানে পুলিসের বাবাও খুঁজে পাবে না; এ বাড়িটা যে আমার তাই কেউ জানে না। (ঘরের চারিদিকে টর্চের আলো ফেলিয়া) যেমনটি পনের বছর আগে রেখে গিয়েছিলুম ঠিক তেমনটি আছে— (টর্চ নিভাইয়া) কি অন্ধকার! কিন্তু বেশিক্ষণ টর্চ জ্বালা চলবে না তাহলে সেল্ ফুরিয়ে যাবে। মোমবাতি বার করি!

অমরনাথ হাতড়াইয়া ঘরের মধ্যস্থিত টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল; টেবিলের নিকটবর্তী হইয়া একটি চেয়ারে হোঁচট খাইয়া পতনোন্মুখ হইল। নিত্যানন্দ সজোরে হাসিয়া উঠিল।

নিত্যানন্দ: ব্যাটা রাতকানা— শুকনো ডাঙায় আছাড় খাচ্ছিল।

শাশ্বতী: মানুষগুলো তো অমনিই হয়— চোখ থাকতে দেখতে পায় না, কান থাকতে শুনতে পায় না— তবু বড়াই কত! গুমর করে বলে ওরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব!

অমরনাথ কিন্তু হাসি, কথা কিছুই শুনিতে পায় নাই। হোঁচটের তাল সামলাইয়া সে ব্যাগ ও টর্চ টেবিলের উপর রাখিল, তারপর ব্যাগ খুলিয়া একটি আধপোড়া মোমবাতি বাহির করিয়া জ্বালিল।

অমরনাথ: (টেবিলের উপর মোমবাতি বসাইয়া) জানালাটা খোলা রয়েছে— কিন্তু এ সময় এ বন-বাদাড়ে কেউ আসবে না। যদি বা আসে, ভাববে ভূতুড়ে বাড়ি— হা—হা—হা—

অদৃশ্য দর্শক তিনজনও হাসিল। অমরনাথ হাসিতে হাসিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া সচকিতভাবে চারিদিকে চাহিল।

অমরনাথ: ঠিক মনে হল কারা যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে হাসছে— বাড়িতে কেউ আছে নাকি?

নিত্যানন্দ: নাঃ—কেউ নেই! তুমি একা রাম-রাজত্ব করছ। ক্যাবলা কোথাকার!

অমরনাথ কিছুক্ষণ শরীর শক্ত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

অমরনাথ: না— বোধ হয় প্রতিধ্বনি। জোরে হেসেছিলুম—

বাহিরে পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল— পিউ কাঁহা— পিউ কাঁহা—!

অমরনাথ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

অমরনাথ: আরে ছ্যাঁঃ, পাপিয়া ডাকছে— তাকেই হাসির আওয়াজ মনে করেছিলুম— হে-হে-হে—

গলার মধ্যে হাসিতে হাসিতে সে জানালার দিকে গেল: নিত্যানন্দের পাশ দিয়া যাইবার সময় নিত্যানন্দ তাহার হাসির সহিত সুর মিলাইয়া ব্যঙ্গ স্বরে হাসিল—

নিত্যানন্দ: হে হে হে—

অমরনাথ জানালার নিকট গিয়া বাহিরে উঁকিঝুঁকি মারিল। চাঁদ জানালার উপরে উঠিয়া গিয়াছে— আর দেখা যায় না। অমরনাথ আশ্বস্ত মনে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কোটের বোতাম খুলিতে লাগিল।

অমরনাথ: জনমানব নেই। মিছে আঁৎকে উঠেছি। কথায় বলে, ঝোপে ঝোপে বাঘ, আমিও তাই দেখছি। না, আর ওকথা ভাবব না— একটু একটু ক্ষিধে পেতে আরম্ভ করেছে— ক্ষিধের আর অপরাধ কি? ভাগ্যে বুদ্ধি করে পাঁউরুটি এনেছি— তাই খেয়ে সোফায় লম্বা হয়ে তোফা ঘুমোনো যাবে।

শাশ্বতী: ওমা, কি ঘেন্না— আমার সোফায় ঘুমোবে!

অমরনাথ: (আত্মশ্লাঘার স্বরে) বুদ্ধি থাকলে কি না হয়! এই তো খুন করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়লুম, ধরতে পারলে পুলিস?

নিত্যানন্দ: অগাধ বুদ্ধি তোমার।

শাশ্বতী: ঠাকুরপো, এবার আরম্ভ কর— আর সহ্য হচ্ছে না!

নিত্যানন্দ: এই যে—

সে গিয়া ফুৎকারে মোমবাতিটা নিভাইয়া দিল। অমরনাথ টেবিলের দিকে আসিতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

অমরনাথ: এ কি! বাতি নিভে গেল যে—! (কাছে আসিয়া দেশলাই জ্বালিতে জ্বালিতে) কিন্তু হাওয়া তো নেই! (সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া) গা ছম্‌ছম্‌ করছে। না, ওসব মনের ভুল। বোধ হয় ঘরটাতে অনেক খারাপ গ্যাস জমা হয়েছে— অনেকদিন বন্ধ আছে কিনা—! ভূত-ফুৎ আমি মানি না।

নিত্যানন্দ: তা মানবে কেন? তোমার কত বুদ্ধি। বৌদি, তোমরাও এস, সবাই মিলে লাগা যাক—

অমরনাথ একটা চেয়ারে বসিয়া ব্যাগ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল; তিনজনে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল— শাশ্বতী পিছনে, নিত্যানন্দ ও মৃত্যুঞ্জয় দুই পাশে। অমরনাথ ব্যাগ হইতে একটা আস্ত পাঁউরুটি বাহির করিয়া তাহাতে কামড় দিবার উপক্রম করিল, ঠিক এই সময় শাশ্বতী তাহার ঘাড়ে ফুঁ দিল। অমরনাথ রুটি হাতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমরনাথ: কে—! ঠিক যেন কে ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেললে, এ কি— এ সব কি? ঘরটা ভাল ঠেকছে না। চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে চারিদিকে কারা যেন রয়েছে। পালিয়ে যাব? কিন্তু পালিয়েই বা যাব কোথায়, বেরুলেই তো পুলিসে ধরবে। (ঘাড়ে হাত দিয়া) না— গ্যাস নিশ্চয়। কিংবা— হয়তো আমার নার্ভ খারাপ হয়ে গেছে। না না, নার্ভ খারাপ হলে চলবে না। খাই, খেলে শরীর ঠিক হবে। খালি পেটে যত আপদ এসে জোটে—

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অমরনাথ পাঁউরুটি খাইতে লাগিল।

শাশ্বতী: উঃ— কি বীভৎস! খাচ্ছে— খাচ্ছে— হাঁউ হাঁউ করে জানোয়ারের মতো খাচ্ছে। আমি ও দেখতে পারি না— (মুখ ঢাকিল)।

মৃত্যুঞ্জয়: মানুষ— এই মানুষ! রাশি রাশি খাচ্ছে— আর—ছি ছি—!

নিত্যানন্দ: যাকগে যাকগে দাদা, ওসব নোংরা কথা যেতে দিন। —এবার কি করা যায়? ব্যাটার নাক ধরে

নেড়ে দিই।

অমরনাথ: (খাইতে খাইতে) কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে। কল্পনা— কল্পনা। মাথা গরম হয়েছে। খেয়েই শুয়ে পড়ি।— উঃ, শুকনো রুটি চিবিয়ে গলা কাঠ হয়ে গেছে। একটু জল পাওয়া যেত—!

নিত্যানন্দ: জলের ভাবনা কি চাঁদু, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি—

নিত্যানন্দ দ্বারের কাছে গিয়া পর্দার ওপারে হাত বাড়াইয়া এক গ্লাস জল আনিল, তারপর জলের গ্লাসটি অমরনাথের মাথার উপর ধরিয়া অল্প অল্প জল ফেলিতে লাগিল।

অমরনাথ: অ্যাঁ—! (ঊর্ধ্বে চাহিয়া) এ কি— জল— শূন্যে গেলাস—!

রুটি ফেলিয়া দিয়া সে পিছু হটিয়া জানালার দিকে যাইতে লাগিল; নিত্যানন্দ গ্লাস তুলিয়া তাহার পিছে পিছে চলিল। শাশ্বতী মোমবাতিটা তুলিয়া লইয়া শূন্যে ঘুরাইতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয় টর্চটা লইয়া অমরনাথের ভয়বিহ্বল মূর্তির উপর আলো ফেলিল।

অমরনাথ: অ্যাঁ—! বাতি শূন্যে ঘুরছে। টর্চ—! ওঃ!

অমরনাথের মুখ ভয়ে বিকটাকৃতি ধারণ করিল। সে হঠাৎ দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া গোঙানির মতো শব্দ করিতে করিতে বাঁ দিকের কৌচের পিছনদিকে পড়িয়া গেল। তাহার গোঙানি সহসা স্তব্ধ হইল।

কিছুক্ষণ তিনজনে নীরব; কেবল বাহিরে পেঁচা ডাকিল— ঘুৎ! শাশ্বতী বাতিটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিল; মৃত্যুঞ্জয় টর্চ নিভাইল। নিত্যানন্দ একবার কৌচের পিছনে উঁকি মারিয়া মুখের একটা ভঙ্গি করিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া জলের গ্লাস রাখিল। তিনজনে পরস্পর মুখের পানে তাকাইল।

নিত্যানন্দ: (একটু কাসিয়া) তাই তো! একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যেন।

মৃত্যুঞ্জয়: হুঁ। এ আবার হিতে বিপরীত হল। মানুষকে যদি বা তাড়ান যেত এখন আর—

সকলে একসঙ্গে পিছনদিকে তাকাইল।

অমরনাথ কৌচের পিছন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর ঈষৎ টলিতে টলিতে টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু ঢুলুঢুলু, যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে।

তিনজনে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল; নিত্যানন্দ মৃত্যুঞ্জয়কে ইঙ্গিতপূর্ণ কনুইয়ের ঠেলা দিল।

মৃত্যুঞ্জয়: কী! কেমন মনে হচ্ছে!

অমরনাথ হাই তুলিতে গিয়া থামিয়া গেল; তাহার চেতনা যেন সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। সে একবার সচকিতে তিনজনের দিকে তাকাইয়া ত্রস্তভাবে পিছু হটিল।

অমরনাথ: কে— কে তোমরা?

নিত্যানন্দ: ভয় নেই— আমরা পুলিস নয়। দেখছেন না একজন মহিলা রয়েছেন।

অমরনাথ: তবে— তবে— কি চাই?

নিত্যানন্দ: কিছু না। আপনাকে শুধু জানাতে চাই যে, ব্যাপারটা একটু বেশি দূর গড়িয়েছে; এতদূর গড়াবে আমরা ভাবিনি।

অমরনাথ বুঝিতে পারে নাই, এমনিভাবে তাকাইয়া রহিল; তারপর ঈষৎ আশ্বস্তভাবে এক পা আগাইয়া আসিল।

অমরনাথ: মানে— ঠিক বুঝতে পারছি না।

মৃত্যুঞ্জয়: প্রথমটা অমনিই হয়। আপনি মুক্তি পেয়েছেন।

অমরনাথ: (সাগ্রহে) মুক্তি! মুক্তি পেয়েছি।

নিত্যানন্দ: (সহাস্যে) মানে— একেবারে মুক্তি পেয়েছেন। পটল তুলেছেন— শিঙে ফুঁকেছেন।

অমরনাথ: পাগল না ছন্ন। কে শিঙে ফুঁকেছে?

নিত্যানন্দ: আপনি— আপনি। এখনও ধরতে পারছেন না।— এদিকে আসুন, স্বচক্ষে না দেখলে

আপনার বিশ্বাস হবে না দেখছি।

অমরনাথকে লইয়া গিয়া নিত্যানন্দ কৌচের পিছনটা দেখাইল। অমরনাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, তারপর ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। তাহার চেহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে কেমন যেন অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। সে অন্যমনস্কভাবে ফুঁ দিয়া মোমবাতিটা নিভাইয়া দিল।

নিত্যানন্দ: কেমন? এবার বিশ্বাস হল?

অমরনাথ: (আত্মগতভাবে) আমি মরে গেছি। লাস পড়ে রয়েছে। আশ্চর্য! মরে গেছি— কিছুই তো তফাৎ বুঝতে পারছি না। না, না, বুঝতে পারছি— (তাহার মুখ উৎফুল্ল হইতে লাগিল) আর ভয় নেই— আর ভাবনা নেই— আর আমাকে পালিয়ে বেড়াতে হবে না— (দুই বাহু আস্ফালন করিয়া) আমি মরিনি— আমি বেঁচেছি— বেঁচেছি—

অমরনাথ আনন্দে লাফাইয়া লাফাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল না, এই অবকাশে আর একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার দুশমনের মতো চেহারা, বড় বড় রক্তবর্ণ চক্ষু, মাথায় চুল যেন কোনও গাঢ় তরল পদার্থের সাহায্যে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে একটা ছাই রঙের চাদর; দুই বাহু বুকের উপর আবদ্ধ।

অমরনাথের নৃত্য একটু শ্লথ হইতেই সে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; জ্বলন্ত চক্ষে চাহিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—

আগন্তুক: অমরনাথ, আমাকে চিনতে পার?

অমরনাথ প্রথমটা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া পরে চিনিতে পারিয়া সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল—

অমরনাথ: অ্যাঁ! এ সে অবিনাশ— ওরে বাবারে—

অমরনাথ ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল; অবিনাশ তাহার পিছনে তাড়া করিল— ঘরময় দু'জনের ছুটাছুটি চলিতে লাগিল। নিত্যানন্দ হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।

অবিনাশ: আমাকে খুন করেছিলে— আমার টাকা নিয়ে পালিয়েছিলে— যাবে কোথায়— কেন খুন করেছিলে—

অমরনাথ: ওরে বাবারে— ওরে বাবারে—

এইভাবে ছুটোছুটি করিতে করিতে প্রথমে অমরনাথ ও তৎপশ্চাতে অবিনাশ দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

শাশ্বতী ও মৃত্যুঞ্জয় এতক্ষণ পাশাপাশি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, এই হুড়াহুড়িতে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই। নিত্যানন্দ কিন্তু মাতিয়া উঠিয়াছিল— সে মহোৎসাহে দ্বারের পানে যাইতে যাইতে বলিল —

নিত্যানন্দ: ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই! যাই রগড় দেখিগে—

সে দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এমন সময় মৃত্যুঞ্জয় পিছন হইতে বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল—

মৃত্যুঞ্জয়: নিত্যানন্দ!

নিত্যানন্দ: (ফিরিয়া আসিয়া) কি দাদা?

মৃত্যুঞ্জয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

মৃত্যুঞ্জয়: তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। আমার ডাক এসেছে।

নিত্যানন্দের হাসিমুখ মুহূর্তে ম্লান হইয়া গেল।

নিত্যানন্দ: ডাক এসেছে!

মৃত্যুঞ্জয়: হ্যাঁ— আবার যেতে হবে। সময়ও বেশি নেই।— তোমাকে আর কি বলব, শাশ্বতী রইলো মাঝে মাঝে দেখাশুনা করো।

শাশ্বতী আঁচলে চোখ মুছিল। নিত্যানন্দ মুখে প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—

নিত্যানন্দ: সে আর বলতে। তুমি কিছু ভেবো না দাদা, আমি আছি, যতদিন না ফিরে আসো আমি যক্ষের মতো বৌদিকে আগলে থাকব। ভগবান করুন যেন চট্‌পট্‌ ফিরে আসতে পার।

মৃত্যুঞ্জয়: কতদিনে ফিরব তা তো কিছু ঠিক নেই—

নিত্যানন্দ: কিছু বলা যায় না দাদা। আজকাল হতভাগা মানুষগুলোর মধ্যে যে রকম লড়াই বেধেছে— কুরুক্ষেত্র তার কাছে ছেলেখেলা। মানুষ মরে উড়কুড় উঠে যাচ্ছে। শুধু কি যুদ্ধ— তার ওপর রকমারি রোগ — দুর্ভিক্ষ। ছেলে বুড়ো কেউ বাদ যাচ্ছে না। ভালয় ভালয় যদি চট্‌ করে টেঁসে যেতে পার, তবে আর তোমায় পায় কে!

মৃত্যুঞ্জয়: ঐ যা একটু ভরসা।— আচ্ছা, তাহলে—

নিত্যানন্দ: এস দাদা। দুর্গা দুর্গা— হাসি মুখে যেন শিগ্‌গির ফিরে আসতে পার।

মৃত্যুঞ্জয়: শাশ্বতী—

নিত্যানন্দ সরিয়া গিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। মৃত্যুঞ্জয় ও শাশ্বতী বিদায়-বিধুর মুখে হাত ধরাধরি করিয়া পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এই সময় অবিনাশ ও অমরনাথ হাতে হাতে জড়াজড়ি করিয়া পরম বন্ধুভাবে প্রবেশ করিল।

নিত্যানন্দ: আরে গেল যা, ষণ্ডা দুটো আবার এসেছে। ইঃ— একেবারে গলাগলি ভাব।— বলি, ব্যাপার কি?

অমরনাথ: আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। অবিনাশকে বিনাশ করে আমি ওর কতখানি উপকার করেছি, তা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি।

অবিনাশ: (গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে) অমরনাথ, তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু। এখন থেকে দু'জনে একসঙ্গে থাকব, তোমাকে একদণ্ড ছাড়্‌ব না। স্যাওড়াতলার ঐ মজা কুয়োটার মধ্যে আমার আস্তানা দেখলে তো। কেমন, পছন্দ হয় না?

অমরনাথ: পছন্দ হয় না আবার। ঐ তো স্বর্গ— হমীন অস্ত্‌ হমীন অস্ত্‌।

নিত্যানন্দ: আচ্ছা হয়েছে, এবার একটু থামুন। মৃত্যুঞ্জয়দার ডাক এসেছে। উনি এখুনি যাবেন।

অমরনাথ ও অবিনাশ সহানুভূতিপূর্ণ নেত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

অমরনাথ: (সনিঃশ্বাসে) আহা বেচারা—

তাহারা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের মাঝখানে শাশ্বতী ও মৃত্যুঞ্জয় পূর্ববৎ বদ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের প্রেতদীপ্তি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। মূর্তিগুলি অস্পষ্ট হইয়া ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে মিশিয়া গেল। কিছু আর দেখা যায় না।

নিস্তব্ধ অন্ধকার। সহসা এই স্তব্ধতার মধ্যে বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণ একটি শব্দ ভাসিয়া আসিল— সদ্যোজাত শিশুর কান্না।

১৬ ফাল্গুন ১৩৫১

আকাশবাণী

ক্লাবের বারান্দায় আমরা কয়েকজন নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলাম। ফাল্গুন মাসের অপরূপ একটি গোধূলি যেন বাতাসে গোরোচনার স্নিগ্ধ শীকর-কণা ছড়াইতেছিল। এমন সন্ধ্যায় বরদার মুখেও ভূতের গল্প বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া একটি প্রেমের গান ভাঁজিতেছিল। 'যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি।'

এমন সময় সুধাংশু আসিয়া দেখা দিল। সুধাংশু আমাদের বন্ধু হইলেও এতদিন ক্লাবের সভ্য ছিল না, সম্প্রতি হইয়াছে। সম্ভবত বরদার সঙ্গে ভূত-প্রেত লইয়া তর্ক করিবার মতলব লইয়াই সে ক্লাবে ঢুকিয়াছে। প্রেতযোনি সম্বন্ধে এতবড় নাস্তিক বড় একটা দেখা যায় না; বরদার সঙ্গে চোখাচোখি হইলেই তাহার মুখ লড়ায়ে মেড়ার মতো যুযুৎসু ভাব ধারণ করিত। তারপর দু'জনের মধ্যে যে তর্ক আরম্ভ হইত তাহার তুলনা খুঁজিতে হইলে রামায়ণ মহাভারতের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু আজ লক্ষ্য করিলাম, সুধাংশুর সে তেজ নাই, মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাসে। মনের মধ্যে সে যেন বড় রকম ধাক্কা খাইয়াছে।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, 'হে সুধাংশু, কেন পাংশু বদন তোমার?'

সুধাংশু উত্তর দিল না, সোজা বরদার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তদ্‌গতভাবে কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া গাঢ় স্বরে কহিল, 'ভাই বরদা, পায়ের ধুলো দাও।' বলিয়া তাহার পায়ে হাত ঠেকাইয়া মাথায় স্পর্শ করিল।

আমরা সকলে হাঁ করিয়া রহিলাম; এমন কাণ্ড জীবনে দেখি নাই। বরদাও ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছিল; সুধাংশুর হাত ধরিয়া পাশের চেয়ারে বসাইতেই সে বলিয়া উঠিল, 'তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। কালকের ঘটনার পর আর আমার প্রেতযোনিতে অবিশ্বাস নেই।'

অতঃপর 'কালকের ঘটনা' শুনিবার জন্য আমরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ উন্মনাভাবে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিয়া সুধাংশু আরম্ভ করিল—

মাসখানেক হল আমাদের পাড়ায় একটি নতুন বাঙালী ভদ্রলোক এসেছেন— প্রিয়তোষবাবু। ঐ যে বাড়িখানা আগে মাইনর স্কুল ছিল, সেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন। বাড়ির চারধারে পাঁচিল-ঘেরা ফাঁকা জমি; হল্‌দে রঙের বাড়িখানা। দেখেছ বোধ হয়।

প্রথম দিনই প্রিয়তোষবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পাড়ায় নতুন বাঙালী এসেছেন, তাই সাদর সম্ভাষণ করবার জন্যে নিজে উপযাচক হয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলুম। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের একটি সৌখীন গোছের ভদ্রলোক; প্রথমদিন এসেই মিস্ত্রী ডাকিয়ে বাড়ির মাথার ওপর রেডিওর এরিয়েল বসাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে মামুলি দু'চারটে কথা হল। কাজকর্ম কিছু করেন না; পয়সা আছে। পুত্রকলত্রও কেউ নেই— বছর দশেক আগে পত্নীবিয়োগ হয়েছে। তারপর থেকে খেয়ালমতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। এর আগে বছর দেড়েক গয়ায় ছিলেন। সেখানে আর মন টিক্‌ল না তাই চলে এসেছেন।

ভদ্রলোক একলা থাকেন, অথচ এত বড় বাড়ি নিয়ে কি করবেন, এই ভেবে তখন একটু আশ্চর্য মনে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম আলাপেই তো ওকথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। তিনি যেসব আসবাবপত্র সঙ্গে এনেছিলেন তাও বেশ দামী আর সৌখীন। দেখলুম লোকটি বিপত্নীক এবং বয়স্থ হলে কি হয়, প্রাণটা বেশ তাজা রেখেছেন।

তারপর আরও বার দুই তার বাড়িতে গিয়েছিলুম। তাঁর চরিত্রে দু'একটি ছোটখাটো অসঙ্গতি চোখে

পড়েছিল। তিনি সৌখীন লোক, কিন্তু স্বপাক আহার করেন; একটিমাত্র শুকো চাকর রেখেছেন, সে দিনের বেলায় কাজকর্ম সেরে বাড়ি চলে যায়। তাঁর বাড়িতে মেয়েমানুষের পাট নেই, অথচ বসবার ঘরটি ছবির মতো সাজিয়ে রেখেছেন। পুরুষমানুষ যে এত গোছালো হতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আরও লক্ষ্য করলুম, লোকটি যে পরিমাণে অমায়িক সে পরিমাণে মিশুক নয়। কথা ভারি মিষ্টি, কিন্তু কম কথা বলেন। কথা বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তাছাড়া আমি তিনবার তাঁর বাড়িতে গেলুম, তিনি একবারও তার পাল্টা দিলেন না। একটু বিরক্তি বোধ হল; সন্দেহ হল, তিনি হয়তো মনে করেন তাঁকে বড়লোক মনে করে আমি তাঁর মোসাহেবি করবার চেষ্টা করছি। যাওয়া বন্ধ করে দিলুম। তারপর পথেঘাটে মাঝে মাঝে দেখা হত, এই পর্যন্ত।

এইভাবে হপ্তা তিনেক কেটে গেল। প্রিয়তোষবাবুর সম্বন্ধে মনটা যখন প্রায় নির্লিপ্ত হয়ে এসেছে এমন সময় তাঁর নামে কয়েকটা কথা কানে এল। এসব খবর মেয়েদের কানেই আগে পৌঁছোয়; আমার স্ত্রী খবরটা দিলেন। প্রিয়তোষবাবু নাকি সুবিধের লোক নন, রাত্রি দশটার পর তাঁর বাড়িতে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ শোনা যায়। পাড়ার কেউ কেউ শুনেছে।

এমন কিছু অসম্ভব কথা নয়, মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। প্রিয়তোষবাবুকে যেটুকু দেখেছিলুম তাতে তাঁকে লম্পট দুশ্চরিত্র বলে মনে হয়নি। তবু, কিছুই বলা যায় না। যাদের সারা জীবন ধরে দেখছি তাদেরই চিনতে পারলুম না, আর প্রিয়তোষবাবুর চরিত্র এক নজরে চিনে নেব এত অহঙ্কার আমার নেই।

তাছাড়া, সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, এ বিষয়ে করবার কিছু নেই; করবার মধ্যে বৈঠকখানায় বসে মুখরোচক জল্পনা করতে পারি। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল।

কাল সকালবেলা পাড়ার ছোকরা দলের চাঁই ভূতো আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। ভূতো ডাকাবুকো ছেলে, মনের মধ্যে মারপ্যাঁচ নেই; মেজাজ কড়া। সে এসেই প্রিয়তোষবাবুর কথা তুললে, 'শুনেছেন বোধ হয়?'

দেখলুম ভূতোর মন এখনও আমাদের মতো নির্লিপ্ত জল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠেনি। কুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করতে হল, 'কিছু কিছু শুনেছি বৈকি।'

ভূতো টেবিলের ওপর কীল মেরে বললে, 'এ রকম লোক পাড়ায় রাখা যেতে পারে না। ছেলেরা বলছে, একদিন ধরে দু'ঘা দেওয়া যাক, তাহলেই পালাবে।'

ভূতো আর তার দল বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু মনে মনে তাদের বাহুবলকে সম্ভ্রম করি। তবু ক্ষীণ আপত্তি করে বললুম, 'শুধু কানাঘুষোর ওপর এতটা বাড়াবাড়ি করা কি ঠিক হবে? বরং কথাটা সত্যি কিনা ভালভাবে যাচাই করে যা হয় করা উচিত।'

ভূতো বললে, 'বেশ তো, আপনিই যাচাই করুন।'

অতঃপর ভূতের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল রাত্রে গিয়ে প্রিয়তোষবাবুর বাড়িতে আড়ি পাতা। কাজটা মোটেই রুচিকর মনে হল না; কিন্তু একটা লোককে উত্তম-মধ্যম দেবার আগে তার অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া ভাল।

রাত্রি সাড়ে দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে রবার-সোল্ জুতো পায়ে দিয়ে বেরুলুম। স্ত্রীকে বলে গেলুম, 'ফিরতে হয়তো দেরি হবে। ঘুমিও না। দিল্লী থেকে 'ফিল্মি গান' দিচ্ছে, রেডিওতে তাই শোন।'

প্রিয়তোষবাবুর ফটকের সামনে ভূতোর সঙ্গে দেখা হল। ভূতোটা এমন গোঁয়ার, জুতো পরে এসেছে যার আওয়াজ দেড় মাইল দূর থেকে শোনা যায়। তাকে বললুম, 'ও জুতো পরে তোমার ভেতরে যাওয়া চলবে না। শিকার ভড়্কে যাবে।'

সে বললে, 'বেশ, আমি বাইরে পাহারায় রইলুম।' রাস্তা তখন নির্জন হয়ে গেছে। প্রিয়তোষবাবুর বাড়ি অন্ধকার। ফটক পার হয়ে পা টিপে টিপে চললুম। বাড়ির সামনাসামনি এসে সদর দরজার মাথার ওপর খিলেনের কাচের ভিতর দিয়ে একটু আলো চোখে পড়ল।

ঘরের দরজা জানলা সবই বন্ধ, কিন্তু ভেতর থেকে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন আসছে— যেন কারা খাটো গলায় কথা কইছে। আমার বুকের মধ্যে একবার দুড়দুড় করে উঠল— কারণ, পরের বাড়িতে গিয়ে চোরের মতো আড়ি পাতার অভ্যেস কোনকালে নেই। যদি ধরা পড়ি তাহলে কী বলব, তার একটা খসড়া মনে মনে মক্‌শ করে রেখেছিলুম; কিন্তু স্নায়ুর কম্পন তাতে থামল না। যা হোক, অপ্রীতিকর কর্তব্য যখন করতেই হবে তখন দ্বিধা করে লাভ নেই।

বাড়ির সামনে একফালি খোলা বারান্দা, তারপরই বৈঠকখানা ঘর। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে বৈঠকখানার বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছিল— ফাল্গুন রাতের হাওয়া— ঠাণ্ডা আর মোলায়েম। এমন কিছু বুড়ো হইনি। মনে হল, এমন রাত্রে কোনও প্রণয়ীর ঘরে গুপ্তচরবৃত্তি করা একটা অপরাধ, তা হোক না সে অবৈধ প্রণয়! কিন্তু সে যাক, ওটা মনের ক্ষণিক দুর্বলতা মাত্র।

ঘরের মধ্যে দু'জন লোক কথা কইছে; বেশ সহজ গলাতেই কথা কইছে। একজনের গলা চিনতে কষ্ট হল না, নিঃসংশয়ে প্রিয়তোষবাবুর গলা। অন্য গলাটি— হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরই বটে। মিষ্টি ভরা গলা— কিন্তু ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়; এস্রাজের তারের আওয়াজের মতো তাতে একটা ধাতব ঝঙ্কার আছে।

কান পেতে শুনতে লাগলুম। গলার আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কথাগুলো ঠিক ধরতে পারছি না। একবার মনে হল প্রিয়তোষবাবু কবিতা আবৃত্তি করছেন— 'তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে সখি —'...তারপর কিছুক্ষণ কথাবার্তা অস্পষ্ট হয়ে গেল। দোরের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শোনবার চেষ্টা করলুম... কথাবার্তার সুর বদলে গেছে— মান-অভিমানের পালা চলছে। মনে হল যেন মেয়েলি গলা বলছে... 'যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না... আর আস্‌বোও না... কেন তুমি—?'

আমার মনের মধ্যে শুধু বিস্ময়ই নয়, আতঙ্কও জমা হয়ে উঠছিল। কারণ, মেয়েলি গলাটি কেবল বাঙালী মেয়ের গলাই নয়, শিক্ষিত মার্জিত বাঙালী মহিলার গলা! মনে মনে ঘেমে উঠছিলুম আর ভাবছিলুম— কে হতে পারে?

হঠাৎ ঘরের মধ্যে সব আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় দশ সেকেন্ড আর কোনও শব্দ নেই। তারপর একটি সুমিষ্ট ব্যঙ্গ-হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

হাসি থামলে স্পষ্ট স্ত্রীকণ্ঠ শুনতে পেলুম—'একটি ভদ্রলোক দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতছেন। যাও, আদর করে ঘরে এনে বসাও।'

চমকে উঠলুম। পালাব কিনা ভাবছি, এমন সময় প্রিয়তোষবাবু দরজা খুলে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে আলো ছিল, মৃদুশক্তির একটা নীল বাল্‌ব জ্বলছিল; দেখলুম প্রিয়তোষবাবুর মুখে বিরক্তি এবং ক্ষোভ মাখানো রয়েছে বটে, কিন্তু অবৈধ প্রণয়ে ধরা পড়ার লজ্জা সেখানে লেশমাত্র নেই। তিনি বললেন, 'আসুন।'

একরকম অসাড়ভাবেই ঘরে ঢুকলুম। ঘরের মধ্যে কিন্তু আর কেউ নেই; মেয়েলি গলার অধিকারিণী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেবল ঘরের একপাশে রেডিও সেটের ভেতর থেকে আলো বেরুচ্ছে; যেন প্রিয়তোষবাবু এতক্ষণ বসে রেডিও শুনছিলেন, যন্ত্রটা বন্ধ না করেই দরজা খুলতে এসেছেন।

প্রিয়তোষবাবু যদি আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতেন তাহলে আমিও একটু জোর পেতুম কিন্তু এতই ভদ্রভাবে আমাকে রেডিওর কাছে নিয়ে গিয়ে বসালেন যে, আমার মুখে আর কথা যোগালো না। তিনি নিজের মুখের ওপর দিয়ে একবার হাত চালিয়ে ধীরভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কিছু দরকার আছে কি?'

আমি উত্তর দেবার আগেই সেই ব্যঙ্গহাসি আমার কানের কাছে আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, আওয়াজটা আসছে রেডিওর ভেতর থেকে! তারপরই কথা শুনতে পেলুম, বিদ্রূপভরা তীক্ষ্ন কণ্ঠের কথা— 'দরকার আছে বৈকি। তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ তাই চুরি করে শুনতে এসেছেন!'

সভয়ে রেডিওর কাছ থেকে সরে এলুম। মাথার চুল বোধহয় খাড়া হয়ে উঠেছিল, গায়েও কাঁটা দিয়েছিল। বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ কি? কে কথা কইছে, প্রিয়তোষবাবু?'

প্রিয়তোষবাবু একবার চোখ তুলে আমার পানে চাইলেন, তারপর মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বললেন, ‘আমার স্ত্রী।’

‘আপনার স্ত্রী! কিন্তু—’

রেডিওর মধ্য থেকে গঞ্জনাভরা কঠিন স্বর বেরিয়ে এল, ‘কিন্তু তিনি মারা গেছেন— এই না? তাতে আপনার কী? আপনি কেন আমার স্বামীকে বিরক্ত করতে এসেছেন? যান বাড়ি যান। কী রকম ভদ্রলোক আপনি? আমার স্বামীর চরিত্র তদারক করবার কী অধিকার আছে আপনার? উনি আপনাদের পাড়ায় এসে আছেন, আপনাদের পাড়া পবিত্র হয়ে গেছে জানেন তা?’ তারপর হঠাৎ এই তপ্ত ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর উদ্বেগে যেন গলে গেল— ‘ওগো যাও, এবার শুয়ে পড় গিয়ে— নইলে শরীর খারাপ হবে। অনেক রাত হয়েছে।’

প্রিয়তোষবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আমার মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল, নেহাৎ গ্রাম্য লোকের মতো বললুম, ‘কিন্তু কিছু যে বুঝতে পারছি না! রেডিওর ভেতর থেকে—?’

ক্লান্ত স্বরে প্রিয়তোষবাবু বললেন, ‘রেডিওতে আমার স্ত্রী রোজ এই সময় আমার সঙ্গে কথা কন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই এমনি হয়ে আসছে। আমার জীবনের এই একমাত্র সম্বল। উনিই সংসার চালান, উনিই সব কিছু করেন— আমি শুধু ওঁর কথা মতো কাজ করে যাই।’

বিস্ময়ের ঘোরে মনটা তখনও অর্ধ-মূর্ছিত হয়ে ছিল; বললুম, ‘কিন্তু এ কি করে সম্ভব হয়—?’

রেডিও থেকে অধীর উত্তর এল, ‘আপনি সে বুঝবেন না— বোঝবার বৃথা চেষ্টাও করবেন না। তার চেয়ে বাড়ি যান— আপনার স্ত্রীর বুকের ব্যামো আছে না? ভাল চান তো শিগ্‌গির বাড়ি যান, নইলে হয়তো আর দেখতে পাবেন না।’

শেষের দিকে কথাগুলো ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়ে উঠল।

সেই যে সাধু ভাষায় বলে বেত্রাহত কুক্কুর, ঠিক সেইভাবে প্রিয়তোষবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িমুখো দৌড়োতে আরম্ভ করলুম। পথে ভূতো বোধহয় সঙ্গ নিয়েছিল, কিন্তু সেটা জাগ্রত চেতনার কথা নয়— আবছায়া একটা অনুভূতি মাত্র।

বাড়ি পৌঁছে দেখি, বসবার ঘরে রেডিওটা খোলা রয়েছে, কিন্তু তার ভেতর থেকে কোন আওয়াজ বেরুচ্ছে না। আর মেঝের ওপর মাদুর পেতে স্ত্রী পড়ে আছেন। তাঁর দু’চোখ বন্ধ; একটা হাত এমন অস্বাভাবিকভাবে ছড়ানো রয়েছে। যে, মনে হয়—

মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। প্রায় তাঁর ঘাড়ের ওপর আছড়ে পড়লুম। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, ‘অ্যাঁ— এলে! আমার একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল—’

রেডিওর মধ্য থেকে তরল কৌতুকের হাসি এস্রাজের ধাতব মূর্ছনার মতো বেরিয়ে এল। তারপর সেই গলার আওয়াজ, —‘কেমন জব্দ! আর যাবেন পরের হাঁড়িতে কাঠি দিতে?...স্বামী-স্ত্রীর কথা চুরি করে শুনতে গিয়েছিলেন, তাই একটু ভয় দেখালুম। আর কখনও এমন কাজ করবেন না...’

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

ধীরেন ঘোষের বিবাহ

শ্রীযুক্ত ধীরেন ঘোষের বয়স তিপ্পান্ন বছর। তিনি অতি সঙ্গোপনে ট্রেনে চড়িয়া কাশী যাইতেছেন। উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা।

ধীরেনবাবু অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী। তাঁহার প্রথম পক্ষ হইতে কয়েকটি কন্যা আছে; সকলেই বিবাহিতা ও সন্তানবতী। গত বছর ধীরেনবাবুর স্ত্রী মারা গিয়াছেন। অতঃপর এ বছর তিনি আবার বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে হইলেও তাঁহার শরীর এখনও বেশ মজবুত আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা কেহ বুঝিতে চায় না।

তিনি বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই চারিদিকে একটা মস্ত গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে; মেয়েরা কান্নাকাটি করিবে; জামাতা বাবাজীরা মুখ ভার করিবেন; পাড়ার ছোঁড়ারা বাগড়া দিবার চেষ্টা করিবে। তাই ধীরেনবাবু গোপনে গোপনে নিজের বিবাহ স্থির করিয়াছেন এবং একটিও বরযাত্রী না লইয়া চুপি চুপি কাশী যাইতেছেন। কাশীতে পাত্রী ঠিক হইয়াছে। একেবারে বিবাহ করিয়া বৌ লইয়া বাড়ি ফিরিবেন। তখন যে যত পারে চেঁচামেচি করুক, কিছু আসে যায় না।

রাত্রির অন্ধকারে হু হু শব্দে ট্রেন ছুটিয়াছে। ধীরেনবাবুর কামরায় দুটি মাত্র বাঙ্ক; একটিতে তিনি শুইয়া, অন্যটি খালি। ধীরেনবাবু কল্পনাপ্রবণ লোক নয়; অতীত বিবাহিত জীবনের স্মৃতি কিংবা আগামী বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে না। তিনি মাঝে মাঝে ঝিমাইতেছেন, আবার জাগিয়া উঠিতেছেন। মন সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ।

গভীর রাত্রে ট্রেন একটি স্টেশনে থামিল। কামরার বাহিরে কয়েকজন লোকের গলার আওয়াজ শুনিয়া ধীরেনবাবু ঘাড় তুলিয়া দেখিলেন।

'এই যে গাড়িতে একটা বাঙ্ক খালি আছে— তুমি উঠে পড়ো—'...'আর তোমরা?'...'আমরা অন্য গাড়ি খুঁজে নিচ্ছি'...'উলু উলু উলু—'

একটি নব যুবক গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং শূন্য বাঙ্কটার উপর বিছানা পাতিতে প্রবৃত্ত হইল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ধীরেনবাবু মিটি মিটি চক্ষে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ছোকরা নিশ্চয় বিবাহ করিতে যাইতেছে। কোঁচানো ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, বয়স আন্দাজ বাইশ-তেইশ। চেহারা মন্দ নয়।

বিছানা পাতা শেষ হইলে যুবক বিছানায় বসিয়া তরিবত করিয়া একটি সিগারেট ধরাইল।

নিরুৎসুক চক্ষে তাহাকে দেখিতে দেখিতে ধীরেনবাবুর মনে হইল যুবককে তিনি পূর্বে কোথাও দেখিয়াছেন। সম্প্রতি নয়, অনেক দিন আগে। কবে কোথায় দেখিয়াছেন মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহার বসিবার ভঙ্গি অঙ্গ-সঞ্চালন— সবই যেন চেনা চেনা।

ধীরেনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কদ্দূর যাওয়া হচ্ছে?' যুবক চমকিয়া তাকাইল। এতক্ষণ সে ধীরেনবাবুকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই; এখন দেখিল একটা চিম্‌সে গোছের বুড়ো শুইয়া আছে। সে তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'গয়া।'

'বিয়ে করতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

ধীরেনবাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন এবং ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। ঘুম কিন্তু সহসা আসিল না, কে এই ছোকরা? কোথায় তাহাকে দেখিয়াছেন?—আর একটা অদ্ভুত যোগাযোগ— আজ হইতে ত্রিশ বছর পূর্বে ধীরেনবাবুও গয়ায় বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন— এমনি রাত্রির ট্রেনে চড়িয়া। তাহার প্রথম শ্বশুরবাড়ি ছিল গয়ায়।

আশ্চর্য।

নানা অসংলগ্ন কথা চিন্তা করিতে করিতে ধীরেনবাবু শেষে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি খচ্‌খচ্‌ করিতে লাগিল।

প্রত্যূষে ধীরেনবাবুর ঘুম ভাঙিল। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, যুবক নিজের বাঙ্কে নিদ্রা যাইতেছে। তিনি উঠিয়া বসিয়া একদৃষ্টে যুবকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার বুকের ভিতরটা আনচান করিতে লাগিল। চিনি চিনি করিয়াও কেন চিনিতে পারিতেছেন না? স্মৃতিশক্তি ভাল; এমন ভুল তো তাঁহার কখনও হয় না। অথচ এই যুবকের সহিত তাঁহার একটা অতি ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে— গাঢ় পরিচয় আছে—

চলন্ত গাড়ির একটা আচ্‌মকা ঝাঁকানি খাইয়া যুবকের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

'পরের স্টেশন কি গয়া?'

ধীরেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ।'

যুবক তখন স্নান-কামরায় গিয়া মুখহাত ধুইয়া আসিল; ক্ষিপ্র হস্তে বিছানা গুটাইয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ধীরেনবাবু দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর অজ্ঞাত সংশয়ে তোলপাড় করিতে লাগিল। এমন অস্থিরতা ও উদ্বেগ তিনি জীবনে কখনও ভোগ করেন নাই। অথচ কেন যে এই উদ্বেগ তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কেবল একটা মানুষকে চিনিতে না পারার জন্য এতখানি ব্যাকুলতা কি সম্ভব?

গাড়ির গতি মন্থর হইল। গয়া আসিয়া পড়িয়াছে। যুবক সিগারেট ধরাইয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

ধীরেনবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, 'কাশী।'

যুবক তাঁহার প্রতি এমন একটি দৃষ্টিপাত করিল যাহার অর্থ— কাশী যাবার বয়স হয়েছে বটে।

গয়া স্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল। যুবক নামিবার উপক্রম করিল।

ধীরেনবাবু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নাম কি?'

যুবক বিরক্তভাবে ফিরিয়া তাকাইল।

'আমার নাম শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।' বলিয়া সে নামিয়া গেল।

ধীরেনবাবু স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। দীর্ঘকাল তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

যে লোকটিকে তিনি কিছুতেই চিনিতে পারিতেছিলেন না, তাহাকে চিনিতে আর বাকি নাই। সে আর কেহ নয়— তিনি স্বয়ং। ত্রিশ বছর পূর্বে ধীরেনবাবু যাহা ছিলেন এই যুবকটি সেই। শুধু চেহারার সাদৃশ্য বা নামের ঐক্য নয়— সাক্ষাৎ তিনিই। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল; ধীরেনবাবু স্বপ্ন দেখিতেছেন না তো? তিনি চোখ রগড়াইয়া চারিদিকে চাহিলেন। না, স্বপ্ন নয়; সূর্য উঠিয়াছে। তিনি জাগিয়াই আছেন।

তাঁহার স্মৃতিশক্তিও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনে পড়িল, ত্রিশ বছর পূর্বে তিনি যখন বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন গাড়ির কামরায় একটি বৃদ্ধ ছিল। বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— কদ্দূর যাওয়া হচ্ছে? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন— গয়া। তারপর যাহা আজ ঘটিয়াছে সমস্তই ঘটিয়াছিল। বৃদ্ধ শেষ মুহূর্তে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। নাম শুনিয়া বৃদ্ধের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়াছিল—

সে বৃদ্ধ কে ছিল? সেও কি যুবক ধীরেনবাবুকে দেখিয়া নিজের অতীত যৌবনকে চিনিতে পারিয়াছিল? এমনিভাবে কি অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে?

এই সময় তিনি ধড়মড় করিয়া গাড়ি হইতে নামিতে গেলেন। দেখিলেন গাড়ি চলিতেছে। গাড়ি আবার কখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে! তিনি জানিতে পারেন নাই। তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন।

তাঁহার যৌবন এখন গয়ায়। আজ রাত্রে তাঁহার বিবাহ। তবে ধীরেনবাবু কোথায় যাইতেছেন? গয়ায় তাঁহার বিবাহ, তিনি কাশী চলিয়াছেন কি জন্য?

অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। বিশ্বাসের যোগ্য নয়। একটা মানুষের দুইটা বিভিন্ন বয়স যুগপৎ বর্তমান থাকে কি করিয়া? কিন্তু ধীরেনবাবু সর্বান্তঃকরণে জানেন ইহাই সত্য। ঐ যুবক যে তিনিই তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা অবশ্য তিনি জানেন না। কিন্তু সম্ভব হইয়াছে। ইহাই কি যথেষ্ট নয়?

পরের স্টেশনে গাড়ি থামিতেই ধীরেনবাবু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন। কাশী যাইবার আর প্রয়োজন নাই; দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহেরও প্রয়োজন নাই।

আজ রাত্রে তাঁহার প্রথম পক্ষের বিবাহ।

১৯ বৈশাখ, ১৩৫৬

দেহান্তর

বরদা বলিল, 'যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে না তাদের জোর করে বিশ্বাস করাতে যাওয়া উচিত নয়, আমি কখনও সে চেষ্টা করি না। কেবল একবার—'

নিদাঘকাল সমুপস্থিত: মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, এই সময় সূর্য প্রচণ্ড হয় এবং চন্দ্র হয় স্পৃহনীয়। সূর্যের প্রচণ্ডতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না। পরন্তু চন্দ্রের স্পৃহনীয়তা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে আমরা ক্লাবের কয়েকজন সভ্য সন্ধ্যার পর ক্লাবের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে শতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়াছিলাম। পূর্বাকাশে বেশ একটি নধর চাঁদ গাছপালা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে; তাহার আলোয় পরস্পর মুখ দেখিতে কষ্ট হয় না। অধিকাংশ সভ্যই ঔর্ধ্বদেহিক আবরণ মোচন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ক্লাবের ভৃত্যকে ভাঙের সরবৎ তৈয়ার করিবার ফরমাস দেওয়া হইয়াছিল। চন্দ্র যতই স্পৃহনীয় হোক, সেইসঙ্গে বরফ-শীতল সরবৎ পেটে পড়িলে শরীর আরও সহজে স্নিগ্ধ হয়। আমরা সতৃষ্ণভাবে সরবতের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে বরদা যখন বলিল, 'যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে না—' ইত্যাদি, তখন আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। ছুঁচের মতো সূক্ষ্মাগ্র এই প্রস্তাবনাটি যে অচিরাৎ ফাল হইয়া গল্পের আকারে দেখা দিবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। ভূতের গল্প শোনার পক্ষে গ্রীষ্মের চাঁদিনী রাত্রি অনুকূল নয়, এজন্য শীতের সন্ধ্যা কিংবা বর্ষার রাত্রি প্রশস্ত। কিন্তু বরদা যখন ভণিতা করিয়াছে, তখন আর নিস্তার নাই।

ভাগ্যক্রমে এই সময় সরবৎ আসিয়া পড়িল। আমরা প্রত্যেকে হৃষ্টচিত্তে একটি করিয়া ঠাণ্ডা গেলাস তুলিয়া লইলাম। পৃথ্বী গেলাসের কাণায় একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া বলিল, 'আঃ! দুনিয়াটা যদি মন্ত্রবলে এই সরবতের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেতো—'

বরদা বলিল, 'দুনিয়া বলতে তুমি কি বোঝো? এই ভারতবর্ষেই এমন জায়গা আছে, যেখানে এখন বরফ পড়ছে। গত বছর এই সময় আমি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, দেখলুম দিব্যি শীত—'

প্রশ্ন করিলাম, 'পাহাড়ে? কোন্ পাহাড়ে?'

বরদা বলিল, 'মনে কর মসুরী কিংবা নৈনিতাল। নাম বলব না, তবে সৌখীন হাওয়া বদলানোর জায়গা নয়। আমার বড় কুটুম্ব সেখানে বদলি হয়েছেন, তাঁরি নিমন্ত্রণে মাসখানেক গিয়ে ছিলুম। সেখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল—'

অমূল্য সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'ঘটনা না হয় ঘটেছিল, কিন্তু পাহাড়ের নাম বলতে লজ্জা কিসের?'

বরদা বলিল, 'লজ্জা নেই। যে গল্প তোমাদের শোনাতে যাচ্ছি তার পাত্রপাত্রী সবাই জীবিত, তাই একটু ঢাকাঢুকি দিয়ে বলতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে এমন উৎকট ব্যাপার ঘটে যায়— যা হোক, গল্পটা বলি শোনো।'—

হিল্ স্টেশনে যাঁরা বাস করেন তাঁদের চালচলন একটু বিলিতি ঘেঁষা হয়ে পড়ে। পুরুষেরা সচরাচর কোট-প্যান্ট পরেন। মেয়েরা অবশ্য শাড়ি ছাড়েননি, কিন্তু হাবভাব ঠিক দিশী বলা চলে না। টেবিলে বসে স্ত্রী-পুরুষের একসঙ্গে খাওয়া, ডিনারের পর দু'এক পেগ হুইস্কি বা পোর্ট— এসব সামাজিক ব্যবহারের অঙ্গ হয়ে গেছে। দোষ দেওয়া যায় না— শীতের রাজ্যে শীতের নিয়ম মেনে চলাই ভাল।

শ্যালকের চিঠি পেয়ে আমি তো গিয়ে পৌঁছলুম। দু'চার দিন থাকতে না থাকতেই গায়ে বেশ গত্তি

লাগল। আমার শ্যালকটি দারুণ মাংসাশী, বাড়িতে রোজ মুর্গি মাটনের শ্রাদ্ধ চলেছে। তার ওপর পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান। ঘন্টায় ঘন্টায় ক্ষিদে পায়। জায়গাটা সত্যিই চমৎকার; যেমন জল-হাওয়া, তেমনি তার প্রাকৃতিক দৃশ্য।

কয়েকটি নতুন বন্ধু জুটে গেল। এখানে দশ-বারো ঘর বাঙালী আছেন, সকলেই ভারি মিশুক, নতুন লোক পেলে খুব খুশি হন। একটি ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম প্রমথ রায়। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি নরম স্বভাব। ভাল সরকারী চাকরি করে; মনটা অতি আধুনিক হলেও উগ্র নয়। প্রায় রোজই বিকেলবেলা টেনিস খেলে ফেরবার পথে আমাদের বাসায় ঢুঁ মারত। ছোকরা অবিবাহিত; একলা থাকে। তাই আমাদের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করে দু'এক পেয়ালা চা কিংবা কক্‌টেল সেবন করে সন্ধ্যের পর বাসায় ফিরত।

একদিন কথায় কথায় আমার শ্যালক প্রেতযোনির কথা তুললেন; বললেন, 'ওহে প্রমথ, তোমরা তো ভূত-প্রেত কিছুই মানো না। আমাদের বরদা একজন পাকা ভূতজ্ঞানী ব্যক্তি। ভূতের প্রমাণ যদি চাও, ওর কাছে পাবে।'

প্রমথ হেসে উঠল; বলল, 'আপনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এই সব বিশ্বাস করেন?'

কথাটা সে হালকাভাবে বললেও গায়ে লাগল; বললুম, 'শিক্ষিত লোকেরা এমন অনেক জিনিস বিশ্বাস করেন যা বিশ্বাস করতে অশিক্ষিত লোক লজ্জা পাবে।'

'যথা?'

'যথা ফ্রয়েডিয়ান্ সাইকো অ্যানালিসিস্ কিংবা পাব্‌লভের বিহেভিয়ারিজম।'

প্রমথ হাসতে লাগল। সে বুদ্ধিমান ছেলে তাই এঁড়ে তর্ক করল না। ভূতের কথা ঐখানেই চাপা পড়ল।

আমার পাহাড়ে আসার পর দু'হপ্তা কেটে গেল। দিব্যি আরামে আছি; ওজন বেড়ে যাচ্ছে। মনে চিন্তা নেই; গায়ে ঘাম নেই; বিছানায় ছারপোকা নেই, খাওয়া ঘুমোনো আর ঘুরে বেড়ানো এই তিন কাজে দিবারাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতে পারি না। জীবনে এরকম সুসময় ক্কচিৎ এসে পড়ে; কিন্তু বেশি দিন থাকে না।

প্রমথ একদিন আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করল। আমি আর শ্যালক যথাসময়ে তার বাসায় উপস্থিত হলুম। আর কেউ নিমন্ত্রিত হয়নি জানতুম; কিন্তু গিয়ে দেখি একটি তরুণী রয়েছেন। এঁকে আগে কখনও দেখিনি। সুন্দরী তন্বী দীর্ঘাঙ্গী, মুখে একটু বিষাদের ছায়া। সাজসজ্জায় প্রসাধনে বর্ণবাহুল্য নেই, কিন্তু যত্ন আছে। চেহারা দেখে বয়স কুড়ি একুশ মনে হয়, হয়তো দু'এক বছর বেশি হতে পারে।

শ্যালক খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে সম্ভাষণ করলেন, 'এই যে, মিসেস দাস, কি সৌভাগ্য! আপনার সঙ্গে দেখা হবে তা আশা করিনি—'

তরুণী হাসিমুখে প্রতিনমস্কার করে বললেন, 'সাপ্তাহিক শপিং করতে শহরে এসেছিলুম। রাস্তায় প্রমথবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, উনি ধরে নিয়ে এলেন।'

প্রমথ তখন মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। ইশারায় বুঝলুম, মিসেস দাস বিধবা। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে 'হর-জটা' নামে একটি উঁচু গিরিশিখর আছে; খুব ছোট জায়গা, মাত্র দশ-বারোটি বাংলো আছে। সেইখানে মিসেস দাস থাকেন। হর-জটা থেকে শহরের পথ সুগম নয়, মাঝে একটা উপত্যকা পড়ে; তাই, সেখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা মাঝে মাঝে শহরে এসে আবশ্যক মতো কেনাকাটা করে নিয়ে যান।

চা-কেক সহযোগে গল্প চলতে লাগল। লক্ষ্য করলুম, মিসেস দাস একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে আধুনিকা অন্যদিকে তেমনি শান্ত আর সংযত। তাঁর সুন্দর চেহারার একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, অথচ তাঁর সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা করাও চলে না। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় যোগ দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রগল্‌ভতা করবার সাহস কারুর নেই। তাঁর সুকুমারত্বই যেন বর্ম।

প্রমথকেও সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলুম। এতদিন বুঝতে পারিনি যে, তার জীবনে প্রেমঘটিত কোনও জটিলতা আছে; এখন দেখলুম বেচারা একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কম্পাসের কাঁটা অন্য সময় ঠিক থাকে;

কিন্তু চুম্বকের কাছে এলে একেবারে অধীর অসংবৃত হয়ে পড়ে; প্রমথর অবস্থাও সেই রকম। তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করে দিচ্ছে যে ঐ মেয়েটিকে সে ভালবাসে; লোকলজ্জার খাতিরেও মনের অবস্থা লুকোবার ক্ষমতা তার নেই।

অথচ মিসেস দাস বিধবা, হোন প্রগতিশীলা আধুনিকা— তবু হিন্দু বিধবা।

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। পাহাড়ের হিমেল হাওয়ায় এই যে বিচিত্র রোমান্স অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, এর পরিণতি কোথায়?

চায়ের পর্ব শেষ হতেই মিসেস দাস উঠে পড়লেন, দিনের আলো থাকতে থাকতে তাঁকে হর-জটায় ফিরতে হবে। তিনি আমাদের তিনজনকে দৃষ্টির আমন্ত্রণে টেনে নিয়ে বললেন, 'একদিন হর-জটায় আসুন না। একটু নিরিবিলি এই যা, নইলে খুব সুন্দর জায়গা। এমন সূর্যোদয় পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। আসবেন।'

আমরা গলার মধ্যে ধন্যবাদসূচক আওয়াজ করলুম। তিনি চলে গেলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে আমরাও উঠলুম। অতিথি-সৎকারের যথোচিত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রমথ ক্রমাগত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে দেখে তাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে হল না।

বাড়ি ফেরার পথে শ্যালককে জিগ্যেস করলুম, 'কি হে, ব্যাপার কি? ভেতরে কিছু কথা আছে নাকি?'

শ্যালক আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন, 'তুমিও লক্ষ্য করেছ দেখছি। আমি গুজব শুনেছিলুম, আজ চোখে দেখলুম। প্রমথ সাবিত্রীকে বিয়ে করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে।'

'ওঁর নাম বুঝি সাবিত্রী? তা উনি কি বলেন?'

'যতদূর শুনেছি, সাবিত্রীর মত নেই।'

'মত নেই কেন? হিন্দু সংস্কার? না অন্য কিছু?'

'তা ভাই ঠিক বলতে পারি না। কতকটা সংস্কার হতে পারে, আবার কতকটা মৃত স্বামীর প্রতি ভালবাসাও হতে পারে।'

জিগ্যেস করলুম, 'স্বামী কতদিন মারা গেছেন?'

শ্যালক বললেন, 'তা প্রায় বছর দুই হতে চলল। ভদ্রলোক রেলের বড় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন; হঠাৎ রেলে কাটা পড়লেন।'

'তোমার সঙ্গে পরিচয় ছিল?'

'সামান্য। খুব রাশভারি জবরদস্ত লোক, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বছর হয়েছিল। মাত্র বছরখানেক সাবিত্রীকে বিয়ে করেছিলেন।'

'মিসেস দাস হর-জটায় থাকেন কেন?'

'বাড়িটা দাসের ছিল, সাবিত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তাছাড়া দাস 'অন্ ডিউটি' মারা গিয়েছিলেন তাই রেলওয়ে থেকে তাঁর বিধবা একটা মাসহারা পায়। তাইতেই চলে।'

'সাবিত্রী কেমন মেয়ে তোমার মনে হয়?'

'খুব ভাল; অমন মেয়ে দেখা যায় না। এই বয়সে একলা থাকে, কিন্তু কেউ কখনও ওর নামে একটা কথা বলতে পারেনি।'

'বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?'

'এ রকম ক্ষেত্রে হওয়াই ভাল। সারা জীবন অতীতের পানে চেয়ে কাটিয়ে দেওয়ার কোনও মানে হয় না। ছেলেপুলে থাকলেও বা কথা ছিল। কিন্তু সাবিত্রী বোধ হয় বিয়ে করবে না।'

এই ঘটনার পর আরও দিন দশেক কেটে গেল। প্রমথ আর আসেনি। আমরা তার মনের কথা আঁচ করেছি বলেই বোধ হয় সে আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে।

আমারও স্বর্গ হতে বিদায় নেবার সময় হল। আমি পাততাড়ি গুটোচ্ছি এমন সময় একদিন প্রমথ এল। একটু লজ্জা লজ্জা ভাব। দু'চারটে কথার পর বলল, 'মিসেস দাস চিঠি লিখে আমাদের তিনজনকে হর-জটায় নেমন্তন্ন করেছেন, সূর্যোদয় দেখবার জন্যে। যাবেন?'

আমার কোনই আপত্তি ছিল না। কিন্তু শ্যালক আপত্তি তুললেন— 'সূর্যোদয় দেখতে হলে তার আগের রাত্রে গিয়ে হর-জটায় থাকতে হয়, কিংবা রাত্রি দুটোর সময় এখান থেকে বেরুতে হয়। সে কি সুবিধে হবে?'

প্রমথ পকেট থেকে চিঠি বার করে বলল, 'তার চিঠি পড়ে দেখুন, অসুবিধে বোধহয় হবে না।'

চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রীতি নমস্কারান্তে নিবেদন, প্রমথবাবু, দেখছি আমার সেদিনের নিমন্ত্রণ আপনারা মুখের কথা মনে করেছেন। আমি কিন্তু সত্যিই আপনাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। আসুন না। রাত্রে আমার বাড়িতে থেকে সকালে সূর্যোদয় দেখবেন। কষ্ট হবে না; আমার বাড়িতে তিনজন অতিথিকে স্থান দেবার মতো জায়গা আছে।

কবে আসবেন জানাবেন। কিংবা না জানিয়ে যদি এসে উপস্থিত হন তাহলেও খুশি হব। আশাকরি ভাল আছেন।

নিবেদিকা— সাবিত্রী দাস

এর পর আর শ্যালকের আপত্তি রইল না। প্রমথ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আজ শনিবার আছে, চলুন না আজই যাওয়া যাক। পাঁচটার সময় বেরুলে সন্ধ্যের আগেই পৌঁছুনো যাবে।'

তাই ঠিক করে বেরিয়ে পড়া গেল।

হর-জটা শিখরটি উপত্যকা থেকে দেখা যায়, সত্যি হর-জটা নাম সার্থক। যেন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের জটা পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠেছে; তার খাঁজে খাঁজে শাদা বাংলোগুলি ধুতরা ফুলের মতো ফুটে আছে। অপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার রাস্তাটি অপূর্ব নয়; তিন মাইল পথ হাঁটতে পাক্কা আড়াই ঘণ্টা লাগল।

আমরা যখন মিসেস দাসের বাংলোর সামনে গিয়ে হাজির হলুম তখন দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে; তবু হর-জটার কুটিল কুণ্ডলীতে সূর্যাস্তের আবীর লেগে আছে। মিসেস দাস বাড়ির সামনের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে ছিলেন, উৎফুল্ল কলকাকলি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের দেখে তাঁর এই অকৃত্রিম আনন্দ বড় ভাল লাগল।

শোনা যায়, আসন্ন দুর্ঘটনা সামনে কালো ছায়া ফেলে তার আগমনবার্তা জানিয়ে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন দুর্ঘটনার বিন্দুমাত্র পূর্বাভাস পাইনি। সেই পার্বত্য সন্ধ্যার গৈরিক আলো— মনে হয়েছিল, এ আলো নয়, অপরূপ এক দৈবী প্রসন্নতা। তার আড়ালে যে লেশমাত্র অশুভ লুকিয়ে থাকতে পারে তা কল্পনা করাও যায় না। আমার বোধ হয় প্রমথও কিছু আভাস পায়নি।

মিসেস দাস আমাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। গরম জলে মুখ-হাত ধুয়ে ড্রয়িং-রুমে এসে দেখি চা তৈরি। বাড়িতে পুরুষ চাকর নেই; দু'টি পাহাড়ী মেয়েমানুষ কাজকর্ম রান্নাবান্না করে এবং রাত্রে থাকে।

হর-জটায় এখনও বিদ্যুৎবাতি এসে পৌঁছয়নি। কেরোসিন ল্যাম্পের মোলায়েম আলোয় চা খেতে বসলুম। মিসেস দাস চাকরানিদের সাহায্যে আমাদের পরিচর্যা করতে লাগলেন।

ড্রয়িং-রুমের দেয়ালে একটা এন্‌লার্জ করা ফটোগ্রাফ টাঙানো ছিল। দূর থেকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলুম না; চা খাওয়া শেষ হলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইনিই অকালমৃত মিস্টার দাস সন্দেহ নেই। ভাল করে দেখলুম। চেহারা সুন্দর বলা চলে না, কিন্তু একটা দৃঢ়তা আছে; চওড়া চিবুকের মাঝখানে খাঁজ, চোখের দৃষ্টি একটু কড়া। ফটো তোলবার সময় ঠোঁটের কোণে যে হাসি আনার নিয়ম আছে সেটি অবশ্য রয়েছে, কিন্তু হাসি দিয়ে চরিত্রের দৃঢ় বলিষ্ঠতা ঢাকা পড়েনি।

মনে মনে এই মুখখানার সঙ্গে প্রমথর নরম মিষ্টি মুখের তুলনা করছি এমন সময় পাশে মৃদুকণ্ঠের

আওয়াজ হল— আমার স্বামী।

দেখলুম মিসেস দাস আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপর প্রমথও এসে দাঁড়াল। মিসেস দাস কিছুক্ষণ ফটোর দিকে তাকিয়ে থেকে চকিতে প্রমথর পানে চাইলেন। তাঁর মুখখানি শান্ত, মুখ দেখে মনের কথা ধরা যায় না; তবু সন্দেহ হল তিনিও আমারই মতো ফটোর সঙ্গে প্রমথর মুখ তুলনা করলেন।

আমরা আবার ফিরে এসে বসলুম।

মেয়েমানুষের মন বোঝা সহজ নয়; বিশেষত মিসেস দাসের মতো মেয়ের মন। কবি বলেছেন, রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন। আমি ভাবতে লাগলাম, ইনি প্রমথকে বিয়ে করতে অস্বীকার করছেন একথা নিশ্চয় সত্যি, কিন্তু প্রমথ সম্বন্ধে তাঁর মনে কি কোনও দুর্বলতা নেই? এই যে আজ তিনি আমার মতো একজন অপরিচিত লোককে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন এটা কি শুধুই লৌকিক সহৃদয়তা? না এর অন্তরালে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে কাছে পাবার অভিপ্রায় লুকিয়ে ছিল?

প্রমথর অবস্থা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সেদিন যেমন দেখেছিলুম আজও ঠিক তাই। চুম্বকাবিষ্ট কম্পাসের কাঁটা, অন্য কোনও দিকেই তার লক্ষ্য নেই।

ক্রমে রাত্রি হল। উত্তর দিক থেকে একটা খুব ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে মাথার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দে বইতে লাগল।

রান্নাবান্না হতে স্বভাবতই একটু দেরি হল। আমরা রাত্রির খাওয়া শেষ করে যখন উঠলুম তখন প্রায় এগারোটা বাজে। মিসেস দাস বললেন, ‘আপনারা শুয়ে পড়ুন গিয়ে। সকাল সাড়ে তিনটের আগে কিন্তু উঠতে হবে, নইলে সূর্যোদয়ের সব সৌন্দর্য দেখতে পাবেন না।’

ভাবনা হল, এখন শুতে গেলে সাড়ে তিনটের সময় ঘুম ভাঙবে কি? যদি না ভাঙে আজকের অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। জিগ্যেস করলুম, ‘অ্যালার্ম ঘড়ি আছে কি?’

মিসেস দাস বললেন, ‘না। কিন্তু সেজন্য ভাববেন না; আমি ঠিক সময়ে আপনাদের তুলে দেব।’

শ্যালক বললেন, ‘কিন্তু আপনার ঘুম যে ভাঙবে তার ঠিক কি?’

মিসেস দাস একটু হেসে বললেন, ‘আমি ঘুমোবো না, এই ক’ঘন্টা বই পড়ে কাটিয়ে দেব। আমার অভ্যেস আছে।’

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। আমরা ঘুমোব আর ভদ্রমহিলা সারারাত জেগে থাকবেন?

হঠাৎ প্রমথ তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘তাহলে আমিও জেগে থাকি।’ আমাদের দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনারা শুয়ে পড়ুন।’

আমার মন কিন্তু এ প্রস্তাবে সায় দিল না। আমরা দু’জন বয়স্থ ব্যক্তি ঘুমোব, আর এই দুটি যুবক যুবতী সারারাত্রি একত্র থাকবে—

শ্যালক সমস্যা ভঞ্জন করে দিয়ে বললেন, ‘তবে আমরা সকলেই জেগে থাকি না কেন? আমার আবার নতুন জায়গায় সহজে ঘুম আসে না; এমনিতেই হয়তো চোখ চেয়ে রাত কেটে যাবে।’

আমি বললাম, ‘আমারও ঠিক তাই।’

মিসেস দাস আপত্তি করলেন, কিন্তু আমরা শুনলুম না। ড্রয়িং-রুমে বেশ জুত করে বসা গেল। চার ঘন্টা দেখতে দেখতে কেটে যাবে। শ্যালক প্রস্তাব করলেন, তাস খেলা যাক; কিন্তু বাড়িতে তাস ছিল না বলে তা আর হল না।

প্রথমে খুব উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গল্প চলেছে। মিসেস দাস একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে শুয়েছেন; শ্যালক সোফায় লম্বা হয়ে সিগার টানছেন; আমিও একটা গদি-মোড়া চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বেশ আরাম অনুভব করছি; কেবল প্রমথ অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা ওটা নাড়ছে, আলোটা কখনও কমিয়ে দিচ্ছে কখনও বাড়িয়ে দিচ্ছে—

মিসেস দাসের শান্ত চোখ তাকে অনুসরণ করছে।

বারোটা বাজল।

শ্যালক উঠে বসলেন; সিগারের দগ্ধ প্রান্তটুকু এ্যাশ্-ট্রের ওপর রেখে বললেন, 'আচ্ছা মিসেস দাস, আপনি এই বাড়িতে একলা থাকেন, আপনার ভয় করে না?'

মিসেস দাস একটু ভুরু তুলে তাকালেন, 'ভয়? কিসের ভয়?'

বাড়ির মাথার ওপর ঠাণ্ডা বাতাসটা সাঁই সাঁই শব্দ করে চলেছে; আমি একটা হাই চাপা দিয়ে বললুম, 'মনে করুন ভূতের ভয়।'

প্রমথ মিস্টার দাসের ফটোগ্রাফের সামনে দাঁড়িয়ে বিরাগ-ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, আমার কথা শুনে চকিতে ফিরে চাইল; তারপর আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। বিদ্রূপ করে বলল, 'ভূতের ভয়! সে আবার কি? ভূত বলে কিছু আছে নাকি? বরদাবাবুর যত কুসংস্কার।'

মিসেস দাসকে জিগ্যেস করলুম, 'আপনারও কি তাই মত?'

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'পরজন্ম আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ভূত—কি জানি—'

প্রমথ জোর গলায় বলে উঠল, 'ভূত নেই। ভূত শব্দের যে অর্থই ধর, ভূত থাকতে পারে না। আছে শুধু বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। এই কি যথেষ্ট নয়?'

তার মুখের পানে তাকালুম; মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। প্রমথ নরম স্বভাবের মানুষ, তাকে এত বিচলিত কখনও দেখিনি। যেন সাবিত্রীকে একটা কথা বলবার জন্যে তার প্রাণে প্রবল আবেগ উপস্থিত হয়েছে, অথচ আমাদের সামনে বলতে পারছে না।

শ্যালকও ব্যাপারটা বুঝেছিলেন; তিনি বললেন, 'বর্তমান আর ভবিষ্যৎ যদি থাকে তবে ভূতও থাকতে বাধ্য। আমাদের সকলেরই অতীত জীবন আছে— সেইটেই ভূত। তোমারও ভূত আছে প্রমথ, তাকে এড়ানো সহজ নয়। তবে মরা মানুষের সঙ্গে আমাদের তফাত এই যে, মরা মানুষের সবটাই ভূত; আমাদের কিছুটা বর্তমান আর ভবিষ্যৎ আছে।'

শ্যালক যে ভূত কথাটার দু'রকম অর্থ নিয়ে লোফালুফি করছেন, প্রমথ তা বুঝল না; তার তখন রোখ চেপে গেছে। সে হাত নেড়ে বলল, 'ও সব হেঁয়ালি আমি বুঝি না। মৃত্যুর পর আত্মা যে বেঁচে থাকে তা প্রমাণ করতে পারেন?'

শ্যালক হেসে বললেন, 'আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারি না। প্রেতযোনি সম্বন্ধে বরদা খবর রাখে, ওকে জিগ্যেস কর।'

আমি বললুম, 'দেখুন প্রমথবাবু, যে লোক জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো যায় না; আপনিও যদি বিশ্বাস করবেন না বলে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বিশ্বাস করানো কারুর সাধ্য নয়! তবে এইটুকু বলতে পারি, অনেক বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাবান লোক প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করেছেন; যথা—উইলিয়ম ক্রুকস, অলিভার লজ, কোনান ডয়েল—'

প্রমথ মুখ শক্ত করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না। যদি প্রমাণ করতে পারেন, প্রমাণ করুন, নইলে কেবল কতকগুলো বিলিতি নাম আউড়ে আমাকে কাবু করতে পারবেন না।'

একটু রাগ হল। বললুম, 'বেশ। বিশ্বাস করা-না-করা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? মিসেস দাস, আসুন প্ল্যাঞ্চেট করা যাক।'

তিনি একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'প্ল্যাঞ্চেট। ভূত নামাবেন?'

বললুম, 'প্রমথবাবুর অবিশ্বাস ভাঙবার আর তো কোনও উপায় দেখি না। তবে আপনার যদি ভয় করে তাহলে কাজ নেই।'

তিনি বললেন, 'না, ভয় করবে না।' চকিতে একবার প্রমথর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ তো, করুন

না। আর কিছু না হোক সময় তো কাটবে। কি চাই বলুন।'

বললুম, 'বেশি কিছু নয়, শুধু একটা তেপায়া টেবিল হলেই চলবে।'

ছোট একটা তেপায়া টেবিল ঘরেই ছিল। আমি তখন দু'চার কথায় প্ল্যাঞ্চেটের প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিলুম। তারপর আলোটা কমিয়ে দিয়ে চারজনে টেবিল ঘিরে বসা গেল।

শ্যালক প্রশ্ন করলেন, 'কাকে ডাকা হবে?'

আমি বললুম, 'যাকে ইচ্ছে ডাকা যেতে পারে। তবে এমন লোক হওয়া চাই যাকে আমরা সবাই চিনি। অন্তত যার চেহারা আমাদের সকলের জানা আছে।'

আমরা যেখানে বসেছিলুম তার অল্প দূরেই মিস্টার দাসের ছবি দেয়ালে টাঙানো ছিল। প্রমথ বসেছিল ছবির দিকে পিঠ করে, আর মিসেস দাস ছিলেন তার সুমুখে। মিসেস দাস ছবির পানে চোখ তুললেন; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখও সেই দিকে ফিরল। অল্প আলোতে ছবিটা সমস্ত দেখা যাচ্ছে না, কেবল মুখখানা স্পষ্ট হয়ে আছে।

মিসেস দাস ছবি থেকে চোখ নামিয়ে আমার পানে চাইলেন। তাঁর চোখের প্রশ্ন বুঝে আমি বললুম, 'হ্যাঁ, ওঁকেই ডাকা যাক। আমি যদিও ওঁকে দেখিনি তবু ছবিতেই কাজ চলবে। সকলে চোখ বুজে মনে মনে ওঁর কথা ভাবুন।'

আঙুলে আঙুলে ঠেকিয়ে টেবিলের ওপর হাত রাখা হল। তারপর আমরা চোখ বুজে মিস্টার দাসের ধ্যান শুরু করে দিলুম।

প্ল্যাঞ্চেটের টেবিলে যখন প্রেতযোনির আবির্ভাব হয় তখন টেবিলটা নড়তে থাকে; মনে হয় টেবিলের মরা কাঠে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে একটা স্পন্দন বইতে থাকে। আমরা প্রায় দশ মিনিট বসে রইলুম, কিন্তু টেবিল নড়ল না, তার মধ্যে জীবন সঞ্চার হল না। তখন চোখ খুলে আর সকলের পানে তাকালুম।

প্রমথকে দেখেই বুঝলুম প্রেতের আবির্ভাব হয়েছে; টেবিলের ওপর নয়, মানুষের ওপর। এমন মাঝে মাঝে হয়, তার মুখটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট দুটো নড়ছে; মুখের চেহারা কেমন যেন বদলে গেছে।

প্রেতের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলুম, 'কেউ এসেছেন কি?'

প্রমথ আস্তে আস্তে মুখ তুলল; তারপর টকটকে রাঙা চোখ খুলে মিসেস দাসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

আমি হাত বাড়িয়ে আলোটা উজ্জ্বল করে দিলুম। এতক্ষণে প্রমথর মুখ ভাল করে দেখা গেল। তার মুখ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলুম। কঠিন হিংস্র মুখ— ক্রূর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। চোখের দৃষ্টি প্রমথর দৃষ্টি নয়, যেন তার চোখের ভিতর দিয়ে অন্য একজন উঁকি মারছে।

মিসেস দাস সম্মোহিতের মতো তার পানে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ প্রমথ উগ্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'সাবিত্রী!'

তার গলার আওয়াজ পর্যন্ত বদলে গেছে। মিসেস দাসের চোখ বিস্ফারিত হতে লাগল; তাঁর ঠোঁট দুটি খুলে গেল। তারপর তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'অ্যাঁ! তুমি, তুমি!' এই বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

তারপর যা কাণ্ড বাধল তা বর্ণনা করা যায় না। প্রমথ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো; তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। আমি তাকে ধরতে গেলুম, কিন্তু আমার সাধ্য কি তাকে ধরে রাখি। তার গায়ে অসুরের শক্তি। আমাকে এক ঝটকায় দূরে সরিয়ে দিয়ে সে সাবিত্রীর অজ্ঞান দেহটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাকে দু'হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে গজরাতে লাগল, 'তুমি আবার বিয়ে করতে চাও? দেব না— দেব না— তুমি আমার —'

ভেবে দ্যাখো, প্রমথর মুখ দিয়ে এই কথাগুলো বেরুচ্ছে! কিন্তু আমাদের তখন ভাববার সময় নেই; আমি আর শ্যালক দু'জনে মিলে টেনে প্রমথকে আলাদা করলুম। ইতিমধ্যে পাহাড়ী চাকরানি দুটো চেঁচামেচি শুনে

এসে পড়েছিল; তারা সাবিত্রীকে তুলে নিয়ে কৌচের ওপর শুইয়ে দিল। আমরা প্রমথকে টেনে নিয়ে চললুম স্নানঘরের দিকে; সেখানে তাকে মেঝেয় ফেলে মাথায় বালতি বালতি জল ঢালতে লাগলুম আর চিৎকার করে বলতে লাগলুম— 'আপনি চলে যান— চলে যান—'

'না, যাব না— সাবিত্রীকে বিয়ে করতে দেব না—' দাঁত ঘষে ঘষে প্রমথ বলতে লাগল। আমরা জল ঢালতে লাগলুম। ক্রমে তার গলার আওয়াজ জড়িয়ে এল; হাত-পা ছোঁড়াও বন্ধ হল।

আধঘন্টা পরে দু'জনে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় শুইয়ে দিলুম। তখন তার গায়ে আর শক্তি নেই, তবু বিজ বিজ করে বকছে— 'দেব না— দেব না—'

শ্যালককে তার কাছে বসিয়ে ড্রয়িং-রুমে গেলুম। দেখি মিসেস দাসের জ্ঞান হয়েছে। আমাকে দেখে তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, 'এ কী হল? বরদাবাবু, এ কী হল?'

মেয়েদের মনের অন্তরতম কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তাদের লজ্জা আর ভয়ের অন্ত থাকে না, কান্নাই তখন তাদের একমাত্র আবরণ। আমি মিসেস দাসের পাশে বসে তাঁকে যথাসাধ্য ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলুম। তারপর চাকরানিদের বললুম, 'এক পেয়ালা কড়া চা শিগ্‌গির তৈরি করে নিয়ে এসো।'

সেদিন সূর্যোদয় দেখা মাথায় উঠল। দুটি ঘরে দুটি রুগীর পরিচর্যা করতেই বেলা সাতটা বেজে গেল।

যা হোক, মিসেস দাস তো সামলে উঠলেন, কিন্তু প্রমথ সেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, কিছুতেই তার ঘুম ভাঙে না। জোর করে ঘুম ভাঙাতেও সাহস হল না, আবার হয়তো বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড আরম্ভ করে দেবে। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের আজ ফিরে যেতেই হবে, নইলে অনেক হাঙ্গামা।

বেলা একটা পর্যন্ত যখন ঘুম ভাঙল না, তখন আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম। ভাগ্যক্রমে একজন বৃদ্ধ ডাক্তার হর-জটায় বাস করেন, তাঁকে ডাকা হল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, 'বুকে একটু ঠাণ্ডা বসেছে, বিশেষ কিছু নয়; কিন্তু আজ এঁর বিছানা থেকে ওঠা চলবে না।'

আমরা কাতর চক্ষে মিসেস দাসের পানে চাইলুম। তিনি এতক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন, বললেন, 'প্রমথবাবু আজ এখানেই থাকুন। আপনারা যদি নিতান্তই না থাকতে পারেন—'

শ্যালক অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'দেখুন, যাওয়া খুবই দরকার কিন্তু আমরা না থাকলে আপনার যদি কোনও লজ্জার কারণ হয়—'

মিসেস দাস বললেন, 'সেজন্য ভাববেন না।'

বৃদ্ধ ডাক্তার আমাদের কথা শুনছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, 'ভাবনার কি আছে; আমি তো কাছেই থাকি, আমি না হয় রাত্রে এসে সাবিত্রী মা'র বাড়িতে থাকব। দরকার হলে আমার স্ত্রী এসে থাকতে পারেন। আপনারা ফিরে যান।'

বৃদ্ধ ডাক্তারটি মরমী লোক; অযথা প্রশ্ন করেন না। আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রমথ সম্বন্ধে চিন্তার কারণ নেই; ঘুম ভাঙলেই সে সহজ মানুষ হয়ে পড়বে।

বেরুবার সময় মিসেস দাস আমাদের একটু আড়ালে বললেন, 'কাল রাত্রির ঘটনা নিয়ে কোনও আলোচনা না হলেই ভাল হয়।'

আমরা আশ্বাস দিলুম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

তারপর হর-জটা থেকে নেমে এলুম।

পরদিন সন্ধ্যের সময় খবর পেলুম প্রমথ ফিরে এসেছে। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল না।

এদিকে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, দু'এক দিনের মধ্যে বেরুতে হবে। ভাবলুম, যাই, আমিই প্রমথর সঙ্গে দেখা করে আসি। এইসব ব্যাপারের পর তার হয়তো আসতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

পরদিন সকালবেলা বেড়িয়ে ফেরার পথে তার বাসায় গেলুম। সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই প্রমথ এসে দোর খুলে দাঁড়ালো। তার চেহারায় কী একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়েছে। সে কট্‌মট্ করে কিছুক্ষণ আমার

পানে চেয়ে রইল, তারপর দড়াম্ করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

প্রমথর সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। তার পরদিনই পাহাড় থেকে নেমে এলুম।

এই পর্যন্ত বলিয়া বরদা থামিল। ইতিমধ্যে চাঁদ অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। ভাঙের নেশার জন্যই হোক বা বরদার গল্প শুনিয়াই হোক, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

পৃথ্বী প্রশ্ন করিল, 'তোমার গল্প এইখানেই শেষ? না আর কিছু আছে?'

বরদা একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'আর একটু আছে। মাসখানেক পরে শ্যালকের কাছ থেকে এক চিঠি পেলুম। তিনি এক আশ্চর্য খবর দিয়েছেন; সাবিত্রীর সঙ্গে প্রমথর সিভিল ম্যারেজ হয়ে গেছে। আমার ধারণা হয়েছিল, যে ব্যাপার ঘটেছে, তারপর তাদের বিয়ে অসম্ভব। প্রমথ যে শেষকালে আমার সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার করেছিল, সেটাও আমি তার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া মনে করেছিলুম। কিন্তু দেখলুম, আমার হিসেব আগাগোড়াই ভুল।

'শ্যালক আর একটি খবর দিয়েছেন, সেটি আরও অদ্ভুত। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রমথর চেহারা নাকি অনেকখানি বদলে গেছে; সকলেই বলছে, তার চেহারা ক্রমশ গতাসু মিস্টার দাসের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন কি তার চিবুকের মাঝখানে একটা খাঁজ দেখা দিয়েছে—'

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া বরদা বলিল, 'এতক্ষণ আমি সরল ভাবে ঘটনাটি বলে গেছি, নিজের টীকা-টিপ্পনী কিছু দিইনি। এখন তোমরাই এর টীকা-টিপ্পনী কর— এটা কি, মিস্টার দাসের প্রেতাত্মা কি প্রমথকে তার দেহ থেকে উৎখাত করে নিজে কায়েমী হয়ে বসেছেন এবং নিজের বিধবাকে আবার বিয়ে করেছেন? কিংবা—আর কি হতে পারে?'

আমরা কেহই উত্তর দিলাম না। বরদা তখন কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'যদি তাই হয় তাহলে প্রমথর আত্মাটার কী হল? কোথায় গেল সে?'

অকস্মাৎ আকাশে একটা দীর্ঘ আর্ত কর্কশ চিৎকারধ্বনি হইল। আমরা চমকিয়া ঊর্ধ্বে চাহিলাম; দেখিলাম, বাদুড়ের মতো একটা পাখি চাঁদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে— কালো ত্রিকোণ পাখা মেলিয়া পাখিটা ক্রমে দূরে চলিয়া গেল।

কণ্টকিত দেহে আমরা চাহিয়া রহিলাম।

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

ভূত-ভবিষ্যৎ

গভীর রাত্রে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া উপন্যাসখানা লিখিতেছিলাম। টেবিলের এক কোণে মোমবাতিটা গলদশ্রু হইয়া জ্বলিতেছিল। হঠাৎ চোখ তুলিয়া দেখি প্রেত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলম রাখিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলাম, 'আমি পারব না।'

প্রেত কাতর চক্ষে আমার পানে চাহিয়া রহিল, মিনতিভরা স্বরে বলিল, 'আপনি দয়া না করলে আমার আর উপায় নেই। মেয়েটা নষ্ট হয়ে যাবে। পাড়ার ছোঁড়াগুলো তার পেছনে লেগেছে।'

প্রেতের কণ্ঠস্বর ঘষা-ঘষা; গ্রামোফোন রেকর্ডে গান শুরু হইবার আগে যেরূপ শব্দ হয় অনেকটা সেইরকম। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'তা আমি কি করব? আপনি অন্য কারুর কাছে যান না।'

প্রেত বলিল, 'আর কার কাছে যাব? সবাই চোর। আপনি দয়া করুন।'

ভূতের কথায় মনটা একটু নরম হইল। সত্য বটে আমি দেনার দায়ে লুকাইয়া আছি, কিন্তু তবু চুরি যে করিব না— এ বিশ্বাস ভূতেরও আছে। বলিলাম, 'আচ্ছা, আপনি ঐ মেয়েটাকে কিংবা তার বাপকে আপনার কথা বললেই পারেন, তারা নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে। আমাকে কেন?'

প্রেত একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিল; মোমবাতির শিখা একটু নড়িয়া উঠিল। সে বলিল, 'চেষ্টা কি করিনি? আমাকে দেখেই ভয়ে হাউমাউ করে উঠল। তারপর বাড়িতে রোজা ডেকে ঝাড়িয়েছে। ওদিকে আমার আর যাবার উপায় নেই।'

রাত্রি প্রায় বারোটা। আমি ফুৎকারে বাতি নিভাইয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। প্রেত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তক্তপোশের পাশে বসিল, করুণস্বরে বলিল, 'দয়া করুন। আপনার কল্যাণ হবে।'

বড় বিপদে পড়িয়াছি।

আমি একজন সাহিত্যিক। বাজারে নাম হইয়াছে; কিন্তু নাম হইলেই সাহিত্য-বাজারে টাকা হয় না। ফলে, একদিন যাঁহারা বন্ধু ছিলেন তাঁহারা মহাজন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; আমাকে দেখিলেই মুখ ভার করেন, কিংবা তাগাদা করেন।

বন্ধুত্বের দাক্ষিণ্য যখন একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল তখন স্থির করিলাম কলিকাতা হইতে অন্তত কিছু দিনের জন্য গা-ঢাকা দিব। ভাগ্যক্রমে একজন প্রকাশক একটি উপন্যাস লেখার বরাত দিলেন; কিছু দাদনও আদায় করিলাম। সেই দাদনের টাকা লইয়া কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছি এবং পশ্চিমবঙ্গের একটি শহরে জীর্ণ খোলার ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছি। উপন্যাস শেষ না হইলে ফিরিব না।

আমার খোলার ঘরের জানালা ভাঙা, খাপ্‌রার ছাউনিও নিরবচ্ছিন্ন নয়। আসবাবের মধ্যে কীটদষ্ট তক্তপোশ, নড়বড়ে টেবিল ও একটি টুল। যিনি ঘরটি ভাড়া দিয়াছেন তিনি পাশেই পাঁচিল-ঘেরা মস্ত বাড়িতে থাকেন, মহাজনী কারবার আছে। এ জগতে মহাজনী কারবার কিংবা পুস্তক-প্রকাশকের ব্যবসা না করিতে পারিলে বাঁচিয়া সুখ নাই। মহাজন নিকুঞ্জবাবুর চোখ দুটি বড় সন্দিগ্ধ: এক মাসের ভাড়া আগাম লইয়া থাকিতে দিয়াছেন। অল্প দূরে একটি সস্তা ভোজনালয় আছে, সেইখানেই আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছি।

প্রথম তিনদিন বেশ নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। উপন্যাস শুরু করিয়া দিয়াছি; খোলার ঘরে যে উপদেবতার যাতায়াত আছে তাহা জানিতে পারি নাই। চতুর্থ দিন রাত্রে আলো নিভাইয়া শয়ন করিলাম। আমার অভ্যাস,

বিছানায় শুইয়া একটি বিড়ি সেবন না করিলে নিদ্রা আসে না। দেশলাই জ্বালিতেই চোখে পড়িল কে একজন তক্তপোশের পাশে বসিয়া আমার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। দু'টা আগ্রহ-ভরা চোখ—

চমকিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটা মিলাইয়া গেল।

আবার দেশলাই জ্বালিলাম। কেহ নাই। ভাবিলাম ভুল দেখিয়াছি। অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিলে এমন হয়। চোখের ভ্রান্তি।

বিড়ি পান করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার স্নায়ু দুর্বল নয়; ভূতের ভয় করি না। ভূত থাকে থাক্, তাহাকে ভয় করিবার কোনও কারণ নাই; ভূতের চেয়ে মানুষকেই ভয় বেশি।

পরদিন সকালে রাত্রির কথা আর মনেই রহিল না। সারাদিন উপন্যাস লিখিলাম। উপন্যাসে প্রেমের প্রগতি দেখাইতেছি। আমার হিরো একেবারে নিম্নতম স্তর হইতে আরম্ভ করিয়াছে; এক মেথর-কন্যার প্রতি অবৈধভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে পৈশাচ বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। (পৈশাচ বিবাহের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে অভিধান দেখুন)। কাহিনী বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

তারপর রাত্রে যথারীতি তক্তপোশে শয়ন করিয়া বিড়ি সেবনপূর্বক ঘুমাইবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু ঘুমাইতে হইল না; হঠাৎ চট্‌কা ভাঙিয়া শুনিলাম, ঘষা-ঘষা গলায় কে বলিতেছে, 'ঘুমোলেন নাকি?'

অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না; কিন্তু মনে হইল যিনি প্রশ্ন করিলেন তিনি তক্তপোশের পাশে বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম, 'আপনি কে?'

উত্তর হইল, 'কি বলে পরিচয় দিই? যখন বেঁচে ছিলাম তখন নাম ছিল নন্দদুলাল নন্দী।'

বলিলাম, 'খাসা নাম! আপনি তাহলে প্রেত।'

প্রেত বলিল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না। আমার কোনও বদ্ মতলব নেই।'

আমি একটা হাই তুলিয়া বলিলাম, 'বদ্ মতলব থাকলেও আপনি আমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবেন না— আপনি তো হাওয়া। তবে আমি ভয় পেয়ে নিজে নিজের অনিষ্ট করতে পারি বটে।'

প্রেত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তা বটে।'

মনে পড়িল দেশলায়ের বাক্সটা মাথার শিয়রেই আছে। সেইদিকে হাত বাড়াইয়া বলিলাম, 'আমার সঙ্গে কিছু দরকার আছে কি?'

প্রেত বলিল, 'দরকার এমন কিছু নয়। কথা কইবার লোক পাই না— আপনি স্বজাতি— তাই—'

দেখিলাম প্রেতের অবস্থা আমারই মতো; সম্ভবত বন্ধুদের নিকট টাকা ধার লইয়াছে। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া দেশলাই জ্বালিতে উদ্যত হইয়াছি, সে বলিল, 'দেশলাই জ্বালবেন?'

'কেন, আপনার আপত্তি আছে?'

'হঠাৎ আলো জ্বাল্‌লে একটু অসুবিধে হয়।'

'তবে থাক্। কাল আপনার চেহারাটা লহমার জন্যে দেখেছিলাম, ভাল ঠাহর করতে পারিনি। তা থাক্।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ভাবিলাম, বেচারা কথা কহিবার লোক পায় না, স্বজাতি পাইয়া আলাপ করিতে আসিয়াছে। আমার কিছু বলা-কহা দরকার।

'আপনি কি কাছে-পিঠে কোথাও থাকেন?'

'পাশে পাঁচিল-ঘেরা বাগানে পুরনো নিমগাছ আছে, তাতেই থাকি।'

'তাই নাকি? আপনিও নিকুঞ্জবাবুর ভাড়াটে? কত ভাড়া দিতে হয়?'

প্রেত রসিকতা বুঝিল না, বলিল, 'বাড়ি বাগান একদিন আমারই ছিল। আমার প্রপৌত্রের কাছে নিকুঞ্জ পাল কিনেছে।'

'বটে! আপনার প্রপৌত্র বেঁচে আছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। তার অবস্থা বড় খারাপ হয়ে গেছে—'

'প্রপৌত্র! তাহলে আপনি আন্দাজ আশি-নব্বই বছর আগে ছিলেন?'

'সিপাহী যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম। মুচ্ছুদ্দির কাজে পয়সা করেছিলাম; ভেবেছিলাম সাতপুরুষ বসে খাবে — কিন্তু—'

প্রেতের কথা শেষ হইল না। আমি অভ্যাসবশত অন্যমনস্কভাবে একটি বিড়ি মুখে দিয়া ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিলাম। প্রেতের ত্রস্ত-চকিত চেহারাখানা ক্ষণেকের জন্য দেখা গেল; তারপর সে হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

আবার হয়তো আসিবে ভাবিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া বিড়ি টানিলাম। কিন্তু প্রেত আর আসিল না। তারপর কয়েক রাত্রি তাহার দেখা পাই নাই।

এদিকে আমার উপন্যাস দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। হিরো এখন এক রজক-কন্যার কৌমার্যহানির উদ্যোগ করিতেছে। এর পর আসিবে গোপ-কন্যা। স্থির করিয়াছি, এইভাবে ধাপে ধাপে তুলিয়া হিরোকে এক চিত্রাভিনেত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া ছাড়িব। উপন্যাসের নাম রাখিয়াছি— স্বর্গের সিঁড়ি।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর বাতি জ্বালিয়া লিখিতে বসিয়াছিলাম। খুব মন লাগিয়া গিয়াছিল, সময়ের হিসাব ছিল না। মনোজগতে নিরঙ্কুশ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া স্থুল জগতে ফিরিয়া আসিলাম। দেখি, টেবিলের অপর পারে দাঁড়াইয়া প্রেত মিটিমিটি হাসিতেছে।

আজ প্রেতকে প্রথম ভাল করিয়া দেখিলাম। সূক্ষ্ম মূর্তি; তবু চেহারার মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু নাই। গায়ে ফিতা-বাঁধা মেরজাই, মেটে-মেটে রং, সরু পাকানো গোঁফ; চোখ দুটি সজাগ ও প্রাণবন্ত। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন। নিতান্তই সেকালের বাঙালী চেহারা।

প্রেত বলিল, 'কি লেখেন এত?'

বলিলাম, 'উপন্যাস।'

'সে কাকে বলে? আমাদের সময় তো ছিল না।'

উপন্যাস কী তাহা বুঝাইয়া দিলে প্রেত সাগ্রহে বলিল, 'ও—গোলে বকাওলির গল্প—রূপকথা! তা বলুন না শুনি।'

সংক্ষেপে গল্পটা বলিলাম। শুনিয়া ভূত বলিল, 'ছি ছি।'

বলিলাম, 'ছি ছি বললে চলবে কেন? এ না হলে বই কাটে না। যা হোক, ক'দিন আসেননি যে?'

প্রেত বলিল, 'আপনি অদ্ভুত লোক। অন্য লোক ভূত দেখলে আঁৎকে ওঠে, আপনি গ্রাহ্যই করেন না।'

বলিলাম, 'সে-রাত্রে আচম্‌কা দেশলাই জ্বেলেছিলাম, তাই রাগ হয়েছিল বুঝি?'

'রাগ নয়— চম্‌কে গিয়েছিলাম, চম্‌কে গেলে আর শরীর ধারণ করা যায় না।'

খাতা টানিয়া লইয়া বলিলাম, 'আচ্ছা, আজ আপনি আসুন, পরিচ্ছেদটা শেষ করতে হবে। মাঝে মাঝে আসবেন, গল্পসল্প করা যাবে।'

'আচ্ছা।'— প্রেত চলিয়া গেল।

তারপর প্রেত প্রায় প্রতি রাত্রেই আসে; কিছুক্ষণ গল্পগুজব হয়, তারপর 'আসুন' বলিলেই হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। এ আমার শাপে বর হইয়াছে। এখানে আসিয়া মানুষ প্রতিবেশীর সহিত ইচ্ছা করিয়াই আলাপ পরিচয় করি নাই; তৎপরিবর্তে যাহা পাইয়াছি তাহা মোটেই অবাঞ্ছনীয় নয়। প্রেতের সঙ্গে যতটুকু ইচ্ছা মেলামেশা করি, সঙ্গ-পিপাসা মিটিলেই তাহাকে চলিয়া যাইতে বলি, সে চলিয়া যায়। মানুষ প্রতিবেশীকে এত সহজে তাড়ানো যাইত না। 'ঘণ্টা ধরে থাকেন তিনি সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায়।'

আমার ভূতই ভাল।

একদিন ভূত জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, আপনি সংসার করেছেন?'

বলিলাম, 'সংসার? মানে, বিয়ে? সর্বনাশ, "একলা শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে।"— ও কার্যটি আমাকে দিয়ে হবে না।'

ভূত একটু হাসিল। কিছুক্ষণ যেন অন্যমনস্ক থাকিয়া হঠাৎ বলিল, 'দেখুন, আপনার সঙ্গে এ ক'দিন মেলামেশা করে বুঝেছি আপনি সজ্জন— চোর-ছ্যাঁচড় নয়। আমি অনেকদিন থেকে আপনার মতো একজন মানুষ খুঁজছি। আমার একটি অনুরোধ আছে, আপনাকে রাখতে হবে।'

ভূত যে নিছক আমার সঙ্গ-লাভের জন্য নয়, একটা মতলব লইয়া আমার কাছে ঘোরাঘুরি করিতেছে তাহা এতদিন বুঝিতে পারি নাই। বোঝা উচিত ছিল; মুচ্ছুদ্দির প্রেতাত্মা বিনা প্রয়োজনে কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে, মনে করাও অন্যায়।

সতর্কভাবে বলিলাম, 'কি অনুরোধ?'

ভূত তখন টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া নিজের ও বংশের ইতিকথা বলিতে আরম্ভ করিল। আন্দাজ করিলাম কাঁকড়াবিছার ল্যাজে যেমন হুল থাকে, অনুরোধটা আছে গল্পের শেষে।

নন্দদুলাল নন্দী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করিয়া প্রচুর উপার্জন করিয়াছিল। জমিদারী বাগান ক্ষেত বালাখানা সবই হইয়াছিল। তাহার যখন তিপ্পান্ন বছর বয়স তখন সিপাহী বিদ্রোহের গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। এদিকে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না; কিন্তু যাহার টাকা আছে তাহার আশঙ্কার শেষ কোথায়? একদা গভীর রাত্রিকালে নন্দদুলাল একটি পিতলের ঘটিতে একশত মোহর পুরিয়া বাগানের নিমগাছতলায় পুঁতিয়া রাখিল। আর সবই যদি যায়, একশত আকব্বরী মোহর তো বাঁচিবে।

ম্যুটিনীর হাঙ্গামা এদিকে আসিল না বটে, কিন্তু অরাজকতার সময়, হঠাৎ একদিন নন্দদুলালের বাড়িতে ডাকাত পড়িল। নন্দদুলালের হৃৎযন্ত্র দুর্বল ছিল, সে বেবাক হার্টফেল করিয়া মারা গেল। ডাকাতেরা লুটপাট করিয়া চলিয়া গেল। তারপর ক্রমে দেশ ঠাণ্ডা হইল; শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল।

নন্দদুলাল হিসাবী লোক ছিল। তাই তাহার আমলে 'চাল' বেশি বাড়িতে পায় নাই। তাহার পুত্র যশোদাদুলালের আমলে বাবুয়ানি বাড়িল; আগে দোল-দুর্গোৎসবের সময় হরিকীর্তন কথকতা হইত, এখন বাঈ নাচ দেখা দিল। তারপর তস্য পুত্র ব্রজদুলাল আসিয়া বিলাসিতার চরম করিয়া ছাড়িয়া দিল; জুতায় মুক্তার ঝালর লাগাইয়া, বাঈজী পল্টন পুষিয়া, একশ' টাকার নোটের ঘুড়ি উড়াইয়া সে যখন পৃথিবী হইতে বিদায় লইল তখন লক্ষ্মীও বিদায় লইয়াছেন। বাকি আছে শুধু বাগান-ঘেরা বাড়িখানা।

ব্রজদুলালের পুত্র গোপীদুলাল নিরীহ মানুষ। বাপের ভুক্তাবশিষ্ট এঁটো পাতায় যত দিন পারিল চালাইল; শেষ পর্যন্ত তাহাকে বাড়ি বিক্রয় করিতে হইল। তারপর গত বিশ বছর ধরিয়া গোপীদুলাল বাড়ির বিক্রয়মূল্য লইয়া এবং সামান্য কাজকর্ম করিয়া অতি দীন ভাবে সংসার চালাইতেছে। তার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে; একমাত্র কন্যার বয়স একুশ, কিন্তু এখনও তাহার বিবাহ দিতে পারে নাই। উপরন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ তাহাকে দুরন্ত হাঁপানী রোগে ধরিয়াছে।

কাহিনী শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার প্রপৌত্র মানে গোপীদুলালবাবু এখানেই থাকেন?'

প্রেত বলিল, 'হ্যাঁ, বেনে পাড়ার এক ধারে একটা ভাঙা বাড়িতে পড়ে আছে। তারও বেশি দিন নয়, তাকে কালে ধরেছে। আর তো কিছু নয়, গোপীদুলাল ম'লে মেয়েটা ভেসে যাবে।' বলিয়া করুণ নিশ্বাস ফেলিল।

সন্দেহ হইল প্রেত বুঝি ঘটকালি করিতেছে। মনকে দৃঢ় করিয়া বলিলাম, 'দেখুন, আমি আগেই বলেছি বিয়ে করবার মতো অবস্থা আমার নয়। আপনি ও অনুরোধ করবেন না।'

প্রেত তাড়াতাড়ি বলিল, 'না না, অনুরোধ করছি না। আমি বলছিলাম, আপনি যদি দয়া করে মোহরগুলো গোপীদুলালের কাছে পৌঁছে দেন তাহলে সে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে মরতে পারে।'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'মোহরের ঘটি কি এখনও নিমতলায় পোঁতা আছে নাকি?'

প্রেত বলিল, 'হ্যাঁ। মরার আগে কাউকে বলে যেতে পারলাম না; যেমন পুঁতেছিলাম তেমনি পোঁতা

আছে। তাই তো নিমগাছ ছাড়তে পারি না।'

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিলাম রহিলাম। আশ্চর্য এই যে, ভূতের কথায় তিলমাত্র অবিশ্বাস জন্মিল না। একশত আকব্বরী মোহর! আকব্বরী মোহরের দাম কত জানি না কিন্তু বর্তমানকালে একশত মোহরের দাম দশ হাজার টাকার কম হইবে না।

ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম, 'এত সোনা! এর দাম যে অনেক।'

ভূত বলিল, 'সেইজন্যেই তো কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনে। এক আপনি ভরসা।'

চমকিয়া উঠিলাম, 'আমি! আমি কি করব?'

ভূত মিনতির স্বরে বলিল, 'ঘটিটা খুঁড়ে বার করতে হবে। বেশি খুঁড়তে হবে না, হাত খানেক খুঁড়লেই পাওয়া যাবে—'

'কিন্তু খুঁড়বে কে? আমি?'

'ভূতের চক্ষু নীরবে অনুনয় জানাইল। আমি চটিয়া বলিলাম, 'বেশ ভূত তো আপনি! ও বাগান এখন নিকুঞ্জ পালের দখলে, সে আমাকে খুঁড়তে দেবে কেন? আর আমিই বা তাকে বলব কি? বলব, মশায়, আপনার বাগানে মোহর পোঁতা আছে তাই খুঁড়তে এসেছি?'

ভূত বলিল, 'না না, আপনি দিনের বেলা যাবেন কেন? দুপুর রাত্রে চুপি চুপি পাঁচিল ডিঙিয়ে— নিমগাছটা বাড়ি থেকে অনেক দূরে, বাগানের এক কোণে— রাত্রে বাগানে কেউ থাকবে না—'

আমি বিড়ি ধরাইবার উপক্রম করিয়া বলিলাম, 'মাপ করবেন, আমার দ্বারা হবে না। রাত্রিবেলা পরের বাগানে যদি ধরা পড়ি, ঠ্যাংয়ে দড়ি পড়বে। নিকুঞ্জ পাল এমনিতেই আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। আমি পারব না।'

দেশলাই জ্বালিলাম।

তারপর কয়রাত্রি উপর্যুপরি ভূতের সঙ্গে ঝুলোঝুলি চলিল। আমি অটল, ভূতও নাছোড়বান্দা। আমি যত বলি— 'পারব না', ভূত ততই বলে— 'দয়া করুন!' যে-রাত্রির দৃশ্য লইয়া আরম্ভ করিয়াছি, তাহার পরও কয়েক রাত্রি কাটিয়া গেল। হঠাৎ দেশলাই জ্বালিয়া ভূতকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ভূতের এখন দেশলাই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেলেও আবার ফিরিয়া আসে এবং কাতর কণ্ঠে বলে, দয়া করুন। সদ্বংশের মেয়ে, নষ্ট হয়ে যাবে।'

আমার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। রাত্রে ঘুম নাই; সারারাত্রি ভূতের সঙ্গে তর্ক করিতেছি। উপন্যাস লেখা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একদিন মরীয়া হইয়া বলিলাম, 'বেশ, রাজী আছি। কিন্তু আমাকেও মোহরের ভাগ দিতে হবে।'

ভূত মুচ্ছুদ্দি; সে ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া বলিল, 'বেশ, আপনি পাঁচ পারসেন্ট দালালি পাবেন। পাঁচখানা মোহর আপনার।'

অতঃপর আর 'না' বলিবার উপায় রহিল না। পাঁচখানা মোহর, মানে পাঁচশত টাকা। পাঁচশত টাকার জন্য অতি বড় দুঃসাহসিক কাজ করিবেন না এমন সাহিত্যিক কয়জন আছেন? আমার দুঃখ এই যে বাকি পঁচানব্বইটি মোহর হজম করিতে পারিব না। পেটের দায়ে কুৎসিত উপন্যাস লিখি বটে, কিন্তু চুরি করিতে পারিব না। তাছাড়া, চুরি করিয়া যাইব কোথায়, নন্দদুলাল মুচ্ছুদ্দির হাত এড়াইব কি করিয়া?

রাত্রি আড়াইটার সময় প্রেতের অনুগামী হইয়া বাহির হইলাম। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদ ছিল, তাহারই আলোয় পাঁচিল টপকাইয়া নিকুঞ্জ পালের বাগানে ঢুকিলাম। ভূত দেখিয়া যাহা হয় নাই তাহাই হইল, বুকের ভিতর দুম্‌দাম্ শব্দ হইতে লাগিল।

ভূত দেখাইয়া দিল, এক স্থানে কয়েকটা কোদাল শাবল খন্তা পড়িয়া আছে। একটা খন্তা তুলিয়া লইলাম। ভূত পথ দেখাইয়া নিমগাছ-তলায় লইয়া গেল। নিমগাছ-তলায় একটা স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভূত কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া তদারক করিতে লাগিল, আমি খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম। চারিদিকে নিশুতি,

কোথাও সাড়াশব্দ নাই; মনে হইল আমিও মানুষ নই, কোন্ স্বপ্নসঙ্কুল সূক্ষ্ম জগতের বাসিন্দা।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘটি লইয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ঘটির গায়ে সবুজ রঙের কলঙ্ক, কিন্তু ভিতরে একশত নিষ্কলঙ্ক আকব্বরী মোহর ঝক্‌মক্ করিতেছে।

ভূত আত্মাভিমানসূচক একটা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, 'কি বলেছিলাম!'

আমার গায়ে তখন কালঘাম ঝরিতেছে। ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া আমি একটা বিড়ি ধরাইলাম। ভূতকে বেশি আস্কারা দেওয়া ভাল নয়।

পরদিন সকালবেলা আবার ঘটি খুলিয়া দেখিলাম, স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়, সত্যই একশত মোহর। তাহার মধ্য হইতে পাঁচটি সরাইয়া রাখিয়া পঁচানব্বইটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া লইয়া বাহির হইলাম। আর দেরি নয়। সোনার মোহ বড় মোহ; বেশিক্ষণ কাছে রাখিলে হয়তো লোভ সামলাইতে পারিব না।

বেনে পাড়ার একপ্রান্তে গোপীদুলালের বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিলাম। নোনাধরা চটা-ওঠা বাড়ি; তাহার সম্মুখে ঝাঁকড়া-চুলো একটি ছোকরা শিস্ দিতে দিতে পায়চারি করিতেছে। আমি দ্বারের কড়া নাড়িতেই ছোকরা আমার পানে অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরিয়া পড়িল।

একটি মেয়ে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; তারপর অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া একটু ভিতর দিকে সরিয়া গিয়া নতনেত্রে দাঁড়াইল, স্খলিত স্বরে বলিল, 'কাকে চান? বাবা বাড়ি নেই।'

বুঝিলাম গোপীদুলালের আইবুড় মেয়ে। গায়ের রং ফরসা, মুখখানি নরম ও সুশ্রী। সর্বাঙ্গে ভরা যৌবন। কিন্তু চোখেমুখে আতঙ্ক, যেন নিজের যৌবনের ভয়ে সর্বদা ত্রস্ত-চকিত হইয়া আছে। পরিধানে বোধ করি বাপের একখানা অর্ধমলিন ধুতি; গায়ে ব্লাউজের অভাব ঢাকা দিবার জন্য আঁচলটা বুকের উপর দুইফের করিয়া জড়ানো।

আমার কণ্ঠ যেন কে চাপিয়া ধরিল। গলা ঝাড়া দিয়া বলিলাম, 'এটা কি গোপীদুলালবাবুর বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি বাড়ি নেই? কখন ফিরবেন?'

'হাসপাতালে গেছেন। ফিরতে বোধ হয় দেরি হবে।'

'ও—' আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার ছিল। আমি ওবেলা আবার আসব। তাঁকে বলে দিও।'

মেয়েটি চকিতে চোখ তুলিল!

'আচ্ছা।'

আমার খোলার ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটার পর একটা বিড়ি টানিতে লাগিলাম। মাথা গরম হইয়া উঠিল; দুই বান্ডিল বিড়ি নিঃশেষ হইয়া গেল। ভয়-চকিত যৌবন, দুঃসহ অসহায় যৌবন, আপনার মাংস হরিণীর বৈরী—

ভূতের সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু ভূত দিনের বেলা আসে না।

অপরাহ্নে আবার গেলাম। এবার দালালির মোহর পাঁচটিও লইয়া গেলাম। মেয়েটি দ্বার খুলিয়া দিল। বলিল, 'বাবার শরীর বড় খারাপ, দেখা করতে পারবেন না। কী দরকার আপনার?' তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার নাম কি?'

ত্রাস-বিস্ফারিত চোখ তুলিয়া হ্রস্বকণ্ঠে সে বলিল, 'কমলা।'

আমি বলিলাম, 'কমলা, তোমার বাবাকে বল, আমার কাছে তাঁর কিছু টাকা পাওনা আছে, তাই দিতে এসেছি।'

দ্বারের ছায়ান্ধকার হইতে সে বিহ্বল চক্ষে আমার পানে চাহিল, তারপর ছায়ার মতো অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ‘আসুন।’

গোপীদুলালবাবু বিছানায় অর্ধোপবিষ্ট হইয়া হাঁপাইতেছিলেন। অকালবৃদ্ধ জীর্ণ মানুষ, চোখে উৎকণ্ঠা-ভরা ক্লান্তি। আমি পাশে বসিলে বলিলেন, ‘আপনাকে—? টাকা পাওনা আছে মনে পড়ে না তো।’

আমি বলিলাম, ‘টাকার কথা পরে বলব। এখন আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি আপনার স্বজাতি, ভদ্রসন্তান। আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।’

গোপীদুলাল দিশাহারা হইয়া গেলেন। আমি বিস্তারিতভাবে নিজের পরিচয় দিলাম; তাঁহার হাঁপানি যেন আরও বাড়িয়া গেল। শেষে বলিলেন, ‘কমলার বিয়ে দিতে পারব এ আমার আশার অতীত। আমার তো পয়সা নেই।’

‘আছে বৈকি! এই যে—’ বলিয়া আমি পুটুলি খুলিয়া একশত মোহর তাঁহার সম্মুখে ঢালিয়া দিলাম।

কমলাকে বিবাহ করিয়াছি। শ্বশুর মহাশয় কিন্তু টিকিলেন না, বিবাহের পরদিনই মারা গেলেন। আকস্মিক ভাগ্যোন্নতি তাঁহার সহ্য হইল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুদের ঋণ শোধ করিয়াছি; পুস্তক-প্রকাশকের ব্যবসা ফাঁদিবার আয়োজন করিতেছি। উপন্যাসখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। এবার একখানা রোমান্সভরা ভদ্র উপন্যাস ধরিব; যাহা পড়িয়া কমলা লজ্জা পাইবে না।

নন্দদুলালের সহিত আর একবার মাত্র দেখা হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম, ‘কেমন, খুশি হয়েছেন তো?’

নির্লজ্জ প্রেত চোখ টিপিয়া মুচকি হাসিয়াছিল। ‘দালালি একটু বেশি নিয়েছ’ বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

ভূতের কৃপায় আমার ভবিষ্যৎ এখন বেশ উজ্জ্বল।

১৬ বৈশাখ ১৩৫৭

নিরুত্তর

উত্তরাঞ্চলের একটি শহরে আমি কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম। গঙ্গার তীরে শহর। বাঙালী দু'চার ঘর আছেন। আমার কিন্তু কেবল একটি বাঙালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাঁহার নাম নৃসিংহ পাল। আমার বাসার পাশেই ছোট একটি বাড়িতে বাস করিতেন।

নৃসিংহবাবুর মতো এমন কদাকার চেহারা খুব কম দেখা যায়। গোরিলার মতো পাশবিক একখানা মুখ, ছোট ছোট ক্রূর চক্ষু; মাথার চুল পাকিয়া শাদা হইয়া গিয়াছে, তবু শোরকুচির মতো খাড়া হইয়া আছে। বয়স বোধ হয় ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু শরীর অসুরের মতো নিরেট। প্রথম যেদিন তাঁহাকে দেখি, আমার হৃৎপিণ্ড সত্রাসে লাফাইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার চেহারার জন্যই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক, বেশি লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা ছিল না। তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় দুইবার গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, তা ছাড়া আর বাড়ির বাহির হইতেন না। তাঁহার বাড়িতে অন্য কাহাকেও আসিতে দেখি নাই। কেবল খোঁড়া মানিক নামক এক ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকিয়া মাঝে মাঝে আসিত।

আমি নিজের পড়াশুনা লইয়া থাকিতাম, নৃসিংহবাবুর সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে যাই নাই। তাঁহার চেহারা যদি তাঁহার চরিত্রের দর্পণ হয় তবে পরিচয় না হওয়াই ভাল। কিন্তু তিনি একদিন নিজে আসিয়া আলাপ করিলেন। আমার চাকর পালাইয়াছিল; আমি নিতান্ত অসহায়ভাবে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, চাকর পালাইলে যদি এমন হাড়ির হাল হয় তবে স্বাধীনতা অর্জন করিয়া কী লাভ হইল, এমন সময় নৃসিংহবাবু আসিয়া বলিলেন, 'চাকর পালিয়েছে! কিছু ভাববেন না, কালই নতুন চাকর জোগাড় করে দেব। আজ আমার চাকর এসে আপনার সব কাজ করে দিয়ে যাবে।'

নৃসিংহবাবুর কণ্ঠস্বর অতি ভরাট এবং মধুর; শানাই বাঁশির খাদের পর্দার মতো। চেহারার সঙ্গে যেন ঠিক খাপ খায় না।

অতঃপর তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইল। তিনি দু'বেলা গঙ্গাস্নান করেন অথচ পূজার্চনা কিছুই করেন না, ধর্মের প্রসঙ্গও কখনও উত্থাপন করেন না, দেখিয়া শুনিয়া বড় আশ্চর্য মনে হইত। তাঁহার চেহারা ক্রমশ সহ্য হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার চরিত্র ভাল কি মন্দ তাহা নিঃসংশয়ভাবে ধরিতে পারিতেছিলাম না। হয়তো লুকাইয়া মদ খান, অন্য দোষও আছে; কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি কখনও কাহাকেও কষ্ট দিতে চাহিতেন না এবং কাহারও কষ্ট দেখিলে সাধ্যমতো প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র জ্ঞাতিগোষ্ঠী কেহ ছিল না, একাকী বাস করিতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ভ্রমণে বাহির হইয়া বাসা হইতে একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। শীতের সন্ধ্যা, রাস্তায় লোকজন নাই; এমন একটা স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম যেখানে তিন-চারিটা রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কোন্ রাস্তা ধরিলে বাসায় ফিরিয়া যাইতে পারিব ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছি না, এমন সময় দেখিলাম নৃসিংহবাবু গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহার পা খালি, গায়ে একটা আলোয়ান, হাতে গামছা-জড়ানো ভিজা কাপড়।

দু'জনে পাশাপাশি ফিরিয়া চলিলাম। এদিকটায় পূর্বে আসি নাই, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গঙ্গার ঘাট এখান থেকে কতদূর?'

'মাইলখানেক।'

'রোজ দু'বেলা এখানে আসেন?'

'হ্যাঁ।'

একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম, 'কাছাকাছি অন্য ঘাট আছে, সেখানে যান না কেন?'

তিনি বলিলেন, 'এটা শ্মশান ঘাট। এখানে আসি।'

হঠাৎ মনে হইল, কাপালিক নাকি? কিন্তু কই, রুদ্রাক্ষের মালা, সিঁদুরের ফোঁটা, এসব তো কিছু নাই!

খানিকক্ষণ নীরবে চলিলাম। বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, তার উপর পথের পাশে বড় বড় গাছ। আকাশে একফালি চাঁদ আছে বটে, কিন্তু রাত্রির তিমির হরণ করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়।

লক্ষ্য করিলাম, নৃসিংহবাবু পথ চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া পশ্চাতে তাকাইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি দেখছেন?'

'দেখুন তো পেছনে কেউ আসছে কিনা!'

হঠাৎ গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। পশ্চাতে তীক্ষ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, 'কই না!'

'কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কি?'

'না। কি ব্যাপার?'

'কিছু না। মাস কয়েক আগে এই জায়গায় দুটো শ্মশানের কুকুর একটা মুসলমান গুণ্ডার টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলেছিল।'

মিনিট দশেক পরে লোকালয়ের এলাকায় আসিয়া পড়িলাম, আরও পাঁচ মিনিট পরে নিজের পাড়ায় পৌঁছিলাম। নৃসিংহবাবুর বাড়ি আগে; তিনি বলিলেন, 'আসুন, চা খেয়ে যান।'

তাঁহার সদর ঘরে চৌকির উপর জাজিম পাতা। দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া গরম চা পান করিতেছি। আমার মনে নৃসিংহবাবু সম্বন্ধে আজ আবার নূতন করিয়া নানা প্রশ্ন জাগিতেছে; লোকটি কেমন? বাহিরের সহিত ভিতরের সামঞ্জস্য কতখানি? এতদিনের আলাপেও আসল মানুষটাকে চিনিতে পারিতেছি না কেন?

নৃসিংহবাবু হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসির আওয়াজ যেমন বংশী-মধুর, হাসিলে তাঁহার মুখের ভাব হয় তেমনি দংষ্ট্রা-করাল। হাসি থামাইয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি একটা ভয়ঙ্কর পাজি লোক।'

আমি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, 'না না, সে কি কথা—'

তিনি সহজ সুরে বলিলেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন! সত্যিই আমি ভয়ানক পাজি লোক। অন্তত বছর তিনেক আগে পর্যন্ত তাই ছিলাম। এখন মনটা বোধহয় কিছু বদলেছে; কিন্তু চেহারা বদলায়নি, যা ছিল তাই রয়ে গেছে।'

নৃসিংহবাবু নির্বিকার চিত্তেই কথাগুলি বলিলেন, আমি কিন্তু বিশেষ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম; চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে তুলিয়া লজ্জা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি বলিয়া চলিলেন, 'পরমা প্রকৃতি আমার সর্বাঙ্গে প্রকৃত পরিচয়ের ছাপ মেরে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে বেইমানি করিনি। এমন দুষ্কর্ম নেই যা করিনি, জগাই-মাধাই আমার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু। এইভাবেই জীবন কেটে যাচ্ছিল, তারপর একদিন একটা সামান্য ঘটনা ঘটল, তার ফলে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ভাববেন না যে মনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল কিংবা রাতারাতি সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে পড়লাম। দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি বেশি, আসলে বদলেছে এই জলজ্যান্ত পৃথিবীটা। শুনলে আশ্চর্য হবেন। সেই কথাই আজ আপনাকে বলব।'

'বলুন।'

এই সময় একটু বাধা পড়িল। বাহিরের দ্বার ভেজানো ছিল, তাহা কাহারও লঘু করস্পর্শে খুলিয়া গেল এবং একটি মানুষের মুখ ভিতরে উঁকি মারিল। পশমের টুপি ঢাকা মুখখানি অস্থিসার এবং ছুঁচলো, চক্ষু দু'টি

ভীরু ধূর্তামিতে ভরা। আমাকে দেখিয়াই মুখটি বাহিরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। যেন একটা পথের কুকুর খাদ্যের লোভে রান্নাঘরে উঁকি মারিয়াছিল, ভিতরে লোক আছে দেখিয়া পলায়ন করিল।

আমি চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ও কে?'

নৃসিংহবাবু হাসিলেন, 'ভূত-প্রেত নয় মানুষ। ওর নাম খোঁড়া মানিক। ও একটা নিশাচর জীব। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে।'

কিন্তু পালালো কেন?'

'আপনাকে দেখে পালালো। ও আমার কাছে আসে লুকিয়ে। শহরে একজন বড়লোক আছে, নাম রামনেহাল সিং; খোঁড়া মানিক তার মোসায়েব। রামনেহাল যদি জানতে পারে খোঁড়া মানিক আমার কাছে আসে, ওকে বেমালুম কেটে ফেলবে। —ওকথা যাক, গল্পটা বলি শুনুন।'

নৃসিংহবাবু সদর দরজায় খিল দিয়া আসিয়া বসিলেন।

আমি পুলিশের দারোগা ছিলাম। রাইটার কনস্টেবল হয়ে ঢুকি, বড় দারোগা পর্যন্ত উঠেছিলাম। আরও উঠতে পারতাম, ইচ্ছে করে উঠিনি। ওপরে তেমন মজা নেই।

আমার মতো দুর্দান্ত দারোগা পুলিশে আর ছিল না, এখনও বোধ হয় নেই। যেমন কুচুটে বুদ্ধি তেমনি আইন বাঁচিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা। যাকে একবার ধরতাম, পিত্তি বার করে ছেড়ে দিতাম। চোর ছ্যাঁচড় দুষ্ট বজ্জাত লোক আমাকে যত ভয় করত, ভদ্রলোকেরা তার চেয়ে বেশি ভয় করত। যখন যে মহকুমায় বদলি হয়ে যেতাম সেখানে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠত। বড়লোকেরা গায়ে পড়ে টাকা খাইয়ে যেত, যেন তাদের পেছনে না লাগি।

এই ভাবে মনের সুখে আছি। বিয়ে করিনি; আমার মতো যাদের মনের ভাব তাদের বিয়ে করা বোকামি। মাইনে পাই সামান্যই কিন্তু উপরি আসে ছাপ্পর ফুঁড়ে। এখনও সেই টাকাই খাচ্ছি, আরও বিশ বছর যদি বেঁচে থাকি সে টাকা ফুরোবে না।

বাইরে বাঘের দাপট, ভেতরে মদ মাংস পঞ্চমকার। যা চাই সব পেয়েছি; মনের ফুর্তিতে আছি।

বছর আষ্টেক আগে এই শহরে বদলি হয়ে আসি, বড় থানার বড় দারোগা। শাঁসালো শহর, পয়সাওয়ালা লোক অনেক আছে। সকলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। চুপি চুপি ভেট আসতে লাগল; যাদের পেটে ময়লা যত বেশি তারা ঠাকুরের মন্দিরে তত বেশি পূজা পাঠালো। কেবল একজন পাঠালো না, সে ঐ রামনেহাল সিং। রামনেহাল সিং-এর জমিদারী আছে, সুদের কারবারও করে, অঢেল টাকা। সে তেউড়ে বসে রইল, কিছু দিলে না।

মাসখানেক পরে একটা মামুলি কাজের অছিলায় তার বাড়িতে গেলাম। ইশারায় জানালাম, টাকা চাই। সে স্পষ্ট মুখের ওপর বললে, 'তোমার মতো দারোগা ঢের দেখেছি। যা পারো করো গিয়ে, এস পি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।'

মনে মনে বারুদ হয়ে ফিরে এলাম। দাঁড়াও যাদু, তোমাকে দেখাচ্ছি এস পি বড় না নর্সিং দারোগা বড়।

জাল বুনতে আরম্ভ করলাম। এই সব জমিদারদের আইনের ফাঁদে ফেলা শক্ত নয়, ছোটখাটো মামলায় সহজেই ফেলা যায়। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, রামনেহাল সিংকে এমন মার দেব যে আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। একেবারে শিরদাঁড়া ভেঙে দেব।

খোঁড়া মানিক—যাকে এখনি দেখলেন— সে তখনও রামনেহালের মোসায়েব ছিল, রামনেহালের যত নোংরা কাজ সে-ই করত। তাকে একদিন ধরে ফেললাম। থানায় ডাকলাম না, বাড়িতে ডেকে এনে বললাম সে যে-সব কাজ করেছে, তার জন্যে তাকে পাঁচ দফায় দশ বছর জেলে পাঠাতে পারি। খোঁড়া মানিক পা জড়িয়ে ধরল।

সেই থেকে খোঁড়া মানিক হল আমার গোয়েন্দা, গুপ্তচর। লুকিয়ে রাত্তিরে এসে আমাকে রামনেহালের

হাঁড়ির খবর দিয়ে যেত। ওর মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম যে, সে-ভয় ওর এখনও যায়নি। আমার এখন চাকরি নেই, কোনও ক্ষমতা নেই; কিন্তু ওর বিশ্বাস ইচ্ছে করলেই আমি ওকে জেলে পাঠাতে পারি। তাই মাঝে মাঝে আসে, খবর নিয়ে যায়।

সে যাক্। দেড় বছর ধরে ধীরে ধীরে একটি মোকদ্দমা খাড়া করলাম। মোকদ্দমা নয়, একটি নিখুঁত শিল্পকর্ম। রামনেহালের ছেলের বয়স তখন উনিশ-কুড়ি। সে বাজারের এক বেশ্যাকে খুন করেছে। সাক্ষী-সাবুদ দলিল-দস্তাবেজ একেবারে নিরেট, কোথাও বেরুবার পথ নেই।

রামনেহালের ছেলের চৌদ্দ বছর ম্যাদ হয়ে গেল। এস পি বাঁচাতে পারলেন না। কেবল কম বয়স বলে ফাঁসি হল না। সে ছেলে এখনও জেলে পচছে।

এই একটা নমুনা থেকে বুঝতে পারবেন আমি কি ধরনের লোক। তারপর কয়েক বছর কেটে গেল, আমার কাজ থেকে অবসর নেবার সময় হল। অনেক টাকা করেছি, কাজ করবার দরকার নেই। এক্সটেনশন নিতে পারতাম কিন্তু নিলাম না।

এই ছোট্ট বাড়িখানা কিনেছিলাম। কাজ চুকিয়ে দিয়ে বাড়িতে এসে বসলাম। মনে গর্বভরা আনন্দ। যা চেয়েছি তা পেয়েছি, কারুর কাছে হার মানিনি। আর কি চাই!

সেদিন সন্ধ্যার পর এই ঘরে মদের বোতল নিয়ে বসেছি; সারা রাত্রি একাই উৎসব চলবে। টোটা-ভরা পিস্তলটা হাতের কাছে আছে। শত্রু অনেক, কাজ ছেড়ে দিয়েছি বলে যদি কেউ দাদ তুলতে আসে তাকে দেখে নেব।

মশগুল হয়ে মদ খাচ্ছি। সময়ের হিসেব নেই। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি একটা বিকট চেহারা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রোগা সিড়িঙ্গে এক সন্নিসি; মাথায় জটা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, সারা গায়ে ছাই মাখা।

আমি অভ্যাসের বশেই খপ্ করে পিস্তলটা তুলে নিয়েছি, সন্নিসি ধমক দিয়ে উঠল— 'বন্দুক রাখ্।'

কী গলার আওয়াজ, যেন তোপ দাগলো। বললে বিশ্বাস করবেন না, পিস্তল আমার হাত থেকে খসে পড়ল, আমি ভেড়ার মতো তাকিয়ে রইলাম।

সন্নিসি তখন বললে, 'তোর সময় হয়েছে। রোজ দু'বেলা গঙ্গাস্নান করবি। আর মা'র নাম করবি। মদ খাবি না, আর বুধবারে দাড়ি কামাবি না।'

আমি এবার হো হো করে হেসে উঠলাম। মদের নেশা তো ছিলই তার ওপর— বুধবারে দাড়ি কামাব না! অনেকক্ষণ ধরে হাসলাম, হাসতে হাসতে বেদম হয়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, ঘরের দোর তাড়া তো বন্ধ ছিল, সন্নিসি ঢুকল কী করে? হাসি থামিয়ে চেয়ে দেখি সন্নিসি নেই, চলে গেছে। কিন্তু দোর তাড়া ঠিক আগের মতোই বন্ধ আছে।

তাই বলছিলাম আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি, বদলেছে এই পৃথিবীটা। যতসব অসম্ভব গাঁজাখুরি ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছে। যা ঘটতে পারে না, ঘটা উচিত নয়, তাই ঘটছে।

সে-রাত্রে এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরের দিকে সদর দরজায় খট্‌খট্ আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম কেউ আমার সঙ্গে বজ্জাতি করছে। তখনও মদের নেশা ভাল কাটেনি, সন্নিসির কথাও মনে নেই; আমি পিস্তল নিয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে হঠাৎ দরজা খুললাম। দেখলাম দোরের কাছে কেউ নেই, কিন্তু একটা লোক রাস্তা দিয়ে হন্‌হন্ করে দূরে চলে যাচ্ছে।

আমার রোখ চড়ে গেল, আমি তাকে ধরবার জন্যে বার হলাম। পায়ে জুতো নেই, হাতে পিস্তল, আমি লোকটার পিছনে চললাম। ভোরের ঘোর-ঘোর আলোয় ভাল দেখা যাচ্ছে না, আমি যত জোরে চলি, সেও তত জোরে চলে; আমি দৌড়তে লাগলাম, সেও দৌড়তে শুরু করল।

তারপর অনেকদূর দৌড়বার পর তাকে আর দেখতে পেলাম না। এতক্ষণ কোথায় যাচ্ছি তার হিসেব ছিল না, এখন চমক ভেঙে দেখি শ্মশানঘাটের কাছে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আছি।

শ্মশানঘাট তখন শূন্য। সেখানে একা দাঁড়িয়ে সন্নিসির কথা মনে পড়ে গেল। সন্নিসি বলেছিল, দু'বেলা

গঙ্গাস্নান করবি। তখন গরম কাল, এতখানি পথ দৌড়ে আমার সারা গায়ে ঘাম ঝরছে। ভাবলাম, মন্দ কি, স্নান করেই যাই।

গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরলাম।

সে দিনটা ছিল বুধবার, কিন্তু আমার তা মনে ছিল না। বেলা আটটার সময় দাড়ি কামাতে বসলাম। আমি নিজে দাড়ি কামাই, নাপিতকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু ক্ষুর চালাতে গিয়ে খ্যাঁচ্ করে কেটে ফেললাম নিজের গাল। দর্‌দর্ করে রক্ত ঝরতে লাগল। তখন মনে পড়ল, আজ বুধবার; সন্নিসি বলেছিল বুধবারে দাড়ি কামাবি না।

দুত্তোর! দাড়ি না হয় একদিন না কামালাম। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। একটা ভিখিরি এসে আমাকে গুণ করে গেল। না, কিছুতেই না। আমি নসিং দারোগা, আমার ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়, একটা সন্নিসি আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে! দেখব কেমন সন্নিসি।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সন্ধ্যের পর একটি আস্ত ব্রান্ডির বোতল নিয়ে বসতে যাব, বোতলটা হাত থেকে পিছলে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। বাড়িতে আর মদ নেই, কিন্তু আমিও হার মানব না। ঠিকে গাড়ি ভাড়া করে তখনি চললাম মদের দোকানে।

মদের দোকান বন্ধ। আর একটা দোকানে গেলাম, সেটাও বন্ধ। শুঁড়িরা নাকি ধর্মঘট করেছে।

গাড়িতে ফিরে এসে বসতেই গাড়োয়ান প্রশ্ন করল— 'হুজুর, এবার কোথায় যাব?' উত্তর দিলাম— 'চুলোয়।'

গাড়ি চলল। আমি বসে বসে রাগে ফুলতে লাগলাম। তারপর গাড়ি যখন থামল, দেখলাম শ্মশানঘাটে উপস্থিত হয়েছি।

স্নান করে বাড়ি ফিরলাম।

এইরকম কয়েকদিন চলল— আমার নিজের ইচ্ছা বলে যেন কিছু নেই; আমাকে দু'বেলা গঙ্গাস্নান করতে হবে, মদ খেতে পাব না, বুধবারে দাড়ি কামাতে পাব না। আমি স্বাধীন মানুষ নই, কেনা গোলাম; আমার অজানা মালিক আমার ঘাড় ধরে আমার মুখটা রাস্তায় ঘষে দিচ্ছে।

একদিন উত্ত্যক্ত হয়ে নিজের মনে বললাম, মা, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস নেই, বুজরুকি মানি না। কিন্তু সন্নিসির হুকুম মানলে যদি আর গণ্ডগোল না হয় তবে তাই সই। আর মদ খাব না, দু'বেলা গঙ্গাস্নান করব, বুধবারে দাড়ি কামাব না। এতে যদি কারুর লাভ হয় তো হোক।

দু'বেলা গঙ্গাস্নান করা ক্রমে অভ্যেস হয়ে গেল, বুধবারে দাড়ি কামানো ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মদ ছাড়া অত সহজ নয়। আরও দু'চারবার মার খেতে হল। যতবারই মদ খেতে যাই একটা না একটা বিপত্তি এসে পড়ে। একবার গেলাসে মদ ঢেলেছি, ছাদ থেকে গেলাসের মধ্যে টিকটিকি পড়ল। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ছেড়ে দিলাম। কিছুদিনের জন্যে মনে হল দুনিয়াটা বিস্বাদ হয়ে গেছে।

যা হোক, নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কাটছে। মা'র নাম করি; মানে, যখনই মনে পড়ে, মা'কে বাপ তুলে গালাগালি দিই। মা কে তা জানি না, কেন আমার পেছনে লেগেছে তাও জানি না, কিন্তু চুটিয়ে মা'কে বাপান্ত করি। মা'র বোধহয় ভাল লাগে, কারণ যতই গালাগালি দিই, আমার কোনও অনিষ্ট হয় না।

একদিন সন্ধ্যের পর খোঁড়া মানিক এল। বললে, 'নর্সিংবাবু, আপনি এ শহর ছেড়ে চলে যান। রামনেহাল সিং আপনাকে খুন করবার জন্যে গুণ্ডা লাগিয়েছে। এখানে থাকলে আপনার প্রাণ যাবে।'

রামনেহাল গুণ্ডা লাগিয়েছে। আশ্চর্য নয়। আমি তার মুখে চুনকালি দিয়েছি, তার ছেলেকে জেলে পাঠিয়েছি, সে শোধ তুলতে চায়। কিন্তু আমি নর্সিং পাল, রামনেহালের ভয়ে পালিয়ে যাব? আমি চিরকাল গুণ্ডা চরিয়ে বেড়িয়েছি, আমাকে গুণ্ডার ভয় দেখাবে! কুচ পরোয়া নেই, আসুক গুণ্ডা। দেখে নেব।

তবু সাবধান হলাম। বাইরে যখন বেরুই পিস্তল নিয়ে বেরুই, রাত্রে শোবার সময় পিস্তল বালিশের পাশে থাকে। দুপুর রাত্রে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি কেউ আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা। কিন্তু কাউকে দেখতে পাই না, মনে হয় সব ধাপ্পা! আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে।

দিন আষ্টেক পরে মানিক আবার এল। একগাল হেসে বললে, 'ধন্য আপনি, এত বুদ্ধিও ধরেন! রামনেহাল মুষড়ে পড়েছে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি!'

খোঁড়া মানিক বলল, 'বাঘের মতো এক জোড়া কুকুর পুষেছেন আপনি, তারা সমস্ত রাত বাড়ি পাহারা দেয়। তিনবার গুণ্ডারা এসেছিল, কুকুর দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে। আমি নিজের কানে শুনেছি তারা রামনেহালকে বলছে, কুকুর নয় হুজুর, সাক্ষাৎ দুটো যমদূত।'

খোঁড়া মানিককে কিছু বললাম না, কিন্তু মনে ভারি ধোঁকা লাগল। কুকুর এল কোত্থেকে? তারপর সারা রাত্রি জুতো পাহারা দিয়েছি, কখনও একটা নেড়ি কুত্তাও দেখতে পাইনি।

এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। গুণ্ডারা কুকুর দেখেছে, আমি দেখতে পাই না কেন? ভাবলাম, গুণ্ডারা আমাকে তো চেনে, আমার বাড়িতে ঢুকতে সাহস পায়নি, রামনেহালকে গল্প বানিয়ে বলেছে।

তারপর বেশ কিছুদিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল। আমি অদৃশ্য কুকুরের পাহারায় নিরাপদে আছি। ভয় কেটে গেল। গঙ্গাস্নানে যাই তাও পিস্তল নিয়ে যাই না। সেই সন্নিসির আর দেখা পাইনি, মনে ধর্মভাবও জাগেনি। কিন্তু নিজের মনে মা মা করি। বলি, 'মা, তুই কে? আমাকে বুঝিয়ে দে। আমার দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে গেছে, কিছু বুঝতে পারছি না। তুই বুঝিয়ে দে।'

মা বুঝিয়ে দেন না। সর্বনাশী আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখে।

ছ'মাস আগের কথা বলছি। খোঁড়া মানিক এল; তার মুখ শুকনো। বললে, 'আপনি নাকি সকাল সন্ধ্যে শ্মশানঘাটে নাইতে যান?'

বললাম, 'হ্যাঁ যাই।'

খোঁড়া মানিক বললে, 'ওরা জানতে পেরেছে— হিন্দু গুণ্ডারা আপনাকে মারতে রাজী হয়নি, বলেছে আপনি নাকি কাপালিক, শ্মশানে শবসাধনা করেন। তাই রামনেহাল মুসলমান গুণ্ডা লাগিয়েছে। নাম জানেন বোধ হয়, রহিম আর করিম দুই ভাই। তারা শ্মশানের রাস্তায় আপনাকে ছুরি মারবে।'

খোঁড়া মানিক চলে যাবার পর ভাবতে বসলাম। কি করা যায়? গঙ্গাস্নান বন্ধ করা যাবে না, কারণ জানি, নিজের ইচ্ছায় না গেলে ঘাড় ধরে নিয়ে যাবে। এক, পিস্তল নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু কেন জানি না, পিস্তল নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতে আর ইচ্ছে হল না। দূর হোক গে, যা হবার হবে। আমার ইচ্ছেয় তো কিছুই হচ্ছে না, তবে মিছে ভেবে মরি কেন?

দু'চার দিন কিছু হল না। স্নান করতে যাই, ফিরে আসি। আমার পেছনে গুণ্ডা লেগেছে তা প্রায় ভুলেই গেলাম! তারপর একদিন—

সন্ধ্যের পর শ্মশানের দিকটা কীরকম নির্জন হয়ে যায় দেখছেন তো। ওদিকে ঘরবাড়িও নেই, লোক চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আমি স্নান করে ফিরছি; রাত আন্দাজ আটটা। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। হঠাৎ পিছনে একটা বিকট চিৎকার শুনে আঁতকে উঠলাম। মানুষের গলার মর্মান্তিক চিৎকার, সেই সঙ্গে কুকুরের গভীর ডাক। যেন একটা ডালকুত্তা একটা মানুষের গলা কামড়ে ধরে তার চিৎকার বন্ধ করে দিলে।

আমি আর দাঁড়ালাম না, টেনে ছুট মারলাম।

পরদিন সকালবেলা খবর পাওয়া গেল, শ্মশানঘাটের রাস্তায় রহিম গুণ্ডার লাশ পাওয়া গেছে। তাকে শ্মশানের কুকুর নাকি টুঁটি ছিঁড়ে মেরে ফেলেছে। রহিমের হাতে একটি বর্শা ছিল, তবু সে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

রাত্তিরে খোঁড়া মানিক এল। রহিমের ভাই করিম রামনেহালকে যা বলেছে, তার কাছে শুনলাম। ওরা দু'ভাই ক'দিন ধরে আমার জন্যে ওঁত পেতে ছিল, রোজই দেখত এক জোড়া কালো কুকুর আমার পেছনে থাকে। কাল রহিম আর করিম রাস্তার ধারেই একটা গাছে উঠে বসে ছিল, মতলব করেছিল যেই আমি গাছতলা দিয়ে যাব অমনি বর্শা ছুঁড়ে আমায় মারবে; কুকুর তাদের কিছু করতে পারবে না। কিন্তু বর্শা ছুঁড়তে

গিয়ে রহিম নিজেই পা ফস্‌কে নীচে পড়ে গেল, আর একটা কুকুর এসে ধরল তার টুঁটি——

এই পর্যন্ত বলিয়া নৃসিংহবাবু নীরব হইলেন। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিলেন, 'এই আমার গল্প। রামনেহাল আর আমাকে ঘাঁটায়নি। সেই থেকে নির্ভয়ে আছি।

'এখন আপনি বলুন—— এ সব কী? অলৌকিক বললে চলবে না, কেন অলৌকিক তা বলতে হবে। সন্নিসি বলেছিল, আমার সময় হয়েছে। কিন্তু কি করে সময় হল? শুনেছি যাঁরা সাধুসজ্জন যোগী তপস্বী, ভগবান তাঁদের দয়া করেন, বিপদে রক্ষা করেন। কিন্তু এ কি! জীবনে আমি একটা ভাল কাজ করিনি, মন্দ কাজ এত করেছি যে তার সীমাসংখ্যা হয় না; তবে বেছে বেছে আমাকে দয়া করবার মানে কি? জোর করে আমাকে মদ ছাড়ানো, গঙ্গাস্নান করানো, আমাকে শত্রুর প্রতিহিংসা থেকে আগলে রাখা, এ সব কেন? আপনি বিদ্বান লোক, এর উত্তর দিন। কেন? কেন? কেন?'

নৃসিংহবাবু কদাকার মুখে তীব্র জিজ্ঞাসা ভরিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, হয়তো তাঁহার এই তীব্র ব্যাকুল জিজ্ঞাসাই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর।

১১ শ্রাবণ ১৩৫৯

দেখা হবে

ভূপতির স্ত্রী স্মৃতিকণার মৃত্যুকালে আমি তাহার শয্যাপার্শ্বে ছিলাম। কেবল ডাক্তার বলিয়া নয়, ভূপতি আমার বন্ধু।

স্মৃতিকে কঠিন রোগে ধরিয়াছিল। আমি নিজের হাতে চিকিৎসার ভার রাখি নাই, কলিকাতার সব বড় বড় ডাক্তারই তাহাকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই বাঁচানো গেল না।

মৃত্যুর রাত্রে শয্যাপার্শ্বে কেবল আমি আর ভূপতি ছিলাম। তেতলার প্রকাণ্ড শয়নকক্ষে দুইটি বড় বড় বৈদ্যুতিক গোলক জ্বলিতেছিল। ঘরের মাঝখানে একটি পালঙ্কের উপর শুইয়া স্মৃতি; ভূপতি আর আমি শয্যার দুই পাশে বসিয়া রোগিণীর মুখের পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।

স্মৃতির গলা পর্যন্ত সিল্কের চাদর দিয়া ঢাকা, মুখখানি শুধু খোলা। মুখ দেখিয়া মনে হয় না, গত তিন মাসে নৃশংস রোগ তাহার চব্বিশ বছরের সবল সুস্থ দেহটাকে কুরিয়া কুরিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। টুলটুলে মুখ, মুদ্রিত চোখ দু'টি যেন সুর্মাআঁকা, চুলগুলি মুখখানিকে ঘিরিয়া মণ্ডল রচনা করিয়াছে। দেখিয়া বোঝা যায় না মৃত্যু আসন্ন।

স্মৃতি আজ রাত্রি দশটার পর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞান নাই। আমি মাঝে মাঝে নাড়ি দেখিতেছি, নাড়ি ভাল নয়। এই অবস্থাতেই বোধ হয় শেষরাত্রে কোনও সময় তাহার মৃত্যু হইবে। এখন রাত্রি একটা।

শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছিলাম। দশ বৎসরের চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অনেক মৃত্যু দেখিয়াছি, কিন্তু আজ মনে হইতেছে স্মৃতির মৃত্যু যেন অন্য মৃত্যু হইতে পৃথক। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ভূপতি আমার প্রিয়তম বন্ধু, তাহাকে আমি অন্তরে বাহিরে চিনি। সে বড় ব্যবসায়ী, অনেক টাকার মানুষ; কিন্তু মনের মধ্যে সে একেবারে অসহায়। অপরপক্ষে স্মৃতির মতো এমন পরিপূর্ণরূপে সংসারী মেয়ে আমি আর দেখি নাই। সংসারকে সুমধুর করিয়া তুলিবার মন্ত্র সে জানিত। দুইজনে মিলিয়া সুখের নীড় রচনা করিয়াছিল; ভূপতি স্মৃতির হাতে নিজের জীবন তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। তাহাদের পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনকে একটি অখণ্ড কাব্য বলা চলে, একদিনের জন্যও ছন্দপতন হয় নাই। তারপর বজ্রাঘাতের মতো এই রোগ। একটা সন্তানও নাই। স্মৃতির মৃত্যুতে পৃথিবীর আর কোনও ক্ষতি হোক না হোক, ভূপতির জীবনটা ছারখার হইয়া যাইবে।

রাত্রি তিনটার সময় স্মৃতি চক্ষু মেলিল। দৃষ্টিতে জড়তা নাই, অস্পষ্টতা নাই; ভূপতির মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সহজ স্বাভাবিক স্বরে কথা বলিল। তাহার এই স্বর অনেকবার শুনিয়াছি, হলফ লইয়া বলিতে পারি তাহাতে বিকারজনিত প্রলাপের চিহ্নমাত্র ছিল না। সে বলিল, "একশিলা নগরীতে আবার দেখা হবে।"

ভূপতি তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যগ্র-বিস্মিত প্রশ্ন করিল, "কী— কী বললে?"

স্মৃতি আর কথা বলিল না, আরও কিছুক্ষণ ভূপতির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। আমি তাহার নাড়িতে হাত দিলাম। নাড়ি কয়েকবার ক্ষীণভাবে স্ফুরিত হইয়া থামিয়া গেল।

স্মৃতি মরিয়া গিয়াছে কিন্তু আমার মনে একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। একশিলা নগরীতে আবার দেখা হবে। ইহা মৃত্যুকালের উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ নয়; মানুষ যেমন রেলের স্টেশনে ট্রেন ছাড়িবার পূর্বে প্রিয়জনকে বলে— অমুক দিন আবার দেখা হবে, এ সেই ধরনের উক্তি। একশিলা নগরী বলিয়া কি কোনও

স্থান আছে? কখনও নাম শুনি নাই। আবার দেখা হবে— একথার অর্থ কি? মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কেহ যদি বলে, আবার দেখা হবে, তবে তাহার কী অর্থ হয়? পরলোক পুনর্জন্ম আমি মানি না। স্মৃতি আধুনিকা ছিল, কিন্তু হয়তো মনে মনে এইসব কুসংস্কার পোষণ করিত; মৃত্যুকালে মনের বাসনা ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু স্মৃতির কণ্ঠস্বরে হৃদয়াবেগের বাষ্পটুকু ছিল না। তাছাড়া— একশিলা নগরীতে কেন? এই অশ্রুতপূর্ব নামটা স্মৃতি কোথা হইতে পাইল।

স্মৃতির মৃত্যুর পর ভূপতির সঙ্গে কয়েক মাস দেখা হয় নাই। তাহার বাড়িতে গিয়া দেখা পাই নাই। স্মৃতির কথা মন হইতে সরাইয়া রাখিবার জন্যই বোধকরি সে ব্যবসায়ে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছিল। বাড়িতে খুব কমই থাকিত, এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইত। একবার শুনিলাম সে প্লেনে বিলাত গিয়াছে।

মাস দুয়েক পরে হঠাৎ একদিন আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত। শুষ্ক রুক্ষ চেহারা, রোগা হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, "কোথায় ছিলি এতদিন? মড়ার মতো চেহারা হয়েছে, অসুখ-বিসুখ করেনি তো।"

ভূপতি আমার প্রশ্নের জবাব দিল না; আমার স্ত্রীর সহিত কিছুক্ষণ রঙ্গ-রসিকতা করিল, চা ও জলখাবার ফরমাস দিল। স্ত্রী প্রস্থান করিলে আমার পানে কাতরচক্ষে চাহিয়া বলিল, "ভাই, আর তো পেরে উঠছি না, একটা কিছু উপায় কর্।"

"কি উপায় করব? কিছুতেই ভুলতে পারছিস্‌নে?"

"না। যতদিন সে বেঁচে ছিল ততদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম। তার কথা ভাববার দরকার হত না, সে-ই অষ্টপ্রহর আমার ভাবনা ভাবত। এখন— তার চিন্তা অষ্টপ্রহর আমার ঘাড়ে চেপে আছে।"

"এতে চিন্তার কি আছে? একদিন তো ভুলতেই হবে। মনকে শক্ত কর্, মনের রাশ ছেড়ে দিসনে।"

"সে চেষ্টা কি করিনি? কিছুতেই কিছু হল না। —মরবার সময় কী যে একটা কথা বলে গেল— একশিলা নগরীতে দেখা হবে। তুই কিছু মানে বুঝতে পেরেছিস?"

"না। হয়তো বোঝবার মতো মানে কিছু নেই। তুই ও নিয়ে মাথা ঘামাসনি।"

ভূপতি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "একশিলা নগরী। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ বলতে পারেনি; কিন্তু আমার বিশ্বাস কোথাও না কোথাও একশিলা নগরী আছে।"

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "একশিলা নগরীর নাম স্মৃতি আগে কখনও তোর কাছে করেছিল?"

"কখ্‌খনো না।"

অতঃপর দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্ত্রী আসিয়া চা ও জলখাবার রাখিয়া গেলেন, ভূপতি নীরবে জলযোগ সম্পন্ন করিল। আমি বলিলাম, "ভূপতি, আয় তোর শরীরটা পরীক্ষা করে দেখি। শরীরে রোগ থাকলে মনও অসুস্থ হয়ে পড়ে।"

সে বলিল, "দূর! শরীর আমার দিব্যি আছে।"

বলিলাম, "তবে আবার বিয়ে কর্। স্মৃতিকে তুই কত ভালবাসিস আমি জানি, তাকে ভুলে যেতে বলছি না; কিন্তু এভাবে জীবনটা নষ্ট করে ফেলার কোনও মানে হয় না। আমার কথা শোন, আবার বিয়ে কর্।"

সে বলিল, "তুই পাগল! নিজেকে সামলাবার চেষ্টা কি আমি করিনি। মদ খেয়ে দেখেছি, লোচ্চামি করবার চেষ্টা করেছি; কিন্তু আমার দ্বারা হল না। তোর কথায় একটা মেয়েকে বিয়ে করে কি তার জীবন নষ্ট করে দেব?"

"তবে কি করবি?"

"তা জানি না।" সে উঠিয়া দাঁড়াইল— "আচ্ছা আজ চলি, আবার দেখা হবে।"

দ্বারের দিকে পা বাড়াইয়া সে থামিয়া গেল, তারপর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "এই দ্যাখ, আমিও বলছি আবার দেখা হবে; কিন্তু আমার বলার একটা মানে হয়। স্মৃতি কেন বলল?"

আমি নিরুত্তর রহিলাম। ভূপতি চলিয়া গেল। তারপর তিন মাস আর তাহার দেখা পাইলাম না।

শীতের মাঝামাঝি ভূপতি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইল; বলিল, "চল, বেড়াতে যাবি?"

"বেড়াতে! কোথায়?"

"ভারতবর্ষে বেড়াবার জায়গার অভাব! চল কাশ্মীর যাই।"

"এই শীতে কাশ্মীর!"

"তবে রাজপুতানা কিংবা দক্ষিণে যাওয়া যাক। দক্ষিণটা দেখা হয়নি। যাবি? সব খরচ আমার।"

দোনা-মনা করিয়া রাজী হইলাম। ভূপতির যেরূপ চেহারা হইয়াছে, শীতের সময় দেশে বিদেশে বেড়াইলে শরীর সারিতে পারে। মনটা বোধ হয় আস্তে আস্তে সুস্থ হইয়া আসিতেছে, কারণ স্মৃতির উল্লেখ একবারও করিল না। তবু তাহাকে একলা যাইতে দেওয়া উচিত নয়, একলা থাকিলেই তার মন স্মৃতির কাছে ফিরিয়া যাইবে। এদিকে আমার গৃহিণী কিছুকাল যাবৎ বাপের বাড়ি যাইবার জন্য বায়না ধরিয়াছিলেন। শীতের সময় রোগীর সংখ্যাও বেশি নয়। সুতরাং মাসখানেকের জন্য ভ্রমণে বাহির হইবার বিশেষ বাধা নাই।

সাত-আট দিনের মধ্যে গোছগাছ করিয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রেলের প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের মতো এমন আরামের ভ্রমণ আর নাই। ইহার কাছে এরোপ্লেন জেটপ্লেন তুচ্ছ।

দক্ষিণে অনেক প্রসিদ্ধ স্থান দেখিলাম— মহীশূর বাঙ্গালোর উটি। প্রত্যেক স্থানে দুই চারি দিন বাস করিতেছি, আবার চলিতেছি। ভূপতির শরীর দ্রুত সারিয়া উঠিতেছে, মনের উপর হইতেও কালো ছায়াটা সরিয়া যাইতেছে। আশা হইতেছে ভ্রমণের শেষে সুস্থ সহজ মানুষটাকে আবার পাওয়া যাইবে।

বেজওয়াডা হইতে কাজিপেটের লাইনে একটা স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। ভূপতি হঠাৎ নামিয়া পড়িল— "আয়, এখানে যাত্রা ভঙ্গ করা যাক।"

এখানে যাত্রাভঙ্গের কোনও প্রস্তাব ছিল না; কিন্তু ভূপতি পূর্বেও দুই-একবার এরূপ করিয়াছে, অজ্ঞাত অখ্যাত স্থানে নামিয়া পড়িয়াছে। আপত্তি করিলাম না। আমাদের খেয়ালখুশির ভ্রমণ, যেখানে ইচ্ছা নামিয়া পড়িলেই হইল। নেহাত যদি এস্থানে হোটেল বা ধর্মশালা না থাকে তখন রেলের ওয়েটিং রুম আছে।

প্রস্তরফলকে স্টেশনের নাম দেখিলাম— ওরঙ্গল।

শহরটি ছোট, খুব পরিচ্ছন্ন নয়। তবে পাথুরে দেশের শহর পুরনো হইলেও সহজে নোংরা পঙ্কিল হইয়া উঠিতে পায় না। একটি হোটেল আছে, আমরা তাহাতে গিয়া উঠিলাম। হোটেলের দ্বিতল হইতে শহরের পার্বত্য পরিবেশ দেখা যায়। সমস্ত দাক্ষিণাত্য যে একটি বিপুলকায় অধিত্যকা, দক্ষিণে পদার্পণ করা অবধি তাহা ভুলিবার সুযোগ পাই নাই।

আর একটি কথা ভুলিবার উপায় নাই; বাঙালীর সর্বত্র গতি। বাঙালীর 'কুনো' বদনাম আছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অতি নগণ্য অজ্ঞাতনামা স্থানে গিয়া দেখিয়াছি, দুই-একটি বাঙালী বিরাজ করিতেছে, অপরিচিত কণ্ঠে বাংলা ভাষা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি। কেহ চাকরি করিতে আসিয়াছে, কেহ ব্যবসায় উপলক্ষে। বাঙালীর অগম্য স্থান নাই।

ওরঙ্গলেও তাহার ব্যত্যয় হইল না। কোট-প্যান্টলুন পরা জিরাফের মতো একটি লোক হোটেলে বাস করিতেছিলেন, জানা গেল তিনি বাঙালী। তিনি একজন প্রত্নবিৎ, খুব মিশুক লোক নন। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক পাছে তাঁহার আবিষ্কৃত প্রত্নবিষয়ক তত্ত্ব কেহ চুরি করিয়া নিজের নামে ছাপিয়া দেয় তাই তিনি সহজে কাহারও সহিত কথা বলেন না, বলিলেও অতি সন্তর্পণে বলেন; কিন্তু সে যাক্।

বৈকালে আমরা পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলাম। দর্শনীয় বিশেষ কিছু নাই, তবু যখন আসিয়াছি তখন ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা উচিত। অবশেষে একটি মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, গঠন গতানুগতিক নয়। একটি লোককে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম মন্দিরের নাম সহস্রস্তম্ভ মন্দির। অতগুলা না হইলেও অনেকগুলা স্তম্ভ আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, “কতদিনের পুরনো মন্দির?”

লোকটি বলিল, “পৃথিবী সৃষ্টি হবার আগে থেকে আছে।”

খুবই পুরাতন বলিতে হইবে। ভূপতির দিকে চাহিয়া দেখি, সে স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া মন্দির দেখিতেছে, চোখে বিস্ময়াহত অপলক দৃষ্টি।

বলিলাম, “কী হল?”

সে অস্ফুটস্বরে বলিল, “এ মন্দির আমি আগে দেখেছি।”

“অ্যাঁ! কোথায় দেখলি?”

‘তা জানি না— কিন্তু দেখেছি।”

“বোধ হয় ফটো দেখেছিস।”

“ফটো—! কি জানি—।”

যখন ফিরিয়া চলিলাম তখনও তাহার চোখ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

হোটেলে ফিরিয়া চায়ের ঘরে গেলাম। এখানে চা কেহ খায় না, কফির রেওয়াজ। দেখিলাম অদূরে বাঙালী ভদ্রলোকটি নাক সিঁটকাইয়া কফি পান করিতেছেন। আমরা ব্যথার ব্যথী, সহজেই ভাব হইয়া গেল। ভদ্রলোকের নাম সুরেশ পাকড়াশী। আমরা নিজেদের পরিচয় দিলাম। চা ও কফির আপেক্ষিক মহিমা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কতদিন এখানে এসেছেন?”

পাকড়াশী বলিলেন, “তা প্রায় মাসখানেক হতে চলল।”

“কাজে এসেছেন বুঝি?”

“না— হ্যাঁ— না, কাজ এমন কিছু নয়, বেড়াতে এসেছিলাম। শহরটা প্রাচীন— হিন্দু আমলের— আগে নাম ছিল বর্ণকুল, এখন ওরঙ্গলে দাঁড়িয়েছে। ভাবলাম, দেখি যদি কিছু পাওয়া যায়।”

“ও— আপনি প্রত্নবিৎ। কিছু পেলেন?”

ভদ্রলোক হঠাৎ শামুকের মতো অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গেলেন। “কিচ্ছু না” বলিয়া সন্দিগ্ধভাবে তাকাইলেন। তাঁদের বাক্যস্রোতে ভাটা পড়িল; দুই চারবার আমার কথায় হুঁ হাঁ করিয়া এক সময় উঠিয়া গেলেন। তাঁহার বিচিত্র ভাবগতিক তখন বুঝিতে পারি নাই।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া দেখি ভূপতি শয়নঘরের জানালা খুলিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। আমিও উঠিয়া গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলাম। সে বলিল, “দ্যাখ, উটের কুঁজের মতো ঐ পাহাড়টা— ওটা আমি আগে দেখেছি।”

বলিলাম, “আগে দেখেছিস মানে কি? কতদিন আগে?”

সে বলিল, “তা জানি না; কিন্তু— পাহাড়টা আগে আরও বড় ছিল। চেহারা ঠিক আছে, একটু যেন ছোট হয়ে গেছে।”

বলিলাম, “আগে ফটো দেখেছিলি। ছবিটা অবচেতন মনের মধ্যে ছিল, পাহাড় দেখে বেরিয়ে এসেছে। ও রকম হয়।”

ভূপতি কিছু বলিল না, দূরে উটের মতো পাহাড়টার দিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চাহিয়া রহিল।

তারপর ওরঙ্গলে তিন-চার দিন কাটিয়া গেল। আমার মনটা উসখুস করিতে লাগিল। এখানে দ্রষ্টব্য কিছু নাই, দীর্ঘকাল বসিয়া থাকার কোনও অর্থ হয় না; কিন্তু ভূপতির কী হইয়াছে জানি না, সে মোহাক্রান্ত ভাবে এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে এখান হইতে গা তুলিবার কথা বলিলে শুনিতে পায় না। তাহার মনের মধ্যে রহস্যময় একটা কিছু ঘটিতেছে। আমি সবিশেষ নির্ণয় করিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম।

ইতিমধ্যে পাকড়াশী মহাশয়ের সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। তিনি যদিও আমাদের এড়াইয়া চলিতেন, তবু মাঝে মাঝে বাংলা ভাষায় কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না। আমরাও প্রত্নতত্ত্ব

সম্বন্ধে তাঁহার দুর্বলতা বুঝিয়াছিলাম, তাই ও প্রসঙ্গ যথাসাধ্য বাদ দিয়া কথা বলিতাম।

আরও কয়েকদিন নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটিয়া যাইবার পর আমি মরীয়া হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, "ওরঙ্গলে কি মধু পেলি তুই জানি না, কিন্তু আমি আর থাকছি না। একমাস হয়ে গেছে, আমাকে এবার ফিরতেই হবে।"

সমস্তদিন ঝুলোঝুলির পর রাত্রিকালে তাহাকে রাজী করিলাম, পরদিন বিকালের গাড়িতে দুইজন যাত্রা করিব। সে বলিল, "ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু তোর যখন এত তাড়া— চল। আমি কিন্তু আবার আসব।"

পরদিন সকালবেলা চাকর ঘরে চা দিয়া গেল, দুইজনে একত্র বসিয়া পান করিলাম। প্রাতরাশ শেষ করিয়া ভূপতি ইজি-চেয়ার জানালার কাছে টানিয়া লইয়া বসিল। আমি বলিলাম, "চল না স্টেশনে খবর নিয়ে আসি, রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে কিনা।"

সে বলিল, "তুই যা, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।"

আমি বাহির হইলাম। জীবিতাবস্থায় ভূপতির সঙ্গে এই শেষ দেখা। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিলাম, তখনও সে সেই চেয়ারে বসিয়া আছে, মাথাটা পিছন দিকে হেলান দেওয়া। চোখ দুটো বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া আছে। চোখে এবং মুখে কী অনির্বচনীয় বিস্ময়ানন্দ তাহা বর্ণনা করা যায় না। যেন প্রিয়জনকে বহুদিন পরে দেখার শুভ মুহূর্তে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমার মানসিক অবস্থার কথা বলিব না।

ভূপতির অন্ত্যেষ্টি করিলাম। আমি বোধ হয় তাহার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়, কারণ আমার হাতের আগুন তাহার দেহটা ছাই করিয়া দিল। কাহাকেও খবর দিতে পারি নাই, ঘনিষ্ঠ আপনার জন তাহার নাই, শুনিয়াছি এক ভাগিনা উত্তরাধিকারী; কিন্তু ভাগিনার ঠিকানা জানি না।

দেশে ফিরিয়া চলিয়াছি। সঙ্গে চলিয়াছেন পাকড়াশী মহাশয়। বিপদের সময় তিনি দূরত্ব রাখেন নাই, বুক দিয়া পড়িয়া সাহায্য করিয়াছেন। তারপর একসঙ্গে ফিরিতেছি।

ভূপতির মৃত্যু সম্বন্ধে একটা গভীর রহস্য মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমি ডাক্তার, আমি জানি তাহার দেহে এমন কোনও রোগ ছিল না যাহাতে সে হঠাৎ মরিয়া যাইতে পারে। তবে এ কী হইল? স্মৃতির কথা বারবার মনে পড়িতে লাগিল। সে বলিয়াছিল— একশিলা নগরীতে দেখা হবে; কিন্তু—

পাকড়াশী মহাশয় একথা সেকথা বলিয়া আমার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ভাবিয়াছেন আমি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।

হঠাৎ একসময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুরেশবাবু, আপনি পণ্ডিত মানুষ, একশিলা নগরী কোথায় জানেন?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "জানি বৈকি। ওরঙ্গলের প্রাচীন নাম একশিলা।"

'অ্যাঁ— তবে যে সেদিন বলেছিলেন বর্ণকুল!"

"বর্ণকুলও একটা নাম। আর একটা নাম একশিলা। কেন বলুন দেখি?"

কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম, তারপর স্মৃতির মৃত্যুকালীন কাহিনী বলিলাম। এবার পাকড়াশী মহাশয় বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "তাই নাকি! ভারি আশ্চর্য তো! ইতিহাসে পড়েছি দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের জীবনে এই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল। কালানল নামে এক ভারতীয় সাধু—"

তিনি সোৎসাহে বলিয়া চলিলেন, কিন্তু সব কথা আমার কানে পৌঁছিল না। আমি ভাবিতে লাগিলাম— মৃত্যুকালে কি মানুষ ভূত-ভবিষ্যৎ দেখিতে পায়? স্মৃতি অনাগত ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়াছিল? ওরঙ্গলে ভূপতির মৃত্যু হইবে তাহা জানিতে পারিয়াছিল? আবার ওরঙ্গলের প্রাচীন নাম একশিলা তাহাও সে জানিয়াছিল? অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুই দিকেই তাহার মুমূর্ষু প্রাণ প্রসারিত হইয়াছিল? ভূপতির চোখে ওরঙ্গল চেনা চেনা ঠেকিয়াছিল। তবে কি কোনও সুদূর অতীতে ভূপতি ও স্মৃতি একশিলা নগরীর নাগরিক নাগরিকা ছিল?

বুঝি না— কিছু বুঝি না। অগাধ অন্ধকারের মধ্যে খদ্যোতকণার মতো বুদ্ধি-দীপ জ্বালিয়া কেবল বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

৭ ফাল্গুন ১৩৬১

গুহা

একটি গুহার অভ্যন্তর। পিছন দিকে পাথরের গায়ে আঁকাবাঁকা ফাটল রহিয়াছে, উহাই গুহার প্রবেশ-পথ। ফাটল দিয়া দেখা যায় বাহিরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইয়া মেঘ ডাকিতেছে। গুহার ভিতরে মলিন স্যাঁতা আলোয় স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না।

পিছনের ফাটল দিয়া একটি যুবক ও একটি যুবতী ঢুকিয়া পড়িল। তাহাদের কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে। যুবকের হাতে একটি বড় টিফিন-বক্স, যুবতীর কাঁধ হইতে চামড়ার ফিতায় জলের বোতল ঝুলিতেছে।

যুবতী : বাবা— কী বিষ্টি! কী বিষ্টি!

যুবক : দুর্যোগ! আকাশ ভেঙে পড়ছে— বাপ! ভাগ্যিস গুহাটা ছিল—

যুবক হাতের টিফিন-বক্স মাটিতে রাখিল, যুবতী জলের বোতল নামাইল। ইতিমধ্যে পিছনের ফাটল দিয়া তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করিল। বিরাটকায় এক কুলি; মাথার উপর সুটকেস ও বিছানার হোল্ড্ল, হাতে বল্লমের মতো তীক্ষ্নাগ্র একটি লাঠি। সে আসিয়া মোট নামাইল, গামছা দিয়া মুখের ও গায়ের জল মুছিতে মুছিতে ভারি গলায় বলিল—

কুলি : আজ রাত্তিরে বিষ্টি ছাড়বেন না কর্তা।

কুলির চেহারা ভীমদর্শন হইলেও কথা বলিবার ভঙ্গীটি বেশ সরল ও গ্রাম্য—

যুবক : বলিস কি রে! তা হলে উপায়?

কুলি : উপায় আর কি আজ্ঞে, রাত্তিরটা এখানেই কাটাতে হবে।

যুবতী শঙ্কিতভাবে গুহার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল।

যুবক : নাও— বোনের বিয়ে দ্যাখো এবার। এমন হতচ্ছাড়া দেশ তোমার বাপের বাড়ি যে স্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে শহর। স্টেশনে একটা ট্যাক্সি পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

কুলি : আজ্ঞে, টেক্সি পাওয়া যায় কর্তা। আজ রেলগাড়ি দু'ঘণ্টা লেট ছিলেন, তাই টেক্সিওয়ালারা যে-যার ঘরে চলে গিয়েছেন।

যুবক : তখনই বলেছিলুম আজ ওয়েটিংরুমে রাত কাটানো যাক, কিন্তু তুমি বোনের বিয়ে দেখবার জন্যে একেবারে ছিঁড়ে পড়লে।

যুবতী স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, স্বামীর মুখের পানে ভীরু দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—

যুবতী : আমি কি জানতুম রাস্তার মাঝখানে ঝড়-বিষ্টি শুরু হয়ে যাবে? বোনের বিয়েতে এসেছি, বিয়েটাই যদি না দেখতে পেলুম—

যুবক : যাক্ গে, এখন আর ভেবে লাভ কি?— হ্যাঁ রে, বিষ্টি থামবে না তুই ঠিক জানিস?

কুলি : আজ্ঞে, এ সময়ের বিষ্টি একবার আরম্ভ হলে সহজে ছাড়েন না কর্তা, যদি ছাড়েন তো সেই শেষ রাত্তিরের দিকে।

যুবক : তাহলে আর উপায় কি? এ দুর্যোগে বেরুনো যাবে না, বেরুলে হয়তো পথ হারিয়ে বাঘের মুখে পড়ব। হ্যাঁ রে, এ গুহায় বাঘ ভাল্লুক আসে না তো?

কুলি : না কর্তা, বাঘ ভাল্লুক তো জঙ্গলে থাকেন, এখানে আসবেন কি জন্যে! আগে এই গুহায় সায়েব

মেয়েরা আসত চড়ুইভাতি করতে, রাত্তিরে থাকত। ভয়ের কিছু নেই আজ্ঞে। এই দেখেন না ছাই পড়ে রয়েছে, কেউ আগুন জ্বেলেছিল।

যুবকের ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তা কাটিয়া গেল, অনিবার্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

যুবক : তাহলে আমরাও আজ চড়ুইভাতি করি। (স্ত্রীকে) কী বল? বোনের বিয়ে দেখতে পেলে না বটে, কিন্তু একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার তো হল।

যুবতীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

যুবতী : আমার খুব ভাল লাগছে। সঙ্গে খাবার আছে, বিছানা আছে, কোনও কষ্ট হবে না। বরং—

যুবতী স্বামীর মুখের পানে অর্থপূর্ণ সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর বাহুতে হাত রাখিয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—

যুবতী : হ্যাঁ গা, কুলিটাও থাকবে নাকি?

যুবক যুবতীর মনের ভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিল, তারপর কুলিকে প্রশ্ন করিল—

যুবক : তুই কি ঘরে ফিরে যেতে চাস?

কুলি : এই ঝড়-বাদলে কোথায় যাবো কর্তা। এখানেই এক পাশে গামছা পেতে শুয়ে থাকব আজ্ঞে।

যুবক : তা— বেশ।

যুবক যুবতী পরস্পরের পানে চাহিয়া নিরাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করিল। তারপর যুবক গুহার চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—

যুবক : এস, গুহাটা ঘুরে ফিরে দেখা যাক।— বেশ বড় গুহা। হয়তো হাজার হাজার বছর আগে এখানে বর্বর মানুষ বাস করত। কে জানে কেমন ছিল তাদের জীবনযাত্রা—

যুবক যুবতী অসমতল গুহাগাত্রের পাশে পাশে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। কুলিটা দুই হাঁটু তুলিয়া বসিয়া করতলে খৈনি ডলিতে আরম্ভ করিল। বাহিরে একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, বাঘের অন্তর্গূঢ় গর্জনের মতো মেঘ ডাকিল।

যুবতী : ওগো, দ্যাখো দ্যাখো—

যুবক যুবতী পরস্পর হইতে একটু পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, এখন যুবক যুবতীর কাছে গেল।

যুবক : আরে! এ যে একটা পাথরের পাটা, খাসা বিছানা হবে এর ওপর।

যুবতী কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন চক্ষে প্রস্তরপট্ট নিরীক্ষণ করিল।

যুবতী : মনে হচ্ছে যেন এই পাথরের ওপর কতবার শুয়েছি— (বিভ্রান্তভাবে চারিদিকে চাহিয়া) এখন যেন সব চেনা-চেনা লাগছে— তোমার লাগছে না?

যুবক : সে কি, চেনা-চেনা লাগবে কি করে, আগে তো কখনো এখানে আসিনি। তুমি হয়তো ছেলেবেলায় এসেছিলে—

যুবতী : না, এ গুহার কথা আমি জানতুমই না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে— (হঠাৎ) দ্যাখো তো, ঐ দেয়ালের খাঁজে কুলুঙ্গির মতো একটা ফুটো আছে কিনা।

যুবতী অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। যুবক নির্দিষ্টস্থানে গিয়া দেখিল সত্যই দেয়ালের গায়ে একটি গর্ত আছে। সে বিস্মিত মুখে স্ত্রীর দিকে ফিরিল।

যুবক : হ্যাঁ— আছে। তুমি জানলে কি করে?

যুবতী : কি জানি!— কুলুঙ্গির মধ্যে কিছু আছে?

যুবক : (দেখিয়া) কিচ্ছু না—

যুবতী কাছে আসিল।

যুবতী : কিচ্ছু নেই?... কি যেন একটা থাকত ওখানে... মনে করতে পারছি না—

যুবক যুবতীর কাঁধ ধরিয়া নাড়া দিল।

যুবক : কী যা তা বকছ? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

যুবতী এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে কথা বলিতেছিল, এখন যেন তন্দ্রা ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল। চোখের উপর দিয়া হাত চালাইয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল।

যুবতী : না— না— কল্পনা। আজ তো এখানেই থাকতে হবে। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?

যুবক : একটু একটু পেতে আরম্ভ করেছে।

যুবতী : এস, খেয়ে নিই।

দু'জনে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। দেখিল, কুলি দুই হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

যুবক : তুমি খাবার বের কর, আমি ততক্ষণ বিছানাটা পেতে ফেলি।

হোল্‌ড্‌ল তুলিয়া লইয়া যুবক প্রস্তরপট্টের দিকে চলিয়া গেল, যুবতী টিফিন-বক্স খুলিয়া খাবার বাহির করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যুবক বিছানা পাতিয়া ফিরিয়া আসিল। যুবতী তাহার হাতে টিফিন-বক্সের একটি বাটি দিল। যুবক খাবার মুখে তুলিতে গিয়া নিম্নস্বরে বলিল—

যুবক : কুলোবে তো?

যুবতী : কুলোবে।

যুবতী একটি বাটি হাতে কুলির কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

যুবতী : শুনছ? একটু খেয়ে নাও—

কুলি হাঁটু হইতে মুখ তুলিয়া আরক্ত চক্ষে যুবতীর পানে চাহিল। যুবতী হঠাৎ ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল। কুলি হাত বাড়াইল, যুবতী বাটি মাটিতে রাখিয়া পিছনে সরিয়া গেল। কুলি বাটি টানিয়া লইয়া খাদ্যদ্রব্যগুলি নিরীক্ষণ করিল, তারপর খাইতে আরম্ভ করিল।

যুবতী ফিরিয়া গিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইল এবং শঙ্কিত চক্ষে কুলির দিকে চাহিয়া রহিল। যুবক আহার করিতে করিতে প্রশ্ন করিল—

যুবক : কী দেখছ?

যুবতী : (চুপিচুপি) কিছু নয়... লোকটা এমনভাবে আমার পানে তাকালো যে আমার বুক কেঁপে উঠল। হ্যাঁগা, লোকটা ভাল তো? যদি রাত্তিরে—

যুবক : কোনও ভয় নেই, আমার সঙ্গে পিস্তল আছে।— তুমি খেয়ে নাও।

দুইজন বাটি হাতে লইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে আহার করিল। যুবতীর উদ্বিগ্ন চক্ষু কিন্তু বারংবার কুলির দিকে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। কুলির বাটিতে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মাংসের হাড় ছিল, সে সেই হাড় মুঠিতে ধরিয়া অনেকক্ষণ চিবাইল। তাহার হাড় চিবাইবার ভঙ্গিতে যেন একটা বন্য ভাব রহিয়াছে।

ক্রমে আহার শেষ হইল। যুবক বোতল হইতে জল ঢালিয়া যুবতীকে দিল, নিজে পান করিল। তারপর কুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

যুবক : তুমি জল খাবে?

কুলি : না খেলেও চলে। যদি থাকে, দেন একটু।

যুবক কুলির অঞ্জলিতে জল ঢালিয়া দিল, কুলি পান করিল। পান করিতে করিতে সে চোখ তুলিয়া যুবকের পানে চাহিতে লাগিল। দু'জনের চোখেই উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা। শেষে কুলি মুখ মুছিয়া বলিল—

কুলি : এবার আপনারা শুয়ে পড়ুন আজ্ঞে। কোনও ভয় নেই, আমার সঙ্গে বরছা আছে। আমি গুহার মুখ আগ্‌লে শুয়ে থাকব।

যুবক : তোমারও কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে পিস্তল আছে— এই দ্যাখো।

যুবক পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইল।

কুলি : আজ্ঞে, ওটা কী কর্তা?

যুবক : পিস্তল— ছোট বন্দুক। ফায়ার করব— দেখবে?

যুবক পিস্তল ঊর্ধ্বদিকে ফায়ার করিল। গুহার মধ্যে প্রতিহত শব্দ ভীষণ শুনাইল।

কুলি : ওরে ব্বাস্ রে!

কুলি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পিছু হটিতে হটিতে গুহার মুখের দিকে চলিয়া গেল এবং সেখানে গামছা পাতিয়া শয়নের উপক্রম করিল।

যুবক তখন যুবতীর পানে চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসিল, তারপর সুটকেস তুলিয়া সেই প্রস্তরপট্টের অভিমুখে গেল। জলের বোতল ও টিফিন-বক্সের বাটিগুলি লইয়া যুবতী তাহার পিছনে গেল। দুইজনে প্রস্তরপট্টের পাশে বসিল।

যুবক : (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়া যাক্।

যুবক কোট খুলিতে খুলিতে গুহার ঊর্ধ্বদিকে ইতস্তত তাকাইতে লাগিল, যুবতী নিজের খোঁপাটিকে কাঁটা দিয়া শক্ত করিয়া আঁটিতে প্রবৃত্ত হইল। যুবক যুবতীর দিকে দৃষ্টি নামাইল, তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল —

যুবক : বেশ নতুন নতুন লাগছে— না?

যুবতী : না।

যুবক একটু বিস্মিতভাবে চাহিল।

যুবক : নতুন লাগছে না?

যুবতী : ভাল লাগছে, কিন্তু নতুন লাগছে না। মনে হচ্ছে এই পাথরের ওপর আমরা দু'জনে কতবার শুয়েছি—

যুবক : তোমার মাথা গরম হয়েছে। নাও, শুয়ে পড়।

যুবকের মুখে কিন্তু বিস্ময়ের সহিত উদ্বেগ মিশ্রিত হইয়া রহিল।

গুহার মধ্যে আলো ক্রমশ কমিতে লাগিল, তারপর গাঢ় অন্ধকারে সব ঢাকা পড়িয়া গেল। কেবল গুহার প্রবেশপথের ফাটল দিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুচ্চমকের প্রভাব স্ফুরিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ধীরে ধীরে গুহার মধ্যে আলো ফুটিতে আরম্ভ করিল। আলো স্পষ্ট হইলে দেখা গেল, গুহা ঠিক তেমনি আছে; কেবল বিছানা সুটকেস প্রভৃতি আধুনিক জিনিসপত্র অন্তর্হিত হইয়াছে। গুহার মধ্যস্থলে খানিকটা ভস্ম পড়িয়া আছে, যুবতী নতজানু হইয়া অঙ্গার-গর্ভ ভস্মের উপর শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে ফুঁ দিতেছে। যুবতীর পরিধানে হাঁটু হইতে কাঁধ পর্যন্ত পশুচর্ম, মাথায় একমাথা জটিল রুক্ষ চুল। গুহায় আর কেহ নাই, পিছনের ফাটল দিয়া বাহিরের উজ্জ্বল দিবালোক দেখা যাইতেছে।

যুবতীর ফুৎকারে আগুন জ্বলিল। সে তখন উঠিয়া কুলুঙ্গির কাছে গেল। এই কুলুঙ্গি তাহার ভাঁড়ার, তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া একটি মুষলাকৃতি আস্ত হরিণের রাং বাহির করিয়া আনিল এবং আগুনের উপর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সেটি ঝল্সাইতে লাগিল। মাংস ঝল্সাইতে ঝল্সাইতে সে মাঝে মাঝে তাহা আঘ্রাণ করিয়া দেখিতে লাগিল এবং উৎসুক চক্ষে বারবার ফাটলের দিকে চাহিতে লাগিল। যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে।

গুহার বাহির হইতে দূরাগত মনুষ্যকণ্ঠের আওয়াজ আসিল— 'কুউ—উ—'

যুবতী তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া উত্তর দিল—

যুবতী : 'কুউ— উ—'

কিছুক্ষণ পরে ফাটলের ভিতর দিয়া যুবক প্রবেশ করিল, পরিধানে মৃগচর্ম, হাতে তীরধনুক, চক্ষে ভয়ার্ত

উত্তেজনা। আগুনের কাছে আসিয়া তীরধনুক ফেলিয়া হাঁপাইতে লাগিল। বহুদূর ছুটিয়া আসিয়াছে।

যুবতীর হাত হইতে অর্ধদগ্ধ রাং পড়িয়া গেল।

যুবতী : কি— কী হয়েছে?

যুবক : (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) ভিল্লা জানতে পেরেছে।

যুবতী : (সংহতস্বরে) জানতে পেরেছে!

যুবক : হ্যাঁ, আমরা কোথায় লুকিয়ে আছি জানতে পেরেছে, আমাদের গুহার সন্ধান পেয়েছে—

যুবতীর মুখ হইতে একটা অবরুদ্ধ কাকুতি বাহির হইল, সে যেন তাহা রোধ করিবার জন্যই বাঁ হাতের কব্জি তীক্ষ্নদন্তে কামড়াইয়া ধরিল।

যুবক : (অসংলগ্নভাবে) বনের মধ্যে শিকার পেয়েছিলাম— একটা হরিণের পিছু নিয়েছিলাম— কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখলাম ভিল্লাও হরিণটার পিছু নিয়েছে— ভিল্লার হাতে ছিল শুধু বর্শা— আমি তাকে দেখবার আগেই সে আমাকে দেখেছিল— বর্শার পাল্লার বাইরে ছিলাম তাই মারতে পারেনি— আমি তাকে যেই দেখতে পেয়েছি অমনি সে হা হা করে হেসে উঠল— হরিণটা পালিয়ে গেল—

যুবতী : তারপর?

যুবক : ভিল্লা হেসে বললে— 'আর তুই যাবি কোথায়, আমার তিন্নিকে চুরি করে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস আমি জানতে পেরেছি, এবার তোকে কুচি কুচি করে কাটব।' আমি ধনুকে তীর পরালাম, অমনি ভিল্লা একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। আমি তখন ছুটে চলে এলাম।

যুবতী : (কাঁদিয়া উঠিয়া) কী হবে— কী হবে! ভিল্লা ভয়ানক কুচুটে, সে তোকে মেরে ফেলবে— তার গায়ে ভীষণ জোর—

যুবক তীরধনুক তুলিয়া লইল, তাহার চক্ষু হিংস্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল।

যুবক : ভিল্লা যদি আমার গুহায় আসে আমি তাকে তীর দিয়ে বিঁধে মেরে ফেলব।

যুবতী : তাকে মারতে পারবি না— সে কুচুটে— ভয়ানক ফন্দিবাজ— তার গায়ে গণ্ডারের মতো জোর — আমি জানি তুই তাকে মারতে পারবি না—

যুবতী মাটিতে বসিয়া পড়িল, সম্মুখে ও পিছনে দুলিতে দুলিতে সুর করিয়া বলিতে লাগিল—

যুবতী : আমি জঙ্গলের মেয়ে, নিজের জাতের মধ্যে জঙ্গলে ছিলাম— ভিল্লা ছিল সর্দারের ছেলে— সে আমাকে চাইত, ভাল্লুক মেরে আমাকে চামড়া এনে দিত— আমার তাকে ভাল লাগত না— তুই ভিনজাতের মানুষ, তোকে ভাল লাগ্‌ল— তোর সঙ্গে তোর গুহায় পালিয়ে এলাম!— এখন কী হবে— ভিল্লা তোকে মেরে ফেলবে— সে বড় হিংসুক—

সহসা যুবতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যুবকের বাহু দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—

যুবতী : চল আমরা পালিয়ে যাই, গুহা ছেড়ে পালিয়ে যাই, তাহলে ভিল্লা আমাদের খুঁজে পাবে না—

যুবক : (গর্জিয়া উঠিল), না, আমার গুহা আমি ছাড়ব না— ভিল্লাকে আমার গুহা দেব না—

এই সময় বাহিরে একটা বিকট শব্দ হইল। যুবক যুবতী ক্ষণকাল স্তব্ধ একাগ্রভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আবার বিকট শব্দ হইল। যুবতী উত্তেজিত নিম্নস্বরে বলিল—

যুবতী : ভাল্লুক! ভাল্লুক ডাকছে। বোধ হয় পোড়া মাংসের গন্ধ পেয়ে এদিকে আসছে—

যুবক ত্বরিতে তীরধনুক তুলিয়া লইল।

যুবতী: তীরধনুক নিয়ে ভাল্লুক মারতে পারবি না। দাঁড়া, আমি ভাল্লুক তাড়াচ্ছি। আগুন দেখলেই পালাবে।

যুবতী একখণ্ড ধূমায়িত কাঠ তুলিয়া মশালের মতো ঊর্ধ্বে ধরিয়া ফাটলের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। যুবক ধনুকে তীর সংযোগ করিয়া শক্ত সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবতী ফাটল দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তাহার কণ্ঠের তীব্র মর্মান্তিক চিৎকার শোনা গেল। যুবক ধনুর্বাণ হাতে ফাটলের দিকে ছুটিল, তারপর থমকিয়া দাঁড়াইল।

ফাটলের ভিতর দিয়া যুবতী আসিতেছে, তাহার পিছনে ভাল্লুকের মতো কালো রোমশ একটা জীব। যুবতীর দুই হাত ভীতভাবে সম্মুখে প্রসারিত; ওষ্ঠাধর চিৎকারের ভঙ্গিতে উন্মুক্ত, কিন্তু কণ্ঠ দিয়া চিৎকার বাহির হইতেছে না।

যুবক : (চমকিয়া) ভিল্লা!

যুবতীর পিছনে ভাল্লুকের চামড়া পরিয়া আসিতেছিল ভিল্লা। সে বিকট অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

ভিল্লা : হ্যাঁ, ভাল্লুক নয়— আমি ভিল্লা। তীরধনুক ফেলে দে, নইলে তিন্নিকে বরছা বিঁধে মেরে ফেল্‌বে।

যুবক : ভিল্লা, ছেড়ে দে— আমার তিন্নিকে ছেড়ে দে—

ভিল্লা : তুই আগে তীরধনুক ফেলে দে।

যুবক তীরধনুক ফেলিয়া দিতেই ভিল্লা যুবতীকে সজোরে সামনে ঠেলিয়া দিল। যুবতী কয়েক পা আসিয়া হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে ভিল্লা হাতের বল্লম ছুঁড়িয়া যুবককে মারিল। যুবক আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।

এতক্ষণে ভিল্লাকে দেখা গেল। সে আর কেহ নয়, পূর্বে যাহাকে কুলিরূপে দেখা গিয়াছিল সেই ভীষণাকৃতি লোকটা। সে এখন ভল্লবিদ্ধ যুবকের বুকের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাহার মাথাটা বারবার মাটিতে ঠুকিতে লাগিল।

যুবতী ছুটিয়া আসিয়া পিছন হইতে ভিল্লার চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে উন্মত্তার মতো বলিল—

যুবতী : ছেড়ে দে— ওকে ছেড়ে দে— রাক্ষস—

ভিল্লা উঠিয়া যুবতীর হাত পা চাপিয়া ধরিল, তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া উল্লসিত স্বরে বলিল—

ভিল্লা: মরে গেছে ওকে মেরে ফেলেছি। এখন তুই আমার— আমার—

যুবতী হাত ছাড়াইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। ভিল্লা তাহাকে আগুনের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। আগুনের পাশে অর্ধদগ্ধ অস্থি-মাংস পড়িয়াছিল, সে তাহা বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া মহানন্দে হা হা হাস্য করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। যুবতী হাত ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টায় ফুঁপাইতে লাগিল—

যুবতী : ছেড়ে দে রাক্ষস! ছেড়ে দে আমায়—

ভিল্লা তাহার আকুতি গ্রাহ্য করিল না, বিজয়দীপ্ত চক্ষে গুহার চারিদিকে চাহিল, মাংসে কামড় দিয়া পরিপূর্ণ মুখে বলিল—

ভিল্লা : এ গুহা আমার— তুই আমার— (যুবকের মৃতদেহ দেখাইয়া) ওকে গুহার মুখের কাছে পুঁতে রাখব— ও যক্ষি হয়ে আমার গুহা পাহারা দেবে।

ভিল্লা ভুক্তাবশিষ্ট মাংস যুবতীর মুখের কাছে ধরিয়া বলিল—

ভিল্লা : নে— খা—

যুবতী : (সতেজে) খাব না।

ভিল্লা হাড়সুদ্ধ মাংস যুবতীর মুখে গুঁজিয়া দিয়া ক্রুদ্ধ গর্জনে বলিল—

ভিল্লা : খা— খেতে হবে। আজ থেকে তুই আমার— তোকে আমার এঁটো খেতে হবে। কী খাবি না?

ভিল্লা মুগুরের মতো অস্থিখণ্ড দিয়া যুবতীর মাথায় প্রহার করিল, যুবতী মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। ভিল্লা অস্থিখণ্ড ফেলিয়া দিয়া আরক্ত চক্ষে মূর্ছিতা যুবতীর পানে চাহিয়া রহিল—

ভিল্লা : আজ খাবি না কাল খাবি না। না খেয়ে তুই যাবি কোথায়! তুই আমার— একবার পালিয়েছিলি, আর পালাতে দেব না।

যুবকের দিকে ফিরিয়া সে তাহার দেহ হইতে বর্শা টানিয়া বাহির করিয়া লইল, কিছুক্ষণ তৃপ্তিপূর্ণ চক্ষে

তাহাকে নিরীক্ষণ করিল—

ভিল্লা : তোকে পুঁতবো– তুই আমার গুহা পাহারা দিবি—

ভিল্লা নতজানু হইল, ভল্লের অগ্রভাগ দিয়া মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করিল...

আবার গুহার আলো ক্ষীণ হইয়া সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে যুবতীর কণ্ঠের তীব্র চিৎকার শোনা গেল— তারপর দ্রুত আলো ফুটিয়া উঠিল।

দেখা গেল গুহা আবার বর্তমান কালে ফিরিয়া আসিয়াছে, প্রস্তরপট্টের শয্যায় যুবতী আলুথালুভাবে উঠিয়া বসিয়া যুবকের পা ঠেলিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানে ভিল্লা মাটি খুঁড়িতেছিল সেখানে কুলি বল্লম দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে। মানুষগুলির বেশবাস পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান কালের বেশবাসে পরিণত হইয়াছে।

যুবতী : ওগো— ওগো—

যুবক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

যুবক : কে?— কী— ভিল্লা কোথায়?

যুবতী : অ্যাঁ! তুমিও স্বপ্ন দেখেছ?

দুইজনে ব্যাকুলভাবে পরস্পরের পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর যুবক শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; পিস্তলটা বিছানা হইতে তুলিয়া পকেটে রাখিল, বলিল—

যুবক : স্বপ্ন!— ভিল্লা কোথায় গেল?

যুবতী কুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শিথিল দেহে আবার শুইয়া পড়িল। যুবক দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, কুলি তাহাদের দিকে পিছন করিয়া বল্লম দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে। যুবক বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কুলির পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

যুবক : এই! কি করছিস?

কুলি বল্লম ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তন্দ্রাবিষ্ট চোখে যুবকের পানে চাহিয়া রহিল। যুবক তাহার গায়ে একটা মৃদু রকমের ঠেলা দিল।

যুবক : কি করছিস? মাটি খুঁড়ছিস কেন?

কুলি যেন চমকিয়া তন্দ্রাবেশ হইতে জাগিয়া উঠিল, চকিতে চারিদিকে চাহিয়া স্খলিতস্বরে বলিল—

কুলি : অ্যাঁ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আজ্ঞে—

যুবক : মাটি খুঁড়ছিলি কেন? মাটির তলায় কি আছে?

কুলি : (মাথা চুলকাইয়া) তা তো জানিনে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি যেন স্বপ্ন দেখলাম আজ্ঞে—

যুবক : তুইও স্বপ্ন দেখেছিস? বেশ, তবে খোঁড়্।

কুলি : খুঁড়ব?

যুবক : হ্যাঁ খোঁড়্। হয়তো কিছু আছে।

কুলি : আজ্ঞে।

কুলি আবার খুঁড়িতে আরম্ভ করিল, যুবক কিছু দূরে সরিয়া আসিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ কুলি ভীতভাবে বল্লম ফেলিয়া পিছু সরিয়া আসিল—

কুলি : ওরে বাব্বা!

যুবক : কী হল?

কুলি : ওখানে কি একটা রয়েছেন!

যুবক : কী রয়েছে?

কুলি : আজ্ঞে, মড়ার মাথা। আপনি দেখেন না কর্তা— মড়ার খুলি। ওরে ব্বাবারে!

যুবক গর্তের কাছে গিয়া বল্লমের চাড় দিয়া একটা নর করোটি বাহির করিল। করোটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া সে একদৃষ্টে তাহা দেখিতে লাগিল।

যুবক : কার করোটি... আমার?

কুলি : (কাছে আসিয়া) মড়ার খুলি এত কী দেখতেছেন কর্তা?

যুবকের হাত হইতে খুলিটা পড়িয়া গেল, সে কুলির দিকে প্রজ্বলিত চক্ষে চাহিল, তারপর পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া পাশব কণ্ঠে গর্জিয়া উঠিল—

যুবক : ভিল্লা! এই নে— মর্!

যুবক পিস্তল ছুঁড়িল, কুলি পড়িয়া গেল। যুবক কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর নত হইয়া কুলিকে দেখিল।

যুবক : মরে গেছে।— এ কি করলাম— এ কি করলাম!

৩১ শ্রাবণ ১৩৬২

শূন্য শুধু শূন্য নয়

বাংলা দেশের নরম মাটি শেষ হইয়া যেখানে ছোটনাগপুরের পাথুরে কঠিনতা আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে একটি ছোট রেলের স্টেশন। স্টেশন ঘিরিয়া দুই-চারিটি লোকালয়। বেশির ভাগ ট্রেন এখানে থামে না, হুইস্‌ল্‌ বাজাইয়া টিটকারি দিতে দিতে চলিয়া যায়। দুই-একটা অতি-মন্থর যাত্রী ট্রেন থামে। আর মালগাড়ি থামে।

স্থানটির পরিবেশ অতিশয় নিঝুম। যে দুই-চারিটি মানুষ এখানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাহাদের প্রকৃতিও নিঝুম। লোকগুলিকে দেখিলে মনে হয় তাহারা এইমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছে কিংবা এখনই ঘুমাইয়া পড়িবে। স্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে একটি ছোট্ট নিস্তরঙ্গ নদী আছে; সেটিও যেন ঘুমের ঘোরে চলিতে চলিতে উপলশয্যার উপর ঝিমাইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব বা পশ্চিম হইতে ট্রেন আসিয়া স্টেশনে থামিলে কদাচিৎ দুই-একটি গ্রাম্য যাত্রী মোটঘাট লইয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করে, তারপর মোটঘাট মাথায় তুলিয়া দিগন্তে বিলীন হইয়া যায়। স্টেশন হইতে যে পথটি অসমতল দিগন্তের পানে চলিয়া গিয়াছে, সেটির কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, এই পথে কিছুদূর চলিলেই দেখা যাইবে, পাথরের কোন এক ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়া পথটি পাহাড়ী ময়াল সাপের মতো কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

ঘুম-নগরীর রাজকুমারীর দেশ। কেবল রাজকুমারীর সন্ধান কেউ জানে না।

একদা চৈত্র মাসের অপরাহ্নে পুব দিক হইতে একটি অতি-মন্থর যাত্রী-গাড়ি আসিয়া স্টেশনে থামিল। একটি মাত্র যাত্রী গাড়ি হইতে নামিল। ভদ্রশ্রেণীর বাঙালী যুবক; সঙ্গে অনেক লটবহর— একটা তোরঙ্গ, দুইটা কাঠের বাক্স, দুইটা পরিপুষ্ট চটের বোরা, একটা স্থূল হোল্‌ড-অল্‌, একটি ইক্‌মিক্‌ কুকার। গাড়ির অন্য যাত্রীদের সাহায্যে মালগুলি নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ফোঁস ফোঁস শব্দে অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

যুবকের চেহারা শৌখীন গোছের। লম্বা রোগা গড়ন, মাথার চুল ঢেউ খেলানো, কানের মূল পর্যন্ত জুল্‌পি নামিয়া আসিয়াছে, পাতলা গোঁফ; চোখে ধোঁয়াটে কাচের চশমা। বয়স আন্দাজ তেইশ-চব্বিশ।

যুবক এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন সে স্টেশন মাস্টারের প্রকোষ্ঠের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

স্টেশন মাস্টার মধ্যবয়স্ক হিন্দুস্থানী; ট্রেন পাশ করিয়া দিয়া তিনি ইজি-চেয়ারে লম্বা হইয়া আর এক প্রস্থ ঝিমাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, যুবককে দেখিয়া খাড়া হইয়া বসিলেন এবং চোখে চশমা পরিলেন। মোটা কাচের ভিতর দিয়া তাঁহার চোখের বিস্ময় আরও বিবর্ধিত আকারে দেখা দিল। এ স্টেশনে এই শ্রেণীর যাত্রী তিনি বেশি দেখেন নাই।

যুবক বলিল, 'স্টেশনে কুলি দেখছি না। কুলি কোথায়?'

স্টেশন মাস্টার উঠিয়া আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন এবং আরও কিছুক্ষণ বিবর্ধিত নেত্রে যুবককে নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু যুবকের প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন না; কারণ উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, স্টেশনের একমাত্র কুলি স্টেশন মাস্টারের হুকুমে অদূরবর্তী তালগাছে চড়িয়া তাড়ির ভাঁড় পাড়িতে গিয়াছে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

যুবক বলিল, 'কাছেই বাজ-পড়া বাংলা আছে— সেইখানে।'

স্টেশন মাস্টারের নয়ন বিস্ফার এবার চশমার কাচকে ছাড়াইয়া গেল। তিনি কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'বাজ-পড়া বাংলা! মোহনলাল শেঠের কুঠি! সেখানে তো কেউ নেই। তালা লাগানো।'

যুবক পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া বলিল, 'এই যে বাড়ির চাবি। মোহনলাল আমার বন্ধু, আমাকে তাঁর বাংলায় থাকতে দিয়েছেন।'

'ও— তা—' স্টেশন মাস্টারের গলায় হঠাৎ যেন ব্যাঙ ডাকিয়া উঠিল, 'আপনি ওখানে থাকবেন?'

যুবক ভ্রূ তুলিল, 'থাকব না কেন?'

স্টেশন মাস্টার ঘরের বাহিরে আসিলেন, সন্তর্পণে প্ল্যাট্‌ফর্মের চারিদিকে চাহিলেন, তারপর ষড়যন্ত্রকারীর মতো গাঢ় নিম্নস্বরে বলিলেন, 'ও বাংলায় যাবেন না।'

'সে কি! কেন?'

'ও বাংলায় দেও আছে।'

যুবকের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল— 'দেও! মানে— ভূত?'

স্টেশন মাস্টার ঘাড় নাড়িয়া সশঙ্ক সম্মতি জানাইলেন। যুবক হাসিয়া উঠিল— 'ভালই হল, একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে।'

স্টেশন মাস্টার এবার গম্ভীর হইয়া গেলেন।

যে অর্বাচীন ভূত-প্রেত লইয়া তামাসা করে, তাহাকে সদুপদেশ দিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'আপনার টিকিট?'

যুবক টিকিট বাহির করিয়া দিল।

স্টেশন মাস্টার টিকিট পরীক্ষা করিলেন, তারপর টিকিট পকেটে রাখিয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'কুলি জরুরি কাজে বাইরে গেছে। আপনার যদি মুটে দরকার থাকে, স্টেশনের বাইরে যান। সামনেই মুদির দোকান আছে, সেখানে লোক পাবেন।'

যুবক বাহিরে গিয়া মুদির দোকান পাইল। দোকানটি একাধারে মুদির এবং ময়রার দোকান। এক দিকে চাল ডাল মশলা, অন্য দিকে লাড্ডু মিঠাই পকৌড়ি। ময়রা দোকানে বসিয়া পকৌড়ি ভাজিতেছিল এবং দুইজন অন্তরঙ্গের সঙ্গে স্তিমিত কণ্ঠে আলাপ করিতেছিল, যুবককে দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিল। তারপর যুবকের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাদের একেবারে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। ভূতের বাড়িতে মানুষ থাকিবে, এত বড় বুকের পাটা!

যা হোক, মোট বহনের প্রস্তাবে মুদি আপত্তি করিল না, বরং এক টাকা মজুরির লোভে সবান্ধবে প্ল্যাট্‌ফর্মে আসিয়া মোট মাথায় তুলিয়া লইল।

যুবক লক্ষ্য করিল, বাজ-পড়া বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার পূর্বে মুদি নিজের দোকান হইতে কিছু মিষ্টান্ন ও তেলেভাজা পুঁটুলি করিয়া বাঁধিয়া লইল।

যুবক মোটবাহীদের সঙ্গে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'সঙ্গে খাবার নিলে যে! বাজ-পড়া বাড়ি কি অনেক দূর?'

মুদি বলিল, 'জি, না— কাছেই। খাবার নিলাম দেওকে চড়াব বলে।'

যুবক বলিল, 'ও— ভূতকে খেতে দেবে। খাসা ভূত তো, পিণ্ডি খায় না, তেলেভাজা খায়!'

'জি। আমরা সবাই পালা করে ভোগ দিই।'

'ভোগ না দিলে কী হয়?'

'তা কি বলা যায় হুজুর! ঘরে আগুন লেগে যেতে পারে।'

মুদির একজন সাথী বলিল, 'ভূত আজ পর্যন্ত কারুর ঘরে আগুন লাগায়নি হুজুর, কিন্তু একদিন খাবার না

পেলেই কারুর না কারুর ঘরে ঢুকে খাবার খেয়ে যায়, ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করে। তাই আমরা ব্যবস্থা করেছি, যার যেদিন পালা সে সেদিন মুদিভাইকে চার পয়সা দেয়, মুদিভাই দেওকে খাবার দিয়ে আসে।'

'হুঁ। ভূতকে তোমরা কেউ দেখেছ?'

'গোড়ার দিকে কেউ কেউ ছায়ামূর্তি দেখেছিল, এখন আর দেখা যায় না।'

'ভূত বাজ-পড়া বাড়িতে থাকে জানলে কি করে?'

'বাড়িতে বাজ পড়ার কিছুদিন পর থেকেই ভূতের আবির্ভাব হয়েছে, আজ দশ বছরের কথা। যারা বজ্রাঘাতে মরেছিল তাদেরই একজন ভূত হয়ে আছে।'

২

বাজ-পড়া বাড়ির একটু ইতিহাস আছে। পনের-ষোল বছর আগে মদন শেঠ নামক একজন ধনী ব্যবসাদার অর্থোপার্জনের ক্লান্তি বিনোদনের জন্য নিভৃত স্থানে এই বাড়ি করিয়াছিলেন; তিনি বছরে দুই-একবার আসিয়া বাড়িতে বাস করিতেন; বাড়ি খালি থাকিলে তাঁহার ব্যবসায়ের অংশীদার নিধিরাজ মল্লিকও মাঝে-মধ্যে আসিতেন। একবার বছর দশেক আগে নিধিরাজ আসিয়া এখানে বাস করিতেছিলেন, সঙ্গে স্ত্রী ও অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যা ছিল। গ্রীষ্মকাল, একদিন কালবৈশাখীর ঝড় দেখা দিল। ঝড় থামিলে দেখা গেল, বাড়ির মাথায় বজ্রপাত হইয়াছে; নিধিরাজ মল্লিক ও তাঁহার পরিবারের কেহই জীবিত নাই। খবর পাইয়া বাড়ির মালিক মদন শেঠ যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন অধিকাংশ মড়া শৃগালে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। মদন শেঠ সেই যে বাড়িতে তালা লাগাইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, আর বাড়িতে পদার্পণ করেন নাই। তারপর মদন শেঠের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার পুত্র মোহনলাল এখন বাড়ির মালিক। সেও এ পর্যন্ত বাড়িতে পদার্পণ করে নাই। কেবল বন্ধুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে বাড়িতে থাকিতে দিয়াছে। আমাদের পরিচিত যুবকই সেই বন্ধু।

এই সূত্রে যুবকের অজ্ঞাতবাসের ইতিহাস এখানে বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যুবকের নাম গৌরমোহন সাহা। বড় মানুষ ব্যবসাদারের একমাত্র সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও সে যখন ছবি আঁকিতে শুরু করিল, তখন তাহার পিতৃদেব মনের দুঃখে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। বাড়িতে রহিল গৌরমোহন ও তাহার বিমাতা শশিমুখী। শশিমুখী বিমাতা হইলেও গৌরমোহনকে ভালবাসিতেন, তাহার নিজের পুত্রকন্যা ছিল না। তিনি তাহাকে পৈতৃক ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে ছবি আঁকিতে লাগিল। ছেলের ইহকাল পরকাল নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া শশিমুখী তাহার বিবাহের আয়োজন করিলেন; কারণ পুরুষের মন সংসারধর্মে আকৃষ্ট করার পক্ষে বিবাহই সর্বোৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ। শশিমুখী তাঁহার ভগিনীর দেবরের কন্যার সহিত সম্বন্ধ করিলেন; কিন্তু গৌরমোহন তপোভঙ্গের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া একাগ্রমনে ছবি আঁকিয়া চলিল। সে বর্তমান যুগের অনৈসর্গিক শৈলীর চিত্রকর, মনের ছবি আঁকে, স্রেফ রঙ দিয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর রূপদান করে। তাহাকে স্থূল পিশিতপিণ্ড দিয়া প্রলুব্ধ করা সহজ নয়।

শশিমুখী কিন্তু হাল ছাড়িবার পাত্রী নয়। কন্যার রূপযৌবনের সাড়ম্বর বর্ণনা শুনিয়া যখন গৌরমোহন ঘামিল না, কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াও যখন সে অটল রহিল, তখন শশিমুখী যুক্তিতর্কের পথ ছাড়িয়া সবলতর পন্থা অবলম্বন করিলেন।

একদিন গৌরমোহনকে বলিলেন, 'পরশু, রবিবারে ওরা তোমাকে আশীর্বাদ করতে আসবে। সব ঠিক হয়ে গেছে, আর দেরি করা চলবে না।'

নোটিস নয়, সমন নয়, একেবারে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। গৌরমোহনের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কিন্তু সে মায়ের সঙ্গে কখনও তর্ক করে না, তাঁহার কথার অবাধ্য হইবার মতো রূঢ়তাও তাহার চরিত্রে নাই।

একান্ত অসহায় ভাবে সে ছুটিয়া গেল তাহার প্রাণের বন্ধু মোহনলালের কাছে। মোহনলাল গৌরমোহনের সমবয়স্ক হইলেও বিবাহিত এবং বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন যুবা। সে গৌরমোহনকে সৎ পরামর্শ দিল; বুঝাইয়া দিল যে পলায়ন করিলে মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় না। কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করিলেই মাতৃদেবী ধাতস্থ হইবেন।

অতঃপর গৌরমোহন আর নিজের বাড়িতে ফিরিয়া যায় নাই, বাজ-পড়া বাড়ির চাবি লইয়া অজ্ঞাতবাসে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য বাড়িটার যে ভৌতিক দুর্নাম আছে, তাহা সে পূর্বাহ্ণে জানিতে পারে নাই; পারিলেও বোধ করি সঙ্কল্পচ্যুতি হইত না।...

পনের মিনিট পরে লটবহর লইয়া গৌরমোহন বাজ-পড়া বাড়ির সম্মুখীন হইল। জীর্ণ-স্খলিত পাঁচিল-ঘেরা বিঘাখানেক স্থান শুষ্ক আগাছায় ভরা, তাহার মাঝখানে ছোটখাটো একতলা একটি বাড়ি। প্রবেশ-পথের ফটক অদৃশ্য হইয়াছে; কেবল থাম দুটা দাঁড়াইয়া আছে। থামের দুই পাশের ঝাঁকড়া দুটা পাকুড় গাছ প্রবেশ-পথের উপর তোরণ রচনা করিয়াছে; এই তোরণের ভিতর দিয়া ত্রিশ-চল্লিশ গজ পিছনে বাড়িটি দেখা যায়।

ফটকে প্রবেশ করিবার পূর্বে মুদি খাবারের পুঁটুলি পাকুড় গাছের ডালে টাঙাইয়া দিল। গৌরমোহন বলিল, 'ভূত বুঝি ঐ গাছে বসে খানাপিনা করে?'

মুদি উত্তর দিল না। ভূতের আস্তানায় দাঁড়াইয়া ঠাট্টা ইয়ার্কি করা তাহার নিরাপদ মনে হইল না।

অতঃপর বাড়ির দিকে চলিতে চলিতে গৌরমোহন লক্ষ্য করিল, ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ি পর্যন্ত আগাছার ভিতর দিয়া অস্পষ্ট একটি পায়ে-হাঁটা পথের চিহ্ন গিয়াছে। কঠিন মাটির উপর কোনও দাগ নাই, কেবল শুকনা আগাছা দুই পাশে একটু সরিয়া গিয়া যেন যাতায়াতের পথ ছাড়িয়া দিয়াছে।

'এ বাড়িতে কেউ থাকে নাকি?'

মুদি চোখ কপালে তুলিল, 'কে থাকবে হুজুর? কার এত সাহস!'

'চোর-ডাকাত?'

'এদেশে মানুষই নেই, যারা আছে তাদের পয়সা নেই। চোর-ডাকাত কি জন্যে আসবে! আমরা বিশ বছরের মধ্যে চোর-ডাকাতের নাম শুনিনি।'

গৌরমোহন ভাবিল, হয়তো শিয়াল-কুকুর এদিক দিয়া যাতায়াত করে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, অস্পষ্ট পথটা বাড়ির সদরে না গিয়া বাড়ির পাশ বেড়িয়া পিছন দিকে চলিয়া গিয়াছে।

সদর দরজায় মরিচা-ধরা তালা লাগানো। কিছুক্ষণ চেষ্টা করিবার পর তালা খুলিয়া গেল।

গৌরমোহন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে প্রত্যাশা করিয়াছিল, বহুকালের অব্যবহৃত বাড়ির মেঝেয় পুরু হইয়া ধূলা জমিয়াছে। ঘরের কোণে কোণে ময়লা মাকড়সার জাল ধূলার ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, কুলিদের আরও কিছু পয়সা দিয়া অন্তত একটা ঘর পরিষ্কার করিয়া লইবে।

কিন্তু এ কি! ঘরের মেঝে তক্‌তক্ করিতেছে, কোথাও একটু অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন নাই। যেন অতিথির আগমন প্রত্যাশায় কেহ সমস্ত ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে।

গৌরমোহন অন্য ঘরগুলিতে গিয়া দেখিল। বাস করিবার জন্য গুটিচারেক ঘর, তাছাড়া রান্নাঘর স্নানের ঘর ইত্যাদি। সমস্তই ঝাড়ামোছা, ব্যবহারে সুমার্জিত।

বাড়ি বহুকাল বন্ধ থাকিলে দূষিত বায়ুর যে অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতা গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা একেবারে নাই। বরং যে গন্ধটা গৌরমোহনের নাকে আসিল, তাহা এ বাড়ির পক্ষে বড়ই বিস্ময়কর। মানুষের গন্ধ! যে বাড়িতে সর্বদা মানুষ বাস করে, সে বাড়ির বাতাসে একটি সহজ স্বাভাবিক গন্ধ আছে তাহা আমরা পাই না — রূপকথার রাক্ষসেরা বোধ হয় পায়— এ সেই গন্ধ! কিন্তু এ গন্ধ এ বাড়িতে আসিল কোথা হইতে? বাড়ির দরজায় তালা লাগানো ছিল—

গৌরমোহনের গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিল। ইহা ভয়ের রোমাঞ্চ নয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া। মনকে দৃঢ় করিয়া সে বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

মুদি ও তাহার সঙ্গী দুইজন মোটঘাট নামাইয়া অস্বচ্ছন্দ ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল, গৌরমোহন তাহাদের মজুরি দিল।

মুদি বলিল, 'হুজুর, আপনার রাত্রিতে খানাপিনার কী হবে? যদি হুকুম করেন, গরম গরম পুরি তরকারি এনে দিতে পারি।'

গৌরমোহন বলিল, 'আজ রাত্তিরে কিছু দরকার হবে না, আমার সঙ্গে যা আছে তাতেই চলে যাবে। যদি কিছু দরকার হয়, কাল সকালে তোমার দোকানে যাব।'

'জি হুজুর'—

মুদি সঙ্গীদের লইয়া চলিয়া গেল।

তাহারা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গৌরমোহনের মনে হইল, সে একেবারে একা! সে নিজেকে বুঝাইল, একা থাকিবার জন্যই তো সে এখানে আসিয়াছে। সে নিজে নিজের জন্য রাঁধিবে, খাইবে, ঘুমাইবে— আর মনের সুখে ছবি আঁকিবে। নিরন্তর 'বিয়ে কর, বিয়ে কর'— এই তাগাদা শুনিতে হইবে না।

সূর্যাস্তের এখনও দেরি আছে, তবে রৌদ্রের রঙ হল্‌দে হইয়া গিয়াছে।

গৌরমোহন বাড়ির বাহিরে আসিল। এককালে বোধ হয় বাড়ি ঘিরিয়া ফুলের বাগান ছিল, এখন বাগানের চিহ্নমাত্র নাই। বর্ষার জল পাইয়া যে আগাছা প্রতি বৎসর জন্মগ্রহণ করে, তাহাও এখন রোদে পুড়িয়া খড় হইয়া গিয়াছে। সেই খড়ের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট পায়ে-হাঁটা পথের ইশারা।

গৌরমোহন সেই ইশারা অনুসরণ করিয়া বাড়ির পিছন দিকে চলিল। ওদিকটা এখনও দেখা হয় নাই।

পথটি বাড়ির পাশ দিয়া গিয়া পিছনে খিড়কির দরজার কাছে শেষ হইয়াছে। গৌরমোহন দরজা ঠেলিয়া দেখিল ভিতর হইতে বন্ধ। তারপর সে পিছন দিকে ঘাড় ফিরাইয়া একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল।

পিছন দিকে পাঁচিল নাই, তৎপরিবর্তে চওড়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে নামিয়া গিয়াছে। যেখানে সিঁড়ি শেষ হইয়াছে, সেখানে স্বচ্ছ শীর্ণ একটি নদী বিরল-বাস পাহাড়ী মেয়ের মতো শুইয়া আছে। ওপারে শিলাখণ্ড রচিত ঢালু পাড়।

বাড়ির পিছন দিকে লুকানো এই দৃশ্যটি দেখিয়া গৌরমোহন মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। চারিদিকের শিলাসঙ্কুল শুষ্কতার মাঝখানে দৃশ্যটি যেন আরও শ্রীমন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যাহারা এই নিভৃত স্থানে বাড়ির পিছন দিকে পাথর বাঁধানো ঘাট তৈয়ার করিয়াছিল, তাহারা কাল-স্রোতে ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘাটটি এখনও জীবন্ত রহিয়াছে, নূতন মানুষের পদধ্বনি শুনিবার আশায় উৎসুক চক্ষে অপেক্ষা করিতেছে।

গৌরমোহন ঘাটে গিয়া দাঁড়াইল; তাহার শিল্পী-চক্ষু চারিদিকে ফিরিয়া দৃশ্যটির রস গ্রহণ করিল। তারপর সে জুতা খুলিয়া ঘাটের নিম্নতম পৈঠায় গিয়া পা ডুবাইয়া দাঁড়াইল। কী ঠাণ্ডা জল! রক্তচক্ষু সূর্যের ভয়ে বাতাসের সমস্ত শীতলতা যেন এই জলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। সে নত হইয়া মুখেচোখে জল দিল, মনে মনে স্থির করিল কাল সকালে উঠিয়াই নদীতে স্নান করিবে।

ঘাট হইতে ফিরিবার পথে গৌরমোহন আবার পথের অস্পষ্ট রেখা দেখিতে পাইল।

আসিবার সময় লক্ষ্য করে নাই, ঘাট হইতে খিড়কি দরজা পর্যন্ত রেখা রহিয়াছে। সে একটু বিমনা হইল। শিয়াল-কুকুরের পায়ের দাগ। শিয়াল-কুকুর সদর দরজায় আসে কেন, এবং সেখান হইতে ঘাটেই বা যায় কি জন্য?

এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে গৌরমোহন আবার বাড়ির সামনের দিকে উপস্থিত হইল।

সূর্য অসম দিগন্ত-রেখা স্পর্শ করিয়াছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে দ্রুতপদে ফটকের দিকে চলিল।

ফটকের পাকুড় গাছের নিচে ছায়া-ছায়া হইয়া আসিয়াছে। যেখানে গাছের ডালে খাবারের পুঁটুলি টাঙাইয়া

দিয়াছিল, গৌরমোহন সেখানে গিয়া দাঁড়াইল।

দেখিল পুঁটুলি অন্তর্হিত হইয়াছে।

৩

গ্রীষ্মকালে সূর্যাস্তের পর দিনের আলো বেশিক্ষণ থাকে না। তাই অন্ধকার হইবার আগেই গৌরমোহন গিয়া নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিয়া গেল, অবশ্য সব জিনিসপত্র আজই মোট খুলিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কিছু জিনিস আজ রাত্রেই প্রয়োজন হইবে। লণ্ঠন, মোমবাতি, স্টোভ ইত্যাদি এবং বিছানা।

বাড়িতে আসবাবপত্র কিছুই ছিল না, কিন্তু গৌরমোহনের মনে পড়িল একটা ঘরে সে একটি লোহার খাট দেখিয়াছে। সে গিয়া আবার দেখিয়া আসিল, হ্যাঁ, পশ্চিম দিকের ঘরের এক কোণে একটি সরু লোহার খাট আছে। সে খাটটিকে টানিয়া জানালার সামনে আনিল। জানালায় মোটা মোটা গরাদ আছে, কিন্তু কাচ বেশির ভাগ ভাঙা। গ্রীষ্মকালে তাহাতে কোনই অসুবিধা নাই।

গৌরমোহন হোল্‌ড-অল্‌ টানিয়া আনিয়া বিছানা পাতিয়া ফেলিল। বিছানা বালিশ সবই নূতন, বন্ধু মোহনলাল যোগাড় করিয়া দিয়াছে।

বন্ধু বটে মোহনলাল! যেমন তার বিষয়বুদ্ধি, তেমনি তার বন্ধুপ্রীতি, এক জোড়া নূতন চটি জুতাও বিছানার মধ্যে দিতে ভুলে নাই। রাত্রে পরিবার জন্য সিল্কের পাজামা-সুট্‌ দিয়াছে।

গৌরমোহন জুতা খুলিয়া চটি পরিল, তারপর হৃষ্টমনে বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিল। বাক্স, প্যাকিং কেস্‌, চটের বস্তা প্রভৃতিতে কোথায় কি আছে মোহনলাল বলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু গৌরমোহনের ভাল মনে নাই। সে পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া প্রথমে ট্রাঙ্ক খুলিল। ট্রাঙ্কটা মোহনলালের, তাহার ভিতরের কাপড়-জামা-তোয়ালে প্রভৃতিও মোহনলালের, বন্ধুকে ব্যবহার করিতে দিয়াছে; দুই বন্ধুর শরীরের মাপ একই রকম, একের জামা অন্যে পরিলে বেমানান হয় না। উপরন্তু ট্রাঙ্কে সাবান, কেশতৈল, দাড়ি কামাইবার যন্ত্রপাতি, আয়না, চিরুনি আছে। একটি বৈদ্যুতিক টর্চও আছে।

গৌরমোহনের মন খুশি হইয়া উঠিল। নিত্যব্যবহার্য সকল বস্তুই বন্ধু দিয়াছে। সে টর্চটি লইয়া পকেটে রাখিল, তারপর ট্রাঙ্ক সরাইয়া ছোট প্যাকিং কেস্‌টা টানিয়া লইল। ঐ লম্বা প্যাকিং কেস্‌টায় ইজেল্‌ ক্যাম্বিস প্রভৃতি ছবি আঁকার সরঞ্জাম আছে, সেটা আজ খুলিবার দরকার নাই; এটাতে কি আছে দেখা যাক্‌। শূন্য বাড়িতে নূতন করিয়া সংসার পাতিবার আনন্দে গৌরমোহন মাতিয়া উঠিল।

প্যাকিং কেসের ঢাকনা চাড় দিয়া খুলিয়া দেখিল, ঘরকন্নার জিনিস। একটা ছোট্ট হ্যারিকেন লণ্ঠন, দুই বান্ডিল মোমবাতি, স্টোভ, স্পিরিটের বোতল; চায়ের প্যাকেট, টিনের দুধ, চিনি, কেট্‌লি, টি-পট্‌, পিরিচ পেয়ালা, এমন কি দুধের টিন খুলিবার যন্ত্রটা পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

গৌরমোহনের মন যেমন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল, তেমনি চায়ের পিপাসাও জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাহার সায়াহ্নিক চা পানের গোধূলি লগ্ন উপস্থিত; আজ যে তাহাকে স্বপাক চা খাইতে হইবে, তাহা স্মরণ ছিল না। সে হৃষ্টমনে চা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সঙ্গে বড় একটা ফ্ল্যাস্কে জল আছে, কিন্তু নদী হইতে জল আনিয়া চা প্রস্তুত করাই প্রশস্ত। গৌরমোহন কেট্‌লি হাতে লইয়া উঠিল, সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া পিছনের দরজার দিকে চলিল। বাড়ির ভিতরে তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে।

পিছনের দরজাটি ভিতর দিক হইতে হুড়কা ও ছিটকিনি লাগানো। কবাট খুলিবার সময় মরিচা-ধরা কব্জায় ক্যাঁ-চ্‌ করিয়া একটা করুণ শব্দ হইল। কিন্তু কবাটে জাম ধরে নাই, সহজেই খুলিয়া গেল।

বাহিরে একটু আলো আছে, নদীর ছোট্ট বুকে সন্ধ্যার ছোপ ধরিয়াছে। গৌরমোহন কেট্‌লিতে জল ভরিয়া ফিরিয়া আসিল, দরজা আবার বন্ধ করিয়া দিল।

স্টোভ জ্বালিয়া সে জল চড়াইয়া দিল।

এক পেয়ালা জল গরম হইতে বেশি সময় লাগিবে না, ইতিমধ্যে হ্যারিকেন লণ্ঠনটি জ্বালিল। স্টোভের ছোট্ট নীল-কমলটির পাশে পীতবর্ণ একটি বুদ্বুদ ফুটিয়া উঠিল। ঘরের অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, একটু একটু হালকা হইল।

পাঁচ-ছয় মিনিটের মধ্যে চা তৈরি হইয়া গেল। গৌরমোহন তখন ইক্‌মিক্ কুকার খুলিয়া তাহার খোলের ভিতর হইতে খাবার বাহির করিল। আলাদা টিফিন-বক্স না দিয়া বন্ধ কুকারের মধ্যেই খাবার দিয়াছে। একটা খোলের মধ্যে চিংড়ি মাছের কাটলেট ও হিঙের কচুরি, অন্য খোলে কড়া পাকের সন্দেশ। তাছাড়া একটা বড় পাঁউরুটি, চীজ, মাখন ইত্যাদি আছে। প্রচুর খাবার।

গৌরমোহন দুইটি সন্দেশ বাহির করিয়া খাইতে বসিল। সঙ্গে নিশ্চয় আসন আছে, কিন্তু তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক হাঙ্গামা। বিশেষত মেঝে বেশ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে, ধূলা নাই।

সে তরিবত করিয়া সুগন্ধি চায়ের পেয়ালাটি মুখে তুলিতে যাইবে, এমন সময় সদর দরজায় খুট্ খুট্ শব্দ হইল।

গৌরমোহন চমকিয়া মুখ তুলিল। তারপর গলা চড়াইয়া বলিল, 'কে?'

দরজার ওপার হইতে কেহ সাড়া দিল না, কিন্তু আবার খুট্ খুট্ শব্দ হইল।

গৌরমোহন উঠিয়া গিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল, আবার প্রশ্ন করিল, 'কে? কি চাও?'

এবারও সাড়া নাই।

গৌরমোহন একটু ইতস্তত করিল; যদি চোর-ডাকাত হয়! কিন্তু চোর-ডাকাত তাহার কী লইবে? সে সাহস করিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

বাহিরে কেহ নাই, কেবল অন্ধকার।

গৌরমোহন পকেট হইতে টর্চ লইয়া বাহিরে আলো ফেলিল। আলোর সীমানার মধ্যে কাহাকেও দেখা গেল না। মানুষ তো নাই-ই, কুকুর বিড়ালও নাই।

গৌরমোহন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। টর্চের আলোয় যে বৃত্তাভাস রচিত হইয়াছে তাহার বাহিরে কিছু দেখা যায় না। একটা এলোমেলো বাতাস উঠিয়াছে। গৌরমোহন এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল; ভাবিল, হয়তো হাওয়ার ধাক্কায় দরজায় শব্দ হইয়াছিল। পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে।

দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া সে চা খাইতে বসিল। বসিয়াই কিন্তু চমকিয়া উঠিল। প্লেটে একটি কাটলেট ও একটি সন্দেশ রহিয়াছে।

সে সচকিত ভাবে ঘরের চারিদিকে চাহিল। তবে কি বিড়াল ঢুকিয়াছিল? তাহার ক্ষণিক অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া কাটলেট ও সন্দেশ লইয়া পালাইয়াছে? নিশ্চয় বিড়াল। তাছাড়া আর কী হইতে পারে?

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খাইবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না; সে খাবারের প্লেট এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া চায়ের পেয়ালা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে হইবে বিড়ালটা বাড়ির মধ্যে কোথাও লুকাইয়া আছে কি না।

টর্চ লইয়া গৌরমোহন প্রত্যেকটি ঘর দেখিল, কিন্তু কোথাও বিড়াল নাই। অবশ্য কাচভাঙা জানালা দিয়া পলায়ন করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তবু গৌরমোহনের মনটা সংশয়-কণ্টকিত হইয়া রহিল। এতগুলো লোক যাহা বলিতেছে, তাহাই যদি সত্য হয়?

বিছানার পাশে পা ঝুলাইয়া বসিয়া গৌরমোহন ভাবিতে আরম্ভ করিল। প্রেতযোনি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাকে ভয় করিব কেন? ভূতে মানুষের ঘাড় মটকায় একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

মনে পড়িল, স্টেশন মাস্টারকে সে পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিল— ভালই হল, একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে। যদি সত্যিই এ বাড়িতে ভূত-প্রেত থাকে— যদিও এ পর্যন্ত স্পষ্ট নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই— তাহাতে ক্ষতি কি? সে তো ভূতের কোনও অনিষ্ট করে নাই, বরং ভূতই তাহার খাবার খাইয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাহার প্রতি ভূতের কোনও বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। ভূতের যদি খাদ্যদ্রব্যের প্রতি লোভ থাকে, বেশ তো, ভূতের সঙ্গে সে নিজের খাবার ভাগ করিয়া খাইবে।

এই ভাবে নানা যুক্তিতর্কের দ্বারা গৌরমোহন মনকে দৃঢ় করিতেছে, এমন সময় বাহিরের ঘর হইতে অস্পষ্ট একটা শব্দ তাহার কানে আসিল। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করিয়াছিল, বাড়ির ভিতরে কি বাহিরে, কোথাও এতটুকু শব্দ নাই, ঝিঁঝির আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাইতেছে না। হাওয়া উঠিয়া যে শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাও থামিয়া গিয়াছে। তাই এত গভীর স্তব্ধতার মধ্যে সামনের ঘরের সামান্য আওয়াজটা সে শুনিতে পাইল।

গৌরমোহন নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা সামনের ঘরেই ছিল, সে পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া ঘরে উঁকি মারিল। কেহ নাই। তখন সে টর্চ জ্বালিয়া দ্রুত ঘরের চারিদিকে ঘুরাইল। সদর দরজা আগের মতোই বন্ধ, ঘর শূন্য। কিন্তু—

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট বলিয়া যে খাবারগুলি সে সরাইয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি নাই, প্লেট খালি।

গৌরমোহন মনে মনে মন্তব্য করিল— 'পেটুক ভূত। তেলেভাজা থেকে সন্দেশ পর্যন্ত কিচ্ছু বাদ দেয় না।'

৪

গৌরমোহন হাতের ঘড়ি দেখিল— সাড়ে আটটা।

গ্রীষ্মকালের পক্ষে এমন কিছু বেশি রাত্রি নয়। কিন্তু সঙ্গীহীন অবস্থায় কাহারও সহিত কথা না বলিয়া কতক্ষণ জাগিয়া থাকা যায়! ট্রেনের হটরানিতে শরীরও ক্লান্ত। সুতরাং খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শুইয়া পড়া যাইতে পারে। কাল ভোরে উঠিয়া নদীতে স্নান করিতে হইবে।

গৌরমোহন আহার শেষ করিল। তারপর একটি কৌটায় কিছু খাবার রাখিয়া ঢাকনা বন্ধ করিয়া এক পাশে সরাইয়া রাখিল। বিড়াল ঢাকনা খুলিয়া খাইতে পারিবে না, কিন্তু ভূতের যদি ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সে স্বচ্ছন্দে খাইতে পারিবে। নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

সামনের এবং পিছনের দরজা বন্ধ আছে কিনা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া সে শয়ন করিল। লণ্ঠনটা কমাইয়া ঘরের এক কোণে রাখিল। টর্চ বালিশের পাশে রহিল।

খোলা জানালা দিয়া ফুরফুরে বাতাস আসিতেছে। আকাশের দক্ষিণ দিকে কয়েকটা উজ্জ্বল তারা দেখা যাইতেছে। গৌরমোহন শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

খাসা বাড়িটি; এতদিন শূন্য পড়িয়া আছে, কিন্তু মনে হয় না পোড়ো বাড়ি। কে বাড়িটি এমন তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়াছে? ভূত? হয়তো আছে। কিন্তু নিরীহ ভূত, কোনও প্রকার গণ্ডগোল নাই। ভূতের সঙ্গে ভাব-সাব করিয়া কথাবার্তা বলা যায় না কি?

ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতে লাগিল... কলিকাতায় মাতৃদেবী বোধ করি খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু উপায় কি? ঐ দুম্বো মেয়েটাকে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না...

গৌরমোহনের ঘুম ভাঙিল সকাল পাঁচটার সময়। বাহিরে দিনের আলো ঝলমল করিতেছে, সূর্য উঠিতে বিলম্ব নাই।

সে উঠিয়া বসিয়া আড়মোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিল।

রাত্রে সুনিদ্রা হইয়াছে, এক ঘুমে রাত কাবার হইয়া গিয়াছে। ভূতের উৎপাত কিছু হয় নাই। তবু তাহার মনে হইল ঘুমের মধ্যে সে নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছে। কে যেন তাহার খাটের চারিপাশে সারারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, শিয়রে দাঁড়াইয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া মুখ দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে, পাখির পালকের মতো নরম হাতে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু উহা স্বপ্নই। গত রাত্রে তাহার জাগ্রত মনের মধ্যে যে সংশয়গুলা ঘুরিতেছিল, তাহারাই বোধ হয় স্বপ্নে নব-কলেবর ধরিয়া দেখা দিয়াছিল।

গৌরমোহন উঠিয়া পড়িল।

সাবান তোয়ালে লইয়া মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে ঘাটে স্নান করিতে চলিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে অবগাহন স্নান করিলে সারাদিন শরীর ঠাণ্ডা থাকে।

খিড়কির দরজা খুলিতে গিয়া গৌরমোহন আজ প্রথম ধাক্কা খাইল। খিড়কির দরজা ভেজানো রহিয়াছে বটে, কিন্তু খিল ও ছিটকিনি খোলা। তাহার বুকের ভিতরটা একবার ধ্বক্ করিয়া উঠিল। কাল রাত্রে শয়নের পূর্বে সে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিল দরজা বন্ধ আছে। তবে—?

সে স্থির হইয়া চিন্তা করিল। ভূত আছে, কাল রাত্রে দরজা বন্ধ করার সময় সে বাড়ির মধ্যে ছিল, তারপর কোনও সময় দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়াছে। কিন্তু এ কি রকম ভূত? বাহিরে যাইবার জন্য দরজা খোলে কেন? প্রেতযোনি তো অশরীরী! কিন্তু না, ভয় পাইলে চলিবে না। ভূতের সঙ্গে যখন এক বাড়িতে বাস করিতে হইবে, তখন ভয় করিলে চলিবে না। বিশেষত ভূত যেমনই হোক, তাহার স্বভাবটি শান্ত-শিষ্ট। গৌরমোহন এ বাড়িতে আসাতে সে যে বিরক্ত হইয়াছে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তবে কেন সে ভূতকে ভয় করিবে? ভূতের ভয় একটা কুসংস্কার।

নদীর ঘাটে পৌঁছিয়া গৌরমোহন দ্বিতীয়বার ধাক্কা খাইল। ঘাটের মাথায় দাঁড়াইয়া সে দেখিল, ঘাটের কিনারায় নদীর শান্ত জল তোলপাড় হইতেছে। জলে কেহ নাই, অথচ মনে হইতেছে কেহ হাত-পা ছুঁড়িয়া সাঁতার কাটিতেছে। কিংবা একটা বিরাট মাছ জলের তলায় থাকিয়া ল্যাজের ঝাপটায় জল মথিত করিয়া তুলিতেছে।

গৌরমোহন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতরটা আর একবার ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া উঠিল।

হঠাৎ জলের আলোড়ন শান্ত হইল। একটা চিৎকারের মতো শব্দ শোনা গেল, যেন স্নাতক আগন্তুককে দেখিতে পাইয়াছে। তারপর আর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। গৌরমোহন বিস্ময়াহত চক্ষে দেখিল— জলের প্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া একজোড়া সজল চরণচিহ্ন ধাপে ধাপে উঠিয়া আসিতেছে। মানুষ নাই, কেবল মানুষের ভিজা পায়ের দাগ।

পায়ের দাগ ঘাটের পৈঠাগুলিকে অতিক্রম করিয়া মাটির ওপর অদৃশ্য হইয়া গেল।

গৌরমোহন কিছুক্ষণ পায়ের দাগগুলির দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে সোপানের পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। হঠাৎ অতিপ্রাকৃত ব্যাপার দেখিয়া বুক ধড়ফড়ানির অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে, সে গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।— এ কী কাণ্ড! এ কেমন প্রেত? এ প্রেতের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, দরজা খুলিয়া সে বাড়ির বাহিরে আসে, নদীর জল উদ্বেলিত করিয়া স্নান করে। সবই মানুষের মতো, কেবল চোখে দেখা যায় না।

হয়তো সব প্রেতই এই রকম, মানুষ তাহাদের সম্বন্ধে একটা বিকৃত ধারণা করিয়া বসিয়া আছে।

সজল পদচিহ্নগুলি তাহার চোখের সামনে শুকাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ ঘাটে বসিয়া থাকিবার পর গৌরমোহন জলে নামিয়া স্নান করিল। দেহ শীতল হইল, মনও অনেকটা শান্ত হইল।

বাড়িতে ফিরিয়া সে সদর দরজা খুলিয়া দিল, তারপর চা তৈয়ার করিতে বসিল।

স্টোভ ও লণ্ঠনের জন্য কেরাসিন যোগাড় করিতে হইবে। ইক্‌মিক্ কুকারের জন্য কাঠ-কয়লা দরকার।

চা প্রস্তুত হইলে পাঁউরুটিতে মাখন মাখাইয়া সে খাইতে বসিল। খাইতে বসিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল,

কাল রাত্রে ডিবার মধ্যে খাবার রাখিয়াছিল ভূত খায় কিনা দেখিবার জন্য। ডিবাটা ঢাকনা-ঢাকা ছিল। গৌরমোহন সেটা টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিল। হুঁ।

খালি কৌটার দিকে চাহিয়া সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর শূন্যের দিকে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'তুমি এখন কিছু খাবে?'

গৌরমোহন কান খাড়া করিয়া রহিল, কিন্তু কিছু শুনিতে পাইল না। প্রেত বোধ হয় কথা বলিতে পারে না। সে আর এক পেয়ালা চা ঢালিল, দু'স্লাইস্ রুটিতে মাখন লাগাইয়া খানিকটা দূরে রাখিয়া আসিল।

তারপর পানাহার করিতে করিতে আড়চোখে দেখিতে লাগিল।

প্রেত কিন্তু খাইতে আসিল না, চা-রুটি যেমন পড়িয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল।

প্রাতরাশ শেষ করিয়া গৌরমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘরটা বড় অগোছালো হইয়া আছে, বস্তাগুলাও খোলা হয় নাই। এইবার লাগা যাক। একটা অসুবিধা এই যে, বাড়িতে একটিও ফার্নিচার নাই। একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা কাবার্ড যদি থাকিত! যা হোক, মেঝেয় জিনিসপত্র গুছাইয়া কাজ চালাইতে হইবে।

পাঞ্জাবির আস্তিন গুটাইয়া গৌরমোহন প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় খোলা দরজা দিয়া বাহিরের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। ফটকের কাছে একটা লোক উঁকিঝুঁকি মারিতেছে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করিতেছে না। বোধ হয় মুদি, গৌরমোহন বাঁচিয়া আছে কিনা দেখিতে আসিয়াছে।

গৌরমোহন দ্বারের বাহিরে আসিয়া হাতছানি দিয়া মুদিকে ডাকিল।

মুদি তখন চক্ষু গোলাকৃতি করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, 'হুজুর, আপ জিন্দা হ্যায়!'

গৌরমোহন হাসিয়া বলিল, 'আলবৎ জিন্দা হ্যায়। তুমি কি ভেবেছিলে ভূতে আমার ঘাড় মটকেছে?'

মুদির বিস্ময়-বিমূঢ়তা কাটিল বটে, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে খুশি হইতে পারে নাই। ভূত যেন তাহার কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিয়াছে।

অবশেষে মুদি বলিল, 'কিছু দেখেননি?'

'ভূত দেখিনি।'

মুদি এবার সত্য সত্যই অসন্তুষ্ট হইল, বলিল, 'আপনারা ম্লেচ্ছ, তাই দেও আপনাকে দেখা দেয়নি। কিন্তু আছে, একদিন দেখবেন।'

গৌরমোহন হাসিয়া বলিল, 'আমি তো তাকে দেখবার জন্যে চোখ পেতে আছি। কিন্তু ও-কথা থাক। আমার এক বোতল কেরাসিন আর কিছু কাঠ-কয়লা চাই। তুমি এনে দিতে পারবে?'

মুদি বলিল, 'এখন পারব না। আধ-ঘন্টা পরে ট্রেন আসবে, এখনও আমার জিলিপি ভাজা বাকি। তবে আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন, দিতে পারি।'

'বেশ, চল।'

গৌরমোহন সদর দরজায় তালা লাগাইয়া মুদির সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

ফটকের ভিতর দিয়া যাইবার সময় গৌরমোহন জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি আজ ভোরবেলাই এদিকে এলে যে?'

মুদি পাকুড় গাছের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'দেওয়ের জন্যে ভোগ এনেছিলাম।'

গৌরমোহন দেখিল পাকুড় গাছের ডালে শালপাতার মোড়ক ঝুলিতেছে। সে প্রশ্ন করিল, 'তোমরা ক'বার ভূতের ভোগ চড়াও?'

'দিনে একবার চড়াই। কখনও সকালে, কখনও বিকেলে।'

'ও— তাই ভূতের পেট ভরে না!'

মুদি সচকিতে তাহার পানে চাহিল, 'পেট ভরে কিনা আপনি জানলেন কী করে?'

গৌরমোহন উত্তর দিল না, শুধু হাসিল।

৫

আধ ঘণ্টা পরে গৌরমোহন ফিরিয়া আসিল। এক হাতে গলায় দড়ি বাঁধা কেরাসিনের বোতল, অন্য হাতে কাঠ-কয়লার পুঁটুলি। ফটক পার হইবার সময় সে দেখিল, পাকুড় গাছের ডালে খাবারের মোড়ক যেমন ঝুলিতেছিল, তেমনি ঝুলিতেছে, ভূত তাহা লইয়া যায় নাই।

গৌরমোহন মনে মনে হাসিল।

ভূতের বোধহয় লাড্ডু ও পকৌড়িতে আর রুচি নাই।

তালা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘরটি পরিষ্কার ভাবে ঝাঁট দেওয়া, কিন্তু জিনিসপত্র মোটঘাট একটিও সেখানে নাই।

গৌরমোহনের চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

কেরাসিনের বোতল এবং কয়লা নামাইয়া রাখিয়া সে ছুটিয়া ভিতরে গেল। তাহার শয়নের ঘরটিও পরিষ্কৃত হইয়াছে। এবং তাহার ট্রাঙ্কটি ঘরের এক পাশে রাখা রহিয়াছে।

অতঃপর গৌরমোহন অন্য সব ঘরগুলিতে গিয়া দেখিল, তাহার কোনও জিনিস খোয়া যায় নাই। যে বস্তুগুলি খোলা হয় নাই, সেগুলি অন্য একটি ঘরে রাখা হইয়াছে, ইক্‌মিক্ কুকার স্টোভ ইত্যাদি যাবতীয় দ্রব্য রান্নাঘরে শোভা পাইতেছে। যে দুটি পেয়ালায় সে চা ঢালিয়াছিল, সে দুটি ধোয়া-মোছা অবস্থায় রান্নাঘরে রহিয়াছে। প্লেট দুটিও তাই।

গৌরমোহন প্রকাণ্ড একটি হাঁফ ছাড়িয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল, 'তোমাকে ধন্যবাদ। আমার অনেক কাজ গুছিয়ে দিয়েছ।'

ভূতের নিকট হইতে কোনও প্রত্যুত্তর আসিল না। কিন্তু গৌরমোহন বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিল। এমন সহৃদয় ভূতকে সঙ্গীরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা। ভূত তাহার আগমনে রাগ করে নাই, বরঞ্চ খুশি হইয়াছে। গৌরমোহন কাজে লাগিয়া গেল; বস্তা, প্যাকিং কেস্ প্রভৃতি খুলিয়া জিনিসগুলি যথাযোগ্য স্থানে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। ছবি আঁকার জিনিসগুলিকে একটি ঘরে রাখিয়া আসিল; এই ঘরটি হইবে তাহার ছবি আঁকার ঘর।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সাজানো গোছানো সম্পন্ন হইল। তখন সে বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল ভূত কোন্ ফাঁকে কেরাসিনের বোতল এবং কয়লা রান্নাঘরে রাখিয়া আসিয়াছে। ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভূত, অগোছালো এলোমেলোভাব একেবারে পছন্দ করে না।

এতক্ষণে বেশ বেলা বাড়িয়াছে। গৌরমোহনের মনে পড়িল, হাতঘড়িটা রাত্রে বালিশের তলায় রাখিয়া শুইয়াছিল, আজ সকালে দম দেওয়া হয় নাই। সে শয়নঘরে গিয়া বালিশ উল্টাইয়া দেখিল ঘড়ি যথাস্থানে আছে এবং তাহাতে দম দেওয়া হইয়াছে। সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

ঘড়িতে এখনও আটটা বাজে নাই। সুতরাং রান্না চড়াইবার তাড়া নাই। ইতিমধ্যে কি করা যায়? ভূতের সঙ্গে আলাপ জমাইতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু ভূত যে কথা কয় না! এক তরফা বাক্যালাপ কতক্ষণ চালানো যায়? তবু গৌরমোহন চেষ্টার ত্রুটি করিল না, এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অশরীরীর উদ্দেশে বলিতে লাগিল, 'দ্যাখো, তোমার নাম জানি না, কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, আমার কত কাজ করে দিয়েছ... আমার বন্ধুভাগ্য খুব ভাল, ওদিকে মোহনলাল আর এদিকে তুমি... এস না দু'জনে বসে খানিক গল্প করি... তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না— আমার চেয়ে তোমার চোখের জ্যোতি বেশি— কিন্তু তুমি কথা কও না কেন? বল না দুটো কথা, শুনি... আচ্ছা, আজ কি রান্না করব বল।

আমার সঙ্গে চাল, মুগের ডাল, ময়দা, আলু, পটোল, পেঁয়াজ আছে। ভাল ঘি আছে, খাঁটি সরষের তেল আছে। বল না কী রাঁধি, তুমি যা বলবে তাই রাঁধব। দু'জনে মিলে খাওয়া যাবে।...'

কিন্তু কোনও ফল হইল না। গৌরমোহন অনুভব করিল ভূত কাছেই আছে, তাহার কথা শুনিতেছে, তাহাকে দেখিতেছে। কিন্তু কথা কহিতেছে না। হয়তো ভূতেরা কথা বলিতে পারে না। গৌরমোহন আর কিছুক্ষণ ভূতকে কথা কইবার চেষ্টা করিয়া শেষে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল।

ন'টা বাজিলে গৌরমোহন দাড়ি কামাইতে বসিল। দাড়ি কামাইবার জরুরী প্রয়োজন ছিল না, এখানে কে-ই বা তার দাড়ি লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু সময় কাটাইবার জন্য একটা কিছু করা চাই তো। ছবি আঁকার যোগাড়-যন্ত্র করিতে পারিত, কিন্তু সকাল হইতে তাহার মন চঞ্চল হইয়া আছে, ছবি আঁকায় মন বসিবে না।

দাড়ি কামাইবার ক্ষৌর-যন্ত্রগুলি ঘাটে গিয়া পরিষ্কার করিয়া আসিতে সাড়ে ন'টা বাজিল। এবার রান্না চড়ানো যাইতে পারে। বেশি কিছু নয়, ভাত, আলুভাতে আর আলু-পটোলের ডালনা। সঙ্গে ঘি আছে, ইহাতেই এ বেলা চলিয়া যাইবে। ও বেলা না হয় ভাল করিয়া রাঁধা যাইবে। গৌরমোহন রন্ধন ব্যাপারেও একজন শিল্পী।

রান্নাঘরে গিয়া সে প্রথমে নদী হইতে এক বালতি জল লইয়া আসিল। তারপর চাল ধুইয়া এবং আলু-পটোল কুটিয়া কুকারে রান্না চড়াইয়া দিল।

দুই ঘণ্টা আর কোনও কাজ নাই। গৌরমোহন গুন্ গুন্ স্বরে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইল, ট্রাঙ্ক খুলিয়া জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিল, আসিবার সময় হাওড়া স্টেশনে কয়েকটি লোমহর্ষণ উপন্যাস কিনিয়াছিল, সেগুলির পাতা উল্টাইল, ভূতের সঙ্গে আর একবার ব্যবহারিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করিল। তারপর বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া পা নাড়িতে নাড়িতে কলিকাতার পরিস্থিতির কথা ভাবিতে লাগিল। মাতৃদেবী বোধ হয় এতক্ষণ কলিকাতা শহর চষিয়া ফেলিতেছেন! তিনি যদি জানিতে পারেন মোহনলাল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না, মোহনের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিবে।

বারোটার সময় গৌরমোহন আহার করিতে বসিল। সঙ্গে একটি মাত্র বগি থালা ছিল, সেটিতে ভূতের জন্য ভাত বাড়িল। নিজের জন্য রেকাবি লইল। আহার করিতে করিতে ভূতকে বলিল, 'তুমি খেতে বসলে পারতে, একসঙ্গে খাওয়া চুকিয়ে নেওয়া যেত। যা হোক, তোমার যেমন ইচ্ছে। আমার সামনে খেতে যদি সঙ্কোচ হয়—'

একাকী আহার সম্পন্ন করিয়া গৌরমোহন শয়নঘরে ফিরিয়া গেল। একটি লোমহর্ষণ উপন্যাস লইয়া শয়ন করিল। দিবানিদ্রা তাহার অভ্যাস নাই, একটু ঝিম্‌কিনি দিয়া ভাতের নেশা কাটাইয়া উঠিয়া পড়িবে।

লোমহর্ষণ উপন্যাস পড়িতে পড়িতে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিল। তন্দ্রার মধ্যে সে শুনিতে পাইল খিড়কি দরজা খোলার ক্যাঁ—চ্ শব্দ হইল। বোধ হয় ভূত দরজা খুলিয়া নদীর ঘাটে গেল।... আলুভাতে আলু-পটোলের ডালনা ভূতের কেমন লাগিল কে জানে...

গৌরমোহন ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার দেহ-মনে বোধ হয় অলক্ষিতে কিছু ক্লান্তি জমা হইয়াছিল, একেবারে ঘুম ভাঙিল বেলা তিনটায়। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, মুখে-চোখে জল দিবার জন্য রান্নাঘরে গেল। দেখিল দুপুরবেলার উচ্ছিষ্ট বাসন-কোসন ভূত মাজিয়া ধুইয়া ঘরের কোণে উপুড় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মনে মনে ভূতকে ধন্যবাদ জানাইয়া সে জল পান করিল, তারপর ছবি আঁকার ঘরে গিয়া ছবি আঁকিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ঘরের একটা জানালা পিছন দিকে, এই জানালা দিয়া নদী ও ঘাটের দৃশ্য দেখা যায়। বাহিরে অপরাহ্নের সঞ্চিত সূর্যতাপ নিথর বাতাসে সূক্ষ্ম বাষ্পের মতো স্পন্দিত হইতেছে। গৌরমোহন জানালার কাছে ইজেল খাড়া করিল, একটা প্যাকিং কেস্ টানিয়া আনিয়া তাহার উপর বসিল। কি আঁকিবে তাহা সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। শুষ্ক প্রাণহীন শূন্যতার মাঝখানে একটি ছোট বাড়ি। বাড়িটি জীবন্ত, তাহার ছোট ছোট দরজা-জানালা যেন তাহার মুখ-চোখ। বিপুল শূন্যতার মাঝখানে বসিয়া বাড়িটি হাসিতেছে। ছবির নাম— শূন্য শুধু

শূন্য নয়।

মনে ছবির প্ল্যান ঠিক করিয়া লইয়া সে আঁকিতে আরম্ভ করিল। তেল রঙ ছবি আঁকিতে গৌরমোহনের সুবিধা হয়, সে প্যালেটে রঙ মিশাইল। প্রথমটা ধীরে ধীরে আঁকিল, তারপর মন বসিয়া গেল।

কতক্ষণ আপন মনে ছবি আঁকিতেছে তাহার জ্ঞান ছিল না। ঘাড়ের কাছে আতপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল। ভূত বোধ করি ছবি আঁকা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া শিল্পীর ঘাড়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, গৌরমোহন সচকিতে ঘাড় ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, 'অ্যাঁ!'

মনে হইল, যে পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল সে চট্ করিয়া পিছু হটিল। গৌরমোহন মুহূর্তমধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'ও— তুমি! আমার ছবি আঁকা দেখছ? বেশ বেশ। তা যেটুকু এঁকেছি কেমন মনে হচ্ছে? এখন বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছ না, আর একটু আঁকা হলে বুঝতে পারবে।'

গৌরমোহন আবার আঁকায় মন দিল। আঁকিতে আঁকিতে ভূতের উদ্দেশে দুই-চারটি কথা বলে, আবার আঁকে। এইভাবে বেশ খানিকক্ষণ চলিবার পর এক সময় সে অনুভব করিল যেন ঘরের আলো কমিয়া আসিতেছে। শুধু তাই নয়, বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে তুলি ফেলিয়া জানালার বাহিরে তাকাইল।

সূর্যের আলো কেমন যেন ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। তারপরই তাহার চোখ পড়িল নদীর ওপারে ঈশান কোণে ধূসর-পিঙ্গল মেঘ মাথা তুলিয়াছে। একটা দমকা হাওয়া আগাছার ভিতর দিয়া বহিয়া গেল। নদীর নিস্তরঙ্গ জল রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

গৌরমোহন সানন্দে বলিয়া উঠিল, 'ঝড় আসছে! ঝড় আসছে!'

চৈতালি ঝড়। নূতন কিছু নয়, প্রতি বৎসরই আছে। একবার এই বাড়ির সকলকে বজ্রাহত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

৬

দেখিতে দেখিতে বিদ্যুজ্জিহ্ব ঝড় আসিয়া পড়িল, আকাশে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। শন্‌শন্ বাতাস, চক্‌মক্ বিদ্যুৎ, গম্‌গম্ বজ্রগর্জন। বৃষ্টির মুষলধারে আকাশের কোথাও তিলমাত্র ছিদ্র রহিল না।

গৌরমোহনের মন ময়ূরের মতো নাচিয়া উঠিল। সে আঁকার সরঞ্জাম ঘরের একপাশে সরাইয়া রাখিয়া জানালাগুলা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল। সব জানালা বন্ধ হইল না, ভাঙা কাচের ভিতর দিয়া বৃষ্টির ছাট আসিতে লাগিল। সে পুলকিত দেহে বাড়ির ঘরে ঘরে অকারণ সঞ্চরণ করিতে করিতে তারস্বরে গান জুড়িয়া দিল। গানটা অবশ্য সর্বাংশে স্থানকালের উপযোগী নয়, তবু বর্ষার গান বটে—

আহা রে ঐ ডাকছে ডোবায় ব্যাংগুলি
মনের সুখে ছড়িয়ে তাদের ঠ্যাংগুলি।
আকাশেতে ছুটোছুটি মেঘে হাওয়ায় ঝুটোপুটি
ভূত-পেরেতে দত্যি-দানায় খেলছে যেন ডাংগুলি।

বর্ষার মহিমাজ্ঞাপক অন্য কোনও গান জানা না থাকায় সে এই গানটিই অনেকক্ষণ ধরিয়া গাহিল।

কড়্ কড়্ শব্দ করিয়া কোথাও বাজ পড়িল।

গৌরমোহন খাটের কিনারায় বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার শিল্পী-মন প্রকৃতির এই উদ্দাম উন্মাদনাকে রঙের ফাঁদে ধরিবার ফন্দি আঁটিতেছে।

কড়্ কড়্ কড়াৎ! এবার যেন বাড়ির খুব কাছেই বাজ পড়িল। বিদ্যুতের ঝলক এবং বাজের আওয়াজ প্রায় একসঙ্গেই তাহার চক্ষু-কর্ণ ধাঁধিয়া দিল।

তারপরই— লোমহর্ষণ কাণ্ড!

গৌরমোহনের কানের কাছে ভাঙা ভাঙা অস্ফুট স্বরে— 'আমার বড্ড ভয় করছে—' বলিয়া কে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

গৌরমোহনের হৃৎপিণ্ড একটা ডিগবাজি খাইয়া গলার কাছে ধড়ফড় করিতে লাগিল। সে দিশাহারা হইয়া অদৃশ্য জীবনের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইবার জন্য হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে চিৎকার করিতে লাগিল— 'কে? কে? ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও!'

কিন্তু সে অদৃশ্য প্রাণীর আলিঙ্গন ছাড়াইতে পারিল না, ধস্তাধস্তি করিতে করিতেই ভাঙা ভাঙা স্বর শুনিতে পাইল— 'আমাকে ছেড়ে দিও না— আমার বড্ড ভয় করছে।'

কড়্ কড়্ কড়াৎ।

তৃতীয়বার বজ্রপাতের শব্দে বাড়িটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা! এই শব্দে গৌরমোহনের ভয়বিহ্বলতা কাটিয়া গেল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা বোধ করি অপ্রাকৃতের ভয়কে দূর করিয়া দিল। এতক্ষণ সে নিজেকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, এখন কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অদৃশ্য দেহটাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিল।

একটা বাহু। চোখে দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু স্পর্শানুভূতির দ্বারা জানা যাইতেছে, কোমল অথচ দৃঢ়-মাংসল বাহু। গৌরমোহন দুই হাতে অদৃশ্য দেহটাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, 'তুমি কে? ভূত নও?'

শীর্ণ কম্পিত কণ্ঠের উত্তর আসিল, 'না, আমি মানুষ।'

'মানুষ! কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'আমি— আমি—' অদৃশ্য দেহটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

গৌরমোহন হাত দিয়া অনুভব করিয়া চলিল। বাহু শেষ হইয়া কাঁধ আরম্ভ হইয়াছে... কাঁধের ওপর অদৃশ্য চুলের গোছা... তারপর গলা... তারপর—

গৌরমোহন একটা খাবি খাওয়া চিৎকার করিয়া উঠিল— 'অ্যাঁ— তুমি মেয়ে!'

ঝড়ের দুরন্ত অভিযান দশ দিক দলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পিছনে পড়িয়া আছে ভিজা মাটি এবং বাতাসের অবসন্ন নিশ্বাস।

দুইটি মানুষ খাটের কিনারায় পাশাপাশি বসিয়া আছে। একজন অদৃশ্য, একজন দৃশ্য। থামিয়া থামিয়া কথা হইতেছে। গৌরমোহন চিরদিনই মেয়েদের কাছে মুখচোরা, আজ অভাবিত ঘটনাচক্রে এই অদর্শনা যুবতীর সংস্পর্শ লাভ করিয়া সে আরও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে।

গৌরমোহন বলিল, 'তোমার আর ভয় করছে না তো?'

উত্তর আসিল— 'না। মেঘ ডাকলেই ভয় করে।' গলার স্বর এখন একটু স্পষ্ট হইয়াছে।

'ইয়ে— তোমার নামটা এখনও জানা হয়নি। আমার নাম গৌর।'

'আমার নাম ছায়া!'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর গৌরমোহন হাতের ঘড়ি দেখিল— 'সাড়ে ছ'টা বেজেছে, চায়ের সময় হল। তুমি চা খাবে তো?'

'খাব।'

'চায়ের সঙ্গে লুচি আর আলুভাজা। কী বল?'

'হুঁ।'

খাট হইতে উঠিতে গিয়া ছায়ার গায়ে গা ঠেকিয়া গেল। গৌরমোহন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। অদর্শনা যুবতী যে সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্রা তাহা স্মরণ হইয়া গেল।

রান্নাঘরে গিয়া গৌরমোহন স্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিল। তারপর ময়দা মাখিতে বসিল। দেখিল তাহার অনতিদূরে বঁটিতে আলু কোটা হইতেছে, চাকা চাকা আলু কোটা হইয়া একটি রেকাবে জমা হইল, তারপর বালতির জলে ধৌত হইয়া তাহার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

'রাত্রে খিচুড়ি রাঁধা যাবে। তুমি খিচুড়ি ভালবাসো তো?'

একটি নিশ্বাস পড়িল— 'তেলেভাজা আর লাড্ডু ছাড়া সব ভালবাসি।'

তাই সে নূতন খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। গৌরমোহন সহানুভূতির সুরে বলিল, 'আহা! তেলেভাজা ফুলুরি আর লাড্ডু খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে।— তুমি চায়ে ক'চামচ চিনি খাও!'

'অনেক দিন চা খাইনি। যখন খেতুম, পাঁচ চামচ চিনি খেতুম।'

চায়ের জল টি-পটে ঢালিয়া গৌরমোহন লুচি ভাজিতে বসিল।

'আমি লুচি ভাজতে জানি। তুমি সরো— আমি ভাজছি।'

'না, না। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। অনেক কষ্ট করেছ। ঘর পরিষ্কার করেছ, বাসন মেজেছ—'

'আমার ইচ্ছে কচ্ছে—' কণ্ঠস্বরে একটু আদুরে আদুরে ভাব।

'তা— আচ্ছা। তুমি ভাজো।'

গৌরমোহন সরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। লুচি ও আলুভাজা প্রস্তুত হইল, রেকাবির উপর সজ্জিত হইল। স্টোভ নিভিয়া গেল।

দু'জনে খাইতে বসিল। গৌরমোহন চা ঢালিল, নিজের পেয়ালায় দু'চামচ চিনি দিল, ছায়ার পেয়ালায় পাঁচ চামচ।

খাওয়া চলিতেছে। ছায়ার রেকাবি হইতে লুচির টুকরো শূন্যে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, চায়ের পেয়ালা ক্রমে ক্রমে খালি হইয়া গেল। গৌরমোহন দেখিতেছে, তাহার বিস্ময় কিছুতেই শেষ হইতেছে না।

'তুমি হঠাৎ কথা কইলে যে! আগে তো কথা কওনি।'

'কথা কইতে ভুলে গিয়েছিলুম। বলতে চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। তারপর— বাজ পড়ার শব্দ হল। ভয়ে মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে গেল।'

গৌরমোহন চায়ে চুমুক দিয়া একটু সঙ্কুচিত হাসিল— 'শুধু কথাই বলনি, আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে।'

'বড্ড ভয় করছিল যে!'

সরল অকপট উক্তি, লজ্জা নাই। লজ্জা বোধ করি স্ত্রীলোকের দেহচেতনার অভিব্যক্তি। যাহার দেহ দেখা যায় না, সে কিসের লজ্জা করিবে!

'আচ্ছা, কাল আমি যখন এলাম, তুমি আমাকে দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ। আমি তো পাকুড় গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিলুম।'

'আমি যখন বাড়িতে এসে উঠলাম, তখন তোমার কি মনে হয়েছিল?'

'প্রথমটা ভয়-ভয় করছিল। তারপর তোমাকে খুব ভাল লাগল।'

গৌরমোহনের বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ভয়ের দুরু দুরু নয়।...

সে-রাত্রে পেট ভরিয়া খিচুড়ি খাইবার পর গৌরমোহন নিজের খাটের পাশে আসিয়া বসিল। ছায়া তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিল। এই কয়েক ঘণ্টায় গৌরমোহনের লজ্জা-সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়াছে। তবু ছায়ার গায়ে গা ঠেকিতে তাহার শরীর একটু রোমাঞ্চিত হইল।

'আচ্ছা, তুমি মানে— খালি গায়ে থাকতে কোনও ইয়ে হয় না।'

'অভ্যেস হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম দু'-একবার কাপড় চুরি করে পরেছিলুম, কিন্তু কাপড় পরলে শুধু

কাপড়টাই দেখা যায়, আমাকে দেখা যায় না, লোকে ভয় পায়। তাই আর পরি না।'

'ভাল কথা। তুমি রাত্তিরে শোও কোথায়?'

'মেঝেয় শুই।'

'শীতকালে শীত করে না?'

'না। আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'তা হোক। আজ তোমাকে খাটে শুতে হবে। আমি তোষক পেতে মেঝেয় শোব।'

'না। আমি খাটে শোব না।'

'তুমি মেয়ে হয়ে মেঝেয় শোবে আর আমি খাটে শোব, এ হতেই পারে না।'

'আমি খাটে শোব না।' ছায়ার কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

'শোবে না! তাহলে মেঝেতেই তোমার তোষক পেতে দিই। কোন ঘরে শোবে বল।'

'এই ঘরেই শোব। তুমি ওঠো। আমি তোষক পেতে দিচ্ছি।'

গৌরমোহন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া দাড়াইল— 'এই ঘরে? কিন্তু— মানে—'

খাটে দু'খানা তোষক ও দু'টা বালিশ ছিল। ছায়া একখানা তোষক টানিয়া খাটের পাশেই পাতিয়া ফেলিল। গৌরমোহন বলিল, 'বালিশ নাও।'

একটু হাসির শব্দ শোনা গেল— 'বালিশ লাগবে না। তোষকেই হয়তো অস্বস্তি হবে। এবার ঘুমিয়ে পড়, তোমার বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে। আলো কমিয়ে দিই?'

'দাও।'

ঘরের কোণে দেয়ালের পাশে লণ্ঠনটা জ্বলিতেছিল, এখন কমিয়া গিয়া দেয়ালের একটুখানি স্থান প্রভান্বিত করিল মাত্র। গৌরমোহন উদ্বেলিত হৃদয়ে অপরিসীম বিস্ময়ানন্দ লইয়া শুইয়া রহিল। এ কী অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা! বিশ্বসংসারে আর কেহ কি ইহা অনুভব করিয়াছে?

'ছায়া!'

মুহূর্তমধ্যে ছায়া তাহার গায়ে হাত দিয়া দাঁড়াইল— 'কী?'

গৌরমোহন বলিল, 'তুমি কে, কি করে অদৃশ্য হয়ে গেলে, কিছুই তো জানা হয়নি। বলবে আমায়?'

ছায়া খাটের পাশে বসিল, গৌরমোহনের একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।—

'আমার বয়স তখন নয় কি দশ বছর।'

গৌরমোহন মনে মনে হিসাব করিল, ছায়ার বয়স এখন উনিশ কি কুড়ি।

—'বাবা, মা, আমি আর আমার ছোট ভাই ভাদু এখানে বেড়াতে এসেছিলুম। আমার বাবার নাম ছিল নিধিরাজ মল্লিক। এ বাড়ির মালিক ছিলেন মদনলাল শেঠ, তাঁকে আমরা মদন কাকা বলে ডাকতুম।

'একদিন বিকেলবেলা ঝড় উঠল। আজ যেমন ঝড় উঠেছিল তেমনি। আমরা দোর-জানালা বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে বসে রইলুম। বাড়ির ওপর বার বার বাজ পড়তে লাগল। আমি এই খাটের উপর বসে ছিলাম। তারপর কি হল জানি না, আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।

'যখন জ্ঞান হল দেখলুম এই ঘরের এক কোণে পড়ে আছি। নিজের হাত-পা দেখতে পাচ্ছি না। বাড়িতে কেউ নেই, সামনের দরজায় তালা লাগানো। এখন মনে হয় তিন-চার দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম।

'গলার আওয়াজ একেবারে বুজে গিয়েছিল। আমি খিড়কি দোর দিয়ে বেরিয়ে বাগানে গেলুম, বাগানেও কেউ নেই। তখন ইস্টিশানের কাছে বাজারে গেলুম। সেখানে দু'-তিনজন লোক মুদির দোকানে বসে গল্প করছিল। তাদের কথা শুনে বুঝতে পারলুম, আমার মা-বাবা-ভাই কেউ বেঁচে নেই। কাঁদতে কাঁদতে আবার এই বাড়িতে ফিরে এলুম।

'সেই থেকে একলা এই বাড়িতে আছি। প্রথম প্রথম ক্ষিদে পেলে মুদির দোকানে গিয়ে খাবার চুরি করে

খেতুম। তারপর ওরাই এসে আমার খাবার দিয়ে যেত। এমনি করে কত বছর কেটে গেল।... তারপর তুমি এলে।'—

গৌরমোহন শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কি বিচিত্র এই জগৎ! বাজ পড়িয়া মানুষ অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহা কি সম্ভব? গৌরমোহন বিজ্ঞান জানে না, হয়তো বিজ্ঞানী ইহার ব্যাখ্যা জানেন। যদি না জানেন তাহাতেই বা ক্ষতি কী? বিজ্ঞানীরা কি সকল বিশ্ব-রহস্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন? এই যে অদর্শনা যুবতী তাহার হাতে হাত রাখিয়া বসিয়া আছে, সে কি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে?

গৌরমোহন একটি আকাঙক্ষা-ভরা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে ছায়া!'

৭

পরদিন সকালবেলা দেরিতে ঘুম ভাঙিল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহারা গল্প করিয়াছে, ফুলশয্যার রাত্রে নূতন বর-বধূর মতো। তবু কৌতূহল শেষ হয় নাই, সঙ্গ-তৃষ্ণা মিটে নাই। অবশেষে রাত্রি শেষ হয় দেখিয়া জোর করিয়া ঘুমাইয়াছিল।

সকালে ছায়া গৌরমোহনের বুকের উপর করতল রাখিয়া ডাকিল— 'ওঠো, চা এনেছি।'

গৌরমোহন উঠিয়া বসিয়া শূন্যে অবস্থিত চায়ের পেয়ালা হাতে লইল, ঘুমভরা গলায় বলিল, 'তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে ছায়া।'

ছায়া করুণ নিশ্বাস ফেলিল— 'কি করে দেখবে!'

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেই গৌরমোহনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, 'ছায়া, একটা কাজ করবে?'

'কী?'

'তুমি কাপড়-জামা পরো। তাহলে খানিকটা তো দেখতে পাব।'

কাপড়-জামা পরার নামে ছায়ার কণ্ঠে একটু স্ত্রী-সুলভ ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠিল, 'কাপড়-জামা কোথায়?'

'আমার বাক্সে ধুতি আর গেঞ্জি আছে। তাই পরো। শাড়ি-ব্লাউজ তো নেই।'

ছায়া দ্বিধাভরে বলিল, 'আচ্ছা।'

গৌরমোহন চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া বলিল, 'আমি এখনি আসছি।' বলিয়া গোসলখানার দিকে চলিয়া গেল।

দশ মিনিট পরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া গৌরমোহন চমকিয়া উঠিল। খাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে একটি প্রেতমূর্তি। হাত-পা নাই, মাথা নাই, সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি কবন্ধ। গৌরমোহন সত্রাসে বলিয়া উঠিল, 'ছায়া! খুলে ফ্যালো, শিগ্গির খুলে ফ্যালো। আমি দেখতে পারছি না। মনে হচ্ছে তুমি একটা পেত্নী।'

ত্বরিতে ধুতি-গেঞ্জি স্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িল।

তারপর সারাদিন দু'জনে অশান্ত মনে বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও নদীর ঘাটে গিয়া দাঁড়ায়। গৌরমোহন বলে, 'ছায়া, কী করে তোমাকে দেখতে পাব? ভারি যে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

ছায়া কঁদো-কাঁদো সুরে বলে, 'আমি কি করব?'

'তোমাকে না দেখতে পেলে জীবনই বৃথা।'

'আমারও। মানে—'

'বুঝেছি। আমি তোমাকে না দেখতে পেলে তোমার জীবন বৃথা!'

'হ্যাঁ।'

‘তাহলে এখন কি করা যায়? আমি যেন অন্ধ হয়ে গেছি, সব দেখতে পাচ্ছি, কেবল তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। বিজ্ঞানে আজকাল কত কী হচ্ছে, একটা অদৃশ্য মানুষকে জলজ্যান্ত করে দিতে পারে না! ছাই বিজ্ঞান।’

সেইদিন অপরাহ্ণে গৌরমোহন বিষণ্ণ মনে ছবি আঁকিতে বসিল। কাল ছবিটা অতি সামান্যই আঁকা হইয়াছিল, একটা প্রাকৃতিক পরিবেশের আমেজ ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র। গৌরমোহন ভাবিতে লাগিল— এই পরিবেশের মধ্যে ছায়ার একটি কল্প-মূর্তি আঁকা যায় না কি? কাপড়-পরা অবস্থায় ছায়ার দেহের যে ইঙ্গিত সে পাইয়াছে, তাহাকেই সূত্র ধরিয়া গোটা মানুষকে আঁকা যাইতে পারে। অবশ্য মুখ-চোখের গড়ন কাল্পনিক হইবে—

‘ছায়া, তোমার গায়ের রং কিরকম ছিল?’

ছায়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, ‘ফরসা। মা বলতেন দুধে-আলতা।’

‘আর মুখ-চোখ?’

‘তা কি করে বোঝাব?’

‘হুঁ। আচ্ছা দেখি, তুমি আমার সামনে দাঁড়াও।’

গৌরমোহন আঙুলের স্পর্শে ছায়ার মুখ চোখ অনুভব করিয়া দেখিতে লাগিল। চোখ দুটি বেশ টানা টানা মনে হইতেছে, নাকটি সরু, ঠোঁট দুটি ভারি নরম, প্রসারে একটু বড়—

গৌরমোহন বলিল, ‘তুমি আমার মডেল। দাঁড়িয়ে থাকো, তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আঁকব।’

প্যালেটের উপর রঙ মিশাইয়া তুলিতে তুলিতে সে ক্যান্বিসের দিকে ফিরিতেছে এমন সময় একটা চোখ-ধাঁধানো আইডিয়া ক্ষণেকের জন্য তাহাকে বিমূঢ় করিয়া দিল। তারপর সে চিৎকার করিয়া উঠিল— ‘ছায়া! ছায়া!’

‘এই যে আমি।’

‘কাছে এস। কই, তোমার মাথাটা দেখি। হ্যাঁ, এইবার চুপটি করে থাকো। এ বুদ্ধিটা এতক্ষণ মাথায় আসেনি। তোমার গায়েই তোমার ছবি আঁকব, যেমন কাচের উপর ছবি আঁকে। বুঝেছ?’

বাঁ হাতে ছায়ার মাথা ধরিয়া গৌরমোহন ডান হাতের রঙ-মাখা তুলি দিয়া তাহার গালে স্পর্শ করিল। গালের উপর পাকা ডালিমের রঙ লাগিয়া রহিল।

গৌরমোহনের ইচ্ছা হইল উঠিয়া নৃত্য করে। কিন্তু ইচ্ছা দমন করিয়া সে অতি যত্নে ছায়ার মুখে রঙ লাগাইতে আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে মুখখানি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ঠোঁটে একটু গোলাপী রঙ দিল, ভুরুতে কালো রঙ। কিন্তু—

চোখের মণিতে তো রঙ লাগানো যায় না, চোখ দুটি শূন্য রহিল। তবু মুখখানি চমৎকার; পান-পাতার আকৃতি, একটু কৃশ। গৌরমোহন বলিল, ‘ছায়া! কি সুন্দর তুমি! দাঁড়াও, চোখের ব্যবস্থা করছি।’

সে ছুটিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে নিজের ধোঁয়া-কাচের চশমা আনিয়া ছায়ার চোখে পরাইয়া দিল। ছায়ার মুখ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। রূপকথার রাজকন্যার মতো মুখ, ঘুমন্ত রাজকন্যার চোখে নিদালীর অন্ধকার।

ছায়া একটু ভঙ্গুর হাসিল।

গৌরমোহনের শিল্পী-মন আর শাসন মানিল না, সেই দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া ছায়াকে ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল।

তারপর নাটকীয় পরিস্থিতি।

গৌরমোহনের মাতৃদেবী শশিমুখী সহসা ঘরের দ্বারদেশে আবির্ভূতা হইলেন। এবং গৌরমোহনকে একটি দেহহীন মুণ্ডের চারিপাশে নৃত্য করিতে দেখিয়া একটি অনৈসর্গিক আর্তনাদ ছাড়িয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার পশ্চাতে গৌরমোহনের বন্ধু মোহনলাল রোমাঞ্চিত কলেবরে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

শশিমুখীর আবির্ভাব অনৈসর্গিক নয়। গৌরমোহন ফেরার হইবার পর তিনি প্রচণ্ড-বেগে তদন্ত শুরু করিয়া দিয়াছিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মোহনলাল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। তিনি তখন মোহনলালের গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন। মোহনলাল বেশিক্ষণ এই কণ্ঠ-নিষ্পেষণ সহ্য করিতে পারে নাই; সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল। তখন শশিমুখী মোহনলালকে সঙ্গে লইয়া গৌরমোহনকে ধরিতে আসিয়াছিলেন।

তারপরই নাটকীয় পরিস্থিতি।

গৌরমোহন বন্ধুকে ভর্ৎসনা করিল না, বরং বলিল, 'ভালই হয়েছে।' সে মোহনলালকে সব কথা খুলিয়া বলিল।

ছায়া ইতিমধ্যে নদীতে গিয়া মুখের রঙ ধুইয়া আবার সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সে ভীতু মানুষ, এইসব গণ্ডগোল দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে।

শশিমুখীর জ্ঞান হইলে তিনি ভয়ার্ত চক্ষে একবার চারিদিকে চাহিলেন, তারপর 'বাবা গো' বলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশনের দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গতিবেগ লক্ষ্য করিবার লোক ছিল না, থাকিলে এই দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত।

পাকুড়তলায় দাঁড়াইয়া গৌরমোহন মোহনলালকে বলিল, 'তুই মাকে নিয়ে ফিরে যা। শিগ্‌গির একটা পুরুত নিয়ে আসবি, দেরি করবিনে।'

'আচ্ছা। তখন তোর বৌকে ভাল করে দেখব।'

'আর একটা কথা। তুই তোর বাড়িটা আমাকে বিক্রি করে দে ভাই। এখানেই বৌ নিয়ে থাকব।'

'বিক্রি করব না। বাড়িটা তোর বিয়ের যৌতুক।— আচ্ছা চললাম, কাল-পরশুর মধ্যেই পুরুত নিয়ে ফিরব। দই, সন্দেশ, মাছ, কনের গয়না, বেনারসী সব নিয়ে আসব।'

মোহনলাল চলিয়া গেল। গৌরমোহন দাঁড়াইয়া হাত নাড়িতে লাগিল।

একটি বাহু আসিয়া তাহার বাহুর সহিত জড়াইয়া গেল। গৌরমোহন সেই দিকে ফিরিয়া বলিল, 'চল, আর একবার। ভাল করে এখনও তোমায় দেখা হয়নি।'

৫ আশ্বিন ১৩৬৩

মধু-মালতী

যাঁহারা মহারাষ্ট্র দেশে বাস করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, মারাঠীরা গান ভালবাসে, ফুল ভালবাসে এবং বাইসাইকেল চড়িতে ভালবাসে। পুণার অলিতে-গলিতে ফুলের দোকান, গান-বাজনার আখড়া, সাইকেলের আড়ৎ। আড়তে সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়; এক আনা ভাড়া দিয়া এক ঘণ্টা সাইকেল চড়িয়া বেড়াও। মেয়ে-মদ্দ সবাই সাইকেল চড়ে, বিশেষত কলেজের ছেলেমেয়েরা।

এদেশে মেয়েদের আলাদা কলেজ নাই, সকলে একসঙ্গে পড়ে। কলেজের ছুটি হইলে দেখা যায়, রাস্তা দিয়া সাইকেলের নব-যৌবন জলতরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে।

আমি প্রথম যেবার পুণায় আসি, সেবার শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি হোটেলে মাসখানেক ছিলাম। রাস্তার নাম টিলক রোড, অদূরে এস্ পি কলেজ; আরও একটু দূরে টিলার মাথায় পার্বতী মন্দিরের চূড়া দেখা যায়।

দক্ষিণ দিক ফাঁকা, দিগন্তে পাহাড়ের চক্ররেখা। এই চক্ররেখা চক্ষু দ্বারা অনুসরণ করিলে সিংহগড় দুর্গ চোখে পড়ে। শিবাজী মহারাজের সিংহগড়, যে সিংহগড় জয় করিবার মুহূর্তে তানাজি মালেশ্বর প্রাণ দিয়াছিলেন। সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে পড়ে আছে শুধু গড়—

শীতের শেষ। রাস্তার ধারে আমগাছে বোল ধরিয়াছে, মিষ্ট-কষায় গন্ধে চারিদিক আমোদিত। আমি ডাক্তারের আদেশে পুণায় আসিয়াছি, সকাল-বিকাল পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াই। হোটেলে আমার দ্বিতলের ঘরের সম্মুখে ছোট্ট একটি ব্যাল্‌কনি আছে, সেখানে দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক চলাচল দেখি। বোম্বাইয়ে থাকাকালে যে-পেট জবাব দিয়াছিল, তাহা এখন নানাবিধ স্থানীয় খাদ্য অম্লানবদনে হজম করিতেছে। দহি-বড়া, ইড়্‌লি-সম্বর, দোসা— কিছুই বাদ পড়ে না। দশদিন যাইতে না যাইতে প্রাচীনা পুণ্যা নগরীকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু আমি বিভূতি বাঁড়ুয্যে নই, পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইয়া তিলমাত্র আনন্দ পাই না। অথচ ডাক্তারের হুকুম।

একদিন ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটি বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল। সামনেই রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড— বামনরাও সাইকেল মার্ট। সাইকেলের দোকান। কত লোক আসিতেছে, সাইকেল ভাড়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে। আমিও সাইকেল চড়িয়া বেড়াই না কেন? অবশ্য অনেকদিন চড়ি নাই, কিন্তু সাঁতার কাটা এবং সাইকেল চড়া মানুষ ভোলে না। সুতরাং সাইকেল চড়িয়া ডাক্তারের আজ্ঞা পালন করিব। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

বিকেলবেলা সাইকেলের দোকানে গেলাম। দোকানদার বামনরাও খাতায় আমার নাম-ধাম লিখিয়া লইয়া সাইকেল দিল। বামনরাওয়ের চেহারা বেঁটে, মজবুত, বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ। দোকানের পেছনের একটি ঘরে সস্ত্রীক বাস করে।

অতঃপর রোজ দু'বেলা সাইকেল চড়িয়া বেড়াই। শহর বাজার এড়াইয়া পুণার কিনারে কিনারে ঘুরি। কখনও যাই গণেশখিণ্ডের দিকে, কখনও খড়্‌গবৎসলার হ্রদের পানে। আনন্দে আছি; বামনরাওয়ের সঙ্গে প্রণয় জন্মিয়াছে। সে অল্পস্বল্প হিন্দী বলিতে পারে; নির্বান্ধব পুরীতে সেই আমার প্রথম বন্ধু।

প্রস্তাবনা শেষ করিয়া এবার আসল কথায় আসা যাক্।

সে-রাত্রে যথাসময় আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। বোধ হয়

দিবানিদ্রা কিছু বেশি হইয়া গিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া বই পড়িবার চেষ্টা করিলাম; তাহাতে ঘুম আসে বটে, কিন্তু বই বন্ধ করিলেই তন্দ্রা ছুটিয়া যায়।

রাত্রি প্রায় একটা পর্যন্ত ঝুলোঝুলি করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। গায়ে বালাপোশ জড়াইয়া ব্যাল্‌কনিতে গিয়া দাঁড়াইলাম।

বাহিরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। এক আকাশ নক্ষত্র যেন শীতের বাতাস লাগিয়া কাঁপিতেছে। রাস্তায় লোক নাই, আবছায়া পথের দুই ধারে দীপস্তম্ভগুলি সারি দিয়া এই নিশীথ নিস্তব্ধতাকে পাহারা দিতেছে।

পাঁচ মিনিট দাঁড়াইয়া আছি, উত্তপ্ত মুখে বাতাসের শীতল করস্পর্শে মন্দ লাগিতেছে না। হঠাৎ রাস্তার এক দিক হইতে কিড়িং কিড়িং শব্দ কানে আসিল। সাইকেল আসিতেছে। একটু বিস্মিত হইয়া সেই দিকে তাকাইলাম। সাইকেল দেখা গেল না, এখনও দূরে আছে। কিন্তু রাস্তা নির্জন, সাইকেল চালক কাহাকে দেখিয়া ঘন্টি বাজাইল?

তাকাইয়া রহিলাম।

অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, এক জোড়া সাইকেল পাশাপাশি আসিতেছে, তাদের ল্যাম্প নাই। সহসা মধুর হাসির শব্দ কানে আসিল। দুইজন একসঙ্গে হাসিতেছে, একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। কিন্তু দু'জনের হাসি এক সুরে বাঁধা। একজন উদারা, একজন মুদারা।

সাইকেল দু'টা ক্রমশ কাছে আসিতেছে, এবার তাহাদের স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। হঠাৎ ঘাড়ের রোঁয়া শক্ত হইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। সাইকেল দু'টা আসিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের আরোহী নাই। আরোহীর আসন শূন্য, কেবল দু'টা জড় সাইকেল পরস্পর সমান্তরালে চলিয়া আসিতেছে!

বুকের রক্ত হিম হইয়া গিয়াছে, তবু বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া আছি। সাইকেল দু'টা স্বচ্ছন্দ গতিতে আসিতেছে, কোনও ত্বরা নাই। ঠিক আমার সামনে দিয়া যাইতে যাইতে থামিয়া গেল; মনে হইল অদৃশ্য আরোহীরা সাইকেল হইতে নামিল। নিথর বাতাসে যেন ফিসফিস কথা বলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর সাইকেল দু'টি বামনরাওয়ের দোকানের দিকে গেল। দরজা বন্ধ, সাইকেল দু'টি দরজার গায়ে হেলিয়া দাঁড়াইল। কিড়িং করিয়া একবার ঘন্টি বাজিল।

তারপর আর কোনও সাড়া-শব্দ নাই।

ব্যাল্‌কনি হইতে আমি ঘরে আসিয়া বসিলাম। এ কি চোখের ভুল? কিন্তু না, শুধু চোখের ভুল হইতে পারে না; হাসি শুনিয়াছি, ঘন্টির আওয়াজ শুনিয়াছি! তবে কি অনিদ্রাবশতঃ আমার মস্তিষ্ক এতই উত্তপ্ত হইয়াছে যে জাগিয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি? কিংবা—

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে আমি আবার তাড়াতাড়ি ব্যাল্‌কনিতে ফিরিয়া গেলাম।

বামনরাওয়ের দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ আছে, কিন্তু সাইকেল দু'টা অদৃশ্য হইয়াছে।

শেষরাত্রির দিকে ঘুমাইয়া পড়িলাম; যখন ঘুম ভাঙিল তখন ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। প্রাতর্ভ্রমণের আর সময় নাই; কারণ পুণায় শীতকালেও রৌদ্র বেশ কড়া। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ব্যাল্‌কনিতে গিয়া দাঁড়াইলাম।

বামনরাওয়ের দোকান খোলা রহিয়াছে, রাস্তায় কর্মদিবসের ব্যস্ত তৎপরতা; মোটর টাঙা অটো-রিক্সা ও সাইকেলের ছুটাছুটি। কাল রাত্রি একটার সময় এই পথের ছায়াচ্ছন্ন নির্জনতায় দু'টি স্বয়ংচল সাইকেল আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল বিশ্বাস করা কঠিন।

দুপুরবেলা বামনরাও সাইকেল মার্টে গেলাম।

সাইকেল-ভাড়াটে খদ্দেরের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, বামনরাও মোটা একটা খাতায় হিসাব লিখিতেছে। বলিল, 'কাকা, আজ তুমি বেড়াতে গেলে না?'

মারাঠীরা যাহাকে খাতির করে তাহাকে 'কাকা' বলিয়া ডাকে, কিন্তু সকলকেই তুমি বলে।

আমি একটি লোহার চেয়ারে বসিয়া বলিলাম, 'না, ওবেলা যাব। বামনরাও, কাল রাত্রি একটার সময় তোমার কোনও খদ্দের সাইকেল ফেরত দিতে এসেছিল?'

বামনরাও চকিতে আমার পানে চাহিল, তারপর যেন চিন্তা করিতেছে এমনি ভাবে ঘাড় উঁচু করিয়া গাল চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, ‘কই না তো! এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ কাকা?’

বলিলাম, ‘কাল রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছিল না, ব্যাল্‌কনিতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। মনে হল কারা দুটো সাইকেল রেখে চলে গেল।’

সাইকেলে যে আরোহী ছিল না সে কথা বলিলাম না।

বামনরাও খাতার ওপর চোখ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, ‘তুমি ভুল দেখেছ কাকা। অত রাত্রে কে সাইকেল ফেরত দিতে আসবে! মারাঠীরা রাত্রি দশটার মধ্যে সব ঘুমিয়ে পড়ে। তোমারও বেশি রাত জাগা ভাল নয়; কাহিল শরীর, আবার অসুখে পড়ে যাবে।’

দেখিলাম বামনরাও সত্য গোপন করিতেছে, নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু আছে। তাহাকে আর প্রশ্ন করিলাম না, চলিয়া আসিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, আজ রাত্রেও পাহারা দিব।

মধ্যাহ্নে বেশ খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়া বৈকালে বামনরাওয়ের সাইকেল লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বামনরাও আমার পানে বক্র কটাক্ষপাত করিল। তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। যদি কিছুই নয়, তবে লোকটা এমন ঘটি-চোরের মতো তাকাইতেছে কেন?

রাত্রি সাড়ে ন’টার পর আহার সম্পন্ন করিয়া ঘরের আলো নিভাইলাম, ব্যাল্‌কনিতে চেয়ার লইয়া বসিলাম। এমন ভাবে বসিলাম যাহাতে আমাকে বাহির হইতে দেখা না যায়, অথচ আমি সাইকেলের দোকান দেখিতে পাই। বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম নগর ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িতেছে। দোকানগুলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল বিরল হইয়া থামিয়া গেল।

বামনরাও প্রায় সাড়ে দশটার সময় দোকান বন্ধ করিল, দু’টি সাইকেল বাহিরে পড়িয়া রহিল। দরজা লাগাইবার সময় সে উৎকণ্ঠিত চক্ষে আমার ব্যাল্‌কনির দিকে তাকাইল।

আমি ঘাপটি মারিয়া রহিলাম।

নগর-গুঞ্জন ক্ষান্ত; রাত্রির গাঢ়তা ঘনীভূত হইতে লাগিল। পথের দীপস্তম্ভমালা নিস্পলক চাহিয়া আছে। আকাশে লুব্ধক নক্ষত্র মৃগশিরাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছে কিন্তু ধরিতে পারিতেছে না।

ঘড়িতে সাড়ে এগারটা। গায়ে বালাপোশ সত্ত্বেও বেশ কাঁপুনি ধরিয়াছে। আমি সঙ্গে একটি মঙ্কি-ক্যাপ আনিয়াছি। সেটি মাথায় পরিলে কান দিয়া ঠাণ্ডা ঢুকিতে পারিবে না। বামনরাওয়ের দোকানের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম বন্ধ দরজার সামনে সাইকেল দু’টি পরস্পর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

চট্ করিয়া ঘরে গিয়া মঙ্কি-ক্যাপ পরিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বোধ হয় আধ মিনিটও সময় লাগে নাই। কিন্তু এ কি! ইহারই মধ্যে সাইকেল দু’টি অদৃশ্য হইয়াছে।

বোকার মতো চাহিয়া রহিলাম।

দূরে টিং টিং করিয়া সাইকেলের ঘন্টি বাজিল, একটু মিষ্ট হাসির আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। উহারা কি ওত পাতিয়া ছিল? আমি যে পাহারা দিতেছি তাহা জানিতে পারিয়াছে? আমার ঘাড়ের রোঁয়া আবার কাঁটা দিয়া উঠিল।

কিন্তু ছাড়িব না। একবার বোকা বনিয়াছি, দ্বিতীয়বার বোকা বনিব না। যখন সাইকেল লইয়া গিয়াছে তখন নিশ্চয় ফিরাইয়া দিতে আসিবে।

বামনরাওয়ের দরজার ওপর চোখ রাখিয়া বসিয়া রহিলাম। একটা বাজিল। একটু সজাগ হইয়া বসিলাম। দু’টা বাজিল। এখনও সাইকেলের দেখা নাই। মাঝে মাঝে মনটা খালি হইয়া যাইতেছে, চোখ দু’টা জুড়িয়া আসিতেছে—

চোখে কিছু দেখিলাম না, কানেও কিছু শুনিলাম না, হঠাৎ পঞ্চইন্দ্রিয় সতর্ক ভাবে সজাগ হইয়া উঠিল।

সাইকেল দু’টা চুপিচুপি বামনরাওয়ের দ্বারের দিকে যাইতেছে। নিঃশব্দে তাহারা পরস্পরের গায়ে হেলান

দিয়া দাঁড়াইল; টুং করিয়া একবার ঘন্টির মৃদু শব্দ হইল। তারপর আর কোনও সাড়াশব্দ নাই। যাহারা সাইকেল চড়িয়া আসিয়াছিল তাহারা চলিয়া গিয়াছে।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কাটিয়া গেল।

তন্দ্রাবেশ ছুটিয়া গিয়াছে, নিষ্পলক চক্ষে সাইকেল মার্টের পানে চাহিয়া আছি... খুট্‌ করিয়া শব্দ হইল। দরজা একটু খুলিয়া বামনরাও গলা বাড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিল, তারপর একে একে সাইকেল দু'টি তুলিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

দরজা আবার বন্ধ হইল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে সাইকেল মার্টে গেলাম। বামনরাও একলা ছিল। তাহাকে বলিলাম, 'বামনরাও, কাল রাত্রে আমি সব দেখেছি।'

বামনরাওয়ের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, 'কী! কি দেখেছ কাকা?'

বলিলাম, 'যতটুকু চোখে দেখা যায় দেখেছি। অশরীরী ওরা কারা? আমি জানতে চাই।'

বামনরাও ভীত স্বরে বলিল, 'কাকা, একথা কাউকে বোলো না। জানাজানি হলে ওরা আর আসবে না। ওরা ভারি পয়মন্ত, ওরা যদি না আসে, আমার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।'

'বেশ, কাউকে বলব না। কিন্তু ব্যাপার আমাকে বলতে হবে।'

বামনরাও কিছুক্ষণ ঘাড় নিচু করিয়া ভাবিল। শেষে অনিচ্ছাভরে বলিল, 'আজ রাত্রে দোকান বন্ধ করবার পর তুমি এসো। তখন বলব।'

সে-রাত্রে বন্ধ দোকানঘরে বসিয়া বামনরাওয়ের কাহিনী শুনিলাম। কাহিনীতে চমকপ্রদ নূতনত্ব কিছু নাই, কালে কালে দেশে দেশে এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে; যৌবনের কাছে মানুষের সংঘবদ্ধ বিষয়বুদ্ধি পরাভূত হইয়াছে। আমরা যখন মানুষের দুঃখদুর্দশা দীনতার কথা চিন্তা করি তখন ভুলিয়া যাই, মানুষ কোনও দিন জীবনের কাছে মাথা হেঁট করে নাই, সে চিরদিন অপরাজিত।

বামনরাও বলিল, 'বছর তিনেক আগেকার কথা। আমি তখন এখানে নতুন দোকান খুলেছি। সাইকেলের দোকানের পক্ষে জায়গাটা ভাল। কাছেই এস্‌ পি কলেজ, অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে পড়ে। বেশির ভাগ তারাই সাইকেল ভাড়া নিয়ে আমার দোকান চালু রেখেছে—'

এই পর্যন্ত বলিয়া বামনরাও থামিল, উৎকর্ণ হইয়া যেন কি শুনিল। তারপর বলিল, 'একটু বসো, আমি আসছি—'

সে দরজা খুলিয়া দুইটি সাইকেল বাহিরে রাখিয়া আসিল; একটি মেয়েদের সাইকেল, একটি পুরুষদের।

বাহিরে তখন নিশুতি হইয়া গিয়াছে।

বামনরাও ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

তাহার স্ত্রী দুই বাটি গরম চা রাখিয়া গেল। একটি বাটি আমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া এবং অন্যটি নিজের কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বামনরাও আবার বলিতে শুরু করিল—

'এস্‌ পি কলেজে একটি ছেলে পড়ত, তার নাম মধুকর। বোধ হয় উঁচু কেলাসে পড়ত, আমি যখন তাকে দেখি তখন তার বয়স একুশ-বাইশ। চমৎকার চেহারা, টক্‌টকে রঙ, লম্বা ছিপছিপে গড়ন। মারাঠীদের মধ্যে এমন দেখা যায় না, যেন ময়ূর-বাহন কার্তিক। খুব ভাল ক্রিকেট খেলতে পারত।

'আমি দোকান খোলবার পর মধুকর প্রায়ই আসত। তার নিজের সাইকেল ছিল না, হেঁটে কলেজে আসত। কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হলে আমার কাছ থেকে সাইকেল ভাড়া নিয়ে যেত। কত ছেলেই তো আসে, কিন্তু মধুকরের চেহারায় এমন একটি মিষ্টতা ছিল, ব্যবহারে এমন শান্ত ছেলেমানুষী ছিল যা সচরাচর চোখে পড়ে না। বড় বংশের ছেলে, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, কিন্তু শরীরে এতটুকু অহঙ্কার ছিল না।

'একদিন মধুকরের সঙ্গে একটি মেয়ে এল। সম্প্রতি স্কুল থেকে পাস করে কলেজে ঢুকেছে। ছোটখাটো

মেয়েটি, বয়স বড়জোর সতেরো; মধুকরের মতো সুন্দর নয়, কিন্তু ভারি মিষ্টি নরম চেহারা। নাম মালতী।

'মধু আর মালতী দু'টি সাইকেল নিয়ে চলে গেল। এদেশে মেয়েদের পর্দা নেই, কোনও দিন ছিল না; উত্তর ভারতের ঐ ম্লেচ্ছ বর্বরতা মারাঠাদেশ কখনও স্বীকার করে নেয়নি। আমাদের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়ে, একসঙ্গে খেলাধুলো করে। এখানে ছেলেমেয়েরা চোখাচোখি হলেই প্রেমে পড়ে না; কিন্তু যখন সত্যিই প্রেমে পড়ে তখন মা-বাপকে গিয়ে বলে, মা-বাপ বিয়ে দেন। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলে কেউ কিছু মনে করে না, টিপ্পনীও কাটে না।

'যা হোক, মধু আর মালতী মাঝে মাঝে আসে, সাইকেল নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, আবার সন্ধ্যার পরেই সাইকেল ফেরত দিয়ে যায়। অন্য ছেলেমেয়েরাও আসে। কাছেপিঠে অনেক খোলা জায়গা আছে; যেখানে একটু সবুজ ঘাসের টুকরো পায় সেখানে বসে দু'দণ্ড গল্প-সল্প করে, তারপর যে-যার ঘরে ফিরে যায়।'

বামনরাও চুপ করিল, উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, তারপর নিম্নস্বরে বলিল, 'ওরা সাইকেল নিয়ে গেল—'

আমার কৌতূহল হইল; দ্বার খুলিয়া উঁকি মারিলাম। সাইকেল দু'টা সত্যই অদৃশ্য হইয়াছে।

ফিরিয়া আসিয়া বসিলে বামনরাও বলিল, 'যা হোক, তারপর শোন— একদিন অন্য দু'টি কলেজের ছেলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে শুনতে পেলাম। মালতীও খুব বনেদী ঘরের মেয়ে, কিন্তু দুই বংশে ভীষণ শত্রুতা। আজকের শত্রুতা নয়, সেই পেশোয়াদের আমল থেকে চলে আসছে। সেকালে দুই পক্ষের রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে ছোরাছুরি চলত, এখন দু'পক্ষ মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। তারা যদি জানতে পারে মধু আর মালতী একসঙ্গে সাইকেল চড়ে বেড়াতে যায়, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।

'কিছু দিন পরে দেখলাম মধু আর মালতী সাবধান হয়েছে। একসঙ্গে দোকানে আসে না; সন্ধ্যের পর মধু দু'খানা সাইকেল নিয়ে যায়, মালতী বোধ হয় আড়ালে কোথাও লুকিয়ে থাকে। তারপর সকলের চোখ এড়িয়ে দু'জনে বেরোয়। ওদের বাড়ির লোকেরা বোধ হয় কিছু সন্দেহ করেছিল।

'একদিন রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তারা সাইকেল ফেরত দিতে এসেছে। দু'জনের মুখ তৃপ্তিতে ভরা। মালতী একবার মধুকরের মুখের পানে তাকাল। সেই চাউনি দেখে বুঝতে পারলাম, এ শুধু যুবক-যুবতীর মধ্যে সহজ বন্ধুত্ব নয়, মালতীর বুক মধুতে ভরে উঠেছে।

—'কাকা, আমার বয়স হয়েছে, ভালবাসাবাসির ব্যাপার অনেক দেখেছি। দু'টি ছেলে-মেয়ের মধ্যে ভালবাসা হল, তারপর যখন তারা দেখল বিয়ে হবার নয়, তখন দু'চার দিন কান্নাকাটি করল, মন খারাপ করে রইল। ক্রমে আবার সব ঠিক হয়ে গেল। এ কিন্তু সে জিনিস নয়। এ একেবারে জীবন-মরণের ব্যাপার মধু আর মালতী প্রাণ দেবে তবু পরস্পরকে ছাড়বে না।

'হঠাৎ একদিন ওদের যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গেল। দশ দিন আর মধুর দেখা নেই। তারপর একদিন দুপুরবেলা মধু এল, বলল, একটা সাইকেল দাও একটু ঘুরে আসি।

'দেখলাম, তার মুখ-চোখ শুকনো, চুল রুক্ষ, যেন কতদিন স্নান করেনি, খায়নি।

'আমি বললাম, একটা সাইকেল?

'সে বলল, হ্যাঁ, মালতীকে ওরা কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে, ঘরে বন্ধ করে রেখেছে।

'মধু দুই হাত মুঠি করে কিছুক্ষণ ঘোলাটে চোখে চেয়ে রইল, তারপর সাইকেল না নিয়েই চলে গেল।

'তিন-চারদিন পরে বর্ষার বৃষ্টি নেমেছে। পুণায় বৃষ্টি মুষলধারে বড় হয় না। রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্; চারিদিক ঠান্ডা। আমার দোকানে রাত্রি ন'টার মধ্যেই খদ্দের আসা বন্ধ হয়ে গেছে। আন্দাজ সাড়ে ন'টার সময় আমি দোকান বন্ধ করে শুতে যাচ্ছি, দরজায় ঠক্ ঠক্ টোকা পড়ল। দোর খুলে দেখি— মধু আর মালতী।

'দু'জনের জামা-কাপড় ভিজে, চোখে মুখে বাঁধন-ছেড়া উল্লাস। মধু বলে উঠল, বামনরাও মালতীকে দোতলার ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। ও ব্যাল্‌কনি থেকে বিছানার চাদর ঝুলিয়ে নেমে এসেছে।

'কী ডাকাত মেয়ে। মালতীর দিকে চেয়ে দেখলাম, তার মাথার চুল ভিজে, মুখে বিন্দু বিন্দু জলের ছিটে লেগেছে, কাপড়-চোপড় একটু এলোমেলো। সে মুখ টিপে হাসছে।

‘আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, পালিয়ে এসেছে! তারপর?

‘মধু বলল, তারপর আর কী? একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আবার নিজের ঘরে উঠে শুয়ে থাকবে, কেউ জানতে পারবে না। মধু জোরে হেসে উঠল— দাও, দাও শিগ্‌গির সাইকেল দাও।

‘অ্যাঁ। এই বর্ষার রাতে বেড়াতে বেরুবে!

‘বর্ষা কই? এর নাম কী বর্ষা! দাও সাইকেল।

‘দু’জনে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল আমিও ওদের প্রেমের ষড়যন্ত্রে শরিক হয়ে পড়েছি।

‘তারপর বার তিনেক ওরা সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল। আমি দোকান বন্ধ করবার পর এসে দোরে টোকা দিত, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেত; ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে সাইকেল রেখে বাড়ি ফিরে যেত।

‘আমি ওদের দেখতাম আর ভাবতাম— কী দুঃসাহসী ওরা! একবার যদি ধরা পড়ে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। এ রকম ব্যাপারে মেয়ে-পক্ষেরই অপমান বেশি, ওরা যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে মধুকে প্রাণে বাঁচতে হবে না।

‘হলও তাই। এ ব্যাপার বেশিদিন চলল না। একদিন রাত্রি এগারোটার সময় আমার দোরে ধাক্কা পড়ল। দোর খুলে দেখি মধু আর মালতী— দু’জনেরই দিশাহারা অবস্থা।

‘মধু বলল, বামনরাও, শিগ্‌গির সাইকেল দাও, ওরা জানতে পেরেছে।

‘বললাম, সে কি! এত রাত্রে তোমরা কোথায় যাবে?

‘তা জানি না—

‘এই সময় দূরে মোটর-বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শোনা গেল। মালতী চমকে উঠে বলল, ঐ দাদা আসছে!

‘ওরা আর দাঁড়াল না, দু’টো সাইকেল নিয়ে বিদ্যুতের মতো বেরিয়ে গেল।

‘আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই মোটর-বাইক এসে দোকানের সামনে থামল। আরোহী চড়া গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করল— একটা মেয়ে আর একটা ছেলে এখান থেকে সাইকেল নিয়ে গেছে?

‘আমি ঢোঁক গিলে বললাম, হ্যাঁ।

‘সে প্রশ্ন করল, কোন দিকে গেছে?

‘বললাম, তা দেখিনি।

‘লোকটা লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

‘তার কোমরে একটা খাপসুদ্ধ ছোরা গোঁজা রয়েছে। ভারি জোয়ান চেহারা কিন্তু মুখের আদল থেকে চেনা যায়, মালতীর দাদা। সে আমাকে ধমক দিয়ে বলল— তুই নিশ্চয় জানিস্। বল্ তারা কোথায় গেছে।

‘কাকা, আমি মারাঠী, মিষ্টি কথার গোলাম; কিন্তু চোখ রাঙিয়ে আমাকে কেউ ভয় দেখাতে পারে না। আমি একটা স্প্যানার তুলে নিয়ে বললাম, যাও আমার দোকান থেকে, নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব।

‘এই সময় আর-একটা মোটর-বাইক এসে দাঁড়াল। তার আরোহী ডেকে বলল, জয়ন্ত! খবর পেয়েছি, ওরা সিংহগড়ের দিকে গেছে।

‘মালতীর ভাই একলাফে গিয়ে নিজের মোটর-বাইকে বসল।

‘দুটো মোটর-বাইক গর্জন করে ছুটে বেরিয়ে গেল।

‘সে-রাত্রে আমি আর কিছু দেখিনি।

‘পরে জানতে পেরেছিলাম, মধু আর মালতী সিংহগড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা যখন খড়্গবৎসলার হ্রদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় পিছনে মোটর-সাইকেল গর্জন শুনতে পায়, তারা সাইকেলসুদ্ধ হ্রদে লাফিয়ে পড়েছিল।’—

বামনরাও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

আমিও ভাবিতে লাগিলাম, এ ছাড়া এ গল্পের অন্য পরিণতি কি ছিল না? যাহারা পরস্পরকে একান্ত ভাবে চায় তাহারা ব্যর্থ হইয়া আত্মহত্যা করে কেন? প্রেম কি তবে একটা সাময়িক উন্মাদনা? কিংবা সংসার এত প্রেম পছন্দ করে না তাই তাহার এই পরিণাম?

কিন্তু গল্প এখনও শেষ হয় নাই। বলিলাম, 'তারপর?'

বামনরাও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ তুলিল।

'তারপর দিন দশেক কেটে গেল। ওদের মৃত্যু নিয়ে শহরে বেশ হৈচৈ হয়েছিল, তাও ক্রমে নিভে এল। দুটি অপরিণত-বুদ্ধি ছেলেমেয়ের হঠকারিতার কথা কে বেশিদিন মনে করে রাখে! দৈনিক কাগজে খানিক লেখালেখি হল, সাপ্তাহিক পত্রিকায় কবিতা বেরুল, তারপর সব চুপচাপ।

'একদিন বেশ বর্ষা নেমেছে, আমি দশটার মধ্যেই দোকানপাট বন্ধ করে শুয়ে পড়েছি। তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় দোরে খুট্ খুট্ শব্দ হল। তন্দ্রা ছুটে গেল, আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। ঠিক মধু যেভাবে টোকা দিত সেই টোকা। কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় বসে রইলাম। আবার টোকা পড়ল। তখন উঠে দরজা খুললাম।

'বাইরে কেউ নেই। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, জনমানুষ নেই। দরজা বন্ধ করে যেই পিছু ফিরেছি অমনি আবার টোকা পড়ল। আবার দরজা খুললাম... কেউ নেই। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

'এইরকম বার পাঁচেক হবার পর বুঝতে পারলাম। ওরা এসেছে, সাইকেল চায়। দুটো সাইকেল বাইরে রেখে দোর বন্ধ করে দিলাম। আর টোকা পড়ল না। দশ মিনিট পরে দরজা খুলে সন্তর্পণে গলা বাড়ালাম, সাইকেল অদৃশ্য হয়েছে। ঘণ্টাখানেক বাদে বাইরে কিড়িং শব্দ হল।

'দোর খুললাম। সাইকেল ফিরে এসেছে।

'সেই থেকে প্রায় রোজ এই ব্যাপার চলছে। তুমি নিজের চোখে দেখে ফেলেছ, তোমার কাছে লুকোবার চেষ্টা বৃথা। আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানে না। ওরা ভারি পয়মন্ত, দু'দিন না এলে আমার খদ্দের কমে যায়। কাকা, তুমি কাউকে বলো না।'

'বলব না,' বলিয়া আমি উঠিলাম।

এই সময় বাহিরে সাইকেলের মৃদু ঘন্টি বাজিল— কিড়িং।

আমি বামনরাওয়ের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। সে গিয়া দ্বার খুলিল। দেখিলাম, সাইকেল দু'টি পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

১০ বৈশাখ ১৩৬৪

চিরঞ্জীব

লোকটিকে দেখিয়া আড়াই শত বৎসর বয়স বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, বড়জোর ষাট-বাষট্টি। লম্বা-চওড়া গড়ন, পাকা কাশীর পেয়ারার মতো গায়ের রঙ, গোঁফ ও গালপাট্টা বেশির ভাগ পাকিয়া গিয়াছে। পৌরাণিক নাটকে পিতামহ ভীষ্মের ভূমিকায় লোকটিকে বেশ মানাইত। বৃদ্ধ বটে, কিন্তু কোথাও স্থবিরতার চিহ্ন নাই। প্রথম তাহাকে দেখিবামাত্র দুইটি কথা আমার মনে আসিয়াছিল: এক, লোকটি অনেক দূর হইতে আসিতেছে; দুই, লোকটির দেহ অত্যন্ত কঠিন স্থায়ী ধাতুতে নির্মিত। একবার দেখিয়া কেন এমন ধারণা হইয়াছিল জানি না—

কিন্তু গোড়া হইতে এই বিচিত্র মানুষটির কথা বলি।

পুণায় সিদ্ধিবিনায়ক গণপতির একটি প্রাচীন মন্দির আছে। পূর্বকালে মন্দিরের চারিপাশে প্রকাণ্ড দিঘি ছিল, পেশোয়ারা নৌকায় চড়িয়া দেব-দর্শনে আসিতেন। এখন দিঘি শুকাইয়া গিয়াছে, শুষ্ক খাদ পার হইয়া মন্দিরে যাইতে হয়। আমি পুণায় আসিয়া ডেরাডাণ্ডা ফেলিবার পর হইতে প্রতি চতুর্থী তিথিতে নিয়মিত গিয়া গণপতিকে প্রণাম করিয়া আসি।

বড় জাগ্রত দেবতা।

এবার আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে অপরাহ্নকালে মন্দিরে প্রণাম করিতে গিয়াছি, হঠাৎ সবেগে বৃষ্টি নামিল। ছাতা আনি নাই, পুণায় বর্ষাকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়, ছাতার দরকার হয় না। কিন্তু আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে বজ্র বিদ্যুৎ ও বর্ষণের সমারোহ লাগিয়া গেল।

মন্দিরে আট্‌কা পড়িলাম। মন্দির-সংলগ্ন টিনের চালার নীচে বেঞ্চিতে বসিয়া বৃষ্টি ধরণের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

চালার নীচে আরও কয়েকজন লোক আছে। অধিকাংশ স্ত্রীলোক; বেঞ্চির উপর পা তুলিয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে গল্পগুজব করিতেছে।

একটি পুরুষ চালার এক কোণে বসিয়া ছিল, এতক্ষণ তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করি নাই। বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় সে উঠিয়া আসিয়া আমার পাশে বেঞ্চিতে বসিল। তাহার চেহারার বর্ণনা আগেই করিয়াছি; হাতে মোটা একটা লাঠি, পরিধানে খাটো ধুতি ও পুরা আস্তিনের মেরজাই, কাঁধে একটা মোটা কালো কম্বল; মস্তক নিরাবরণ। লোকটির কাপড়-চোপড় যদি গৈরিক রঙের হইত তাহা হইলে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী মনে করিতাম।

টিনের চালার উপর বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ সমানে চলিয়াছে, ভিতরে অপরিচ্ছন্ন ময়লা আলো।

লোকটি কয়েকবার আমার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া হঠাৎ মোটা গলায় প্রশ্ন করিল, 'আপনি কি বাঙালী বটে?'

বোধ হয় আমার পাঞ্জাবি ও ধুতির কোঁচা দেখিয়া বুঝিয়াছে। বলিলাম, 'হ্যাঁ। আপনি?'

সে বলিল, 'হ্যাঁ, আমিও বাঙালী। আপুনি কি পুণার বাসিন্দা বটে?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ। আপনি?'

'আমি পরিব্রাজক, ইতি-উতি ঘুরে বেড়াই।' সে আমার দিকে ঝুঁকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'এখানে বিরিঞ্চি বর্মা নামে কাউকে আপুনি চিনেন নাকি?'

‘বিরিঞ্চি বর্মা। না, কখনো নাম শুনিনি। কে তিনি?’

‘দেখেন নাই? যখের মতো কালো লম্বা চেহারা, ড্যাবডেবে চোখ, একটা কান বড়, অন্য কানটা ছোট, বাঁ গালে কাটা ঘায়ের মতো লালচে একটা জড়ুল! দেখেন নাই তাকে?’

লোকটির কথা বলিবার ভঙ্গি একটু সেকেলে ধরনের, মনে হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা শুনিতেছি। বলিলাম, ‘না, বিরিঞ্চি বাবা— থুড়ি— বিরিঞ্চি বর্মাকে আমি দেখিনি। আপনার আত্মীয়?’

লোকটার চক্ষু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল— ‘আত্মীয়! সে আমার ঘোর শত্রু, সর্বদা আমার সর্বনাশ করবার চেষ্টা করছে’— তারপর সুর বদলাইয়া বলিল, ‘এটা ১৮৭৯ শকাব্দ বটে?’

সম্প্রতি শকাব্দ লইয়া জ্যোতির্বিদ মহলে বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বলিলাম, ‘হ্যাঁ, ১৮৭৯ শকাব্দ বটে। কেন বলুন দেখি?’

সে বলিল, তাহলে নিশ্চয় তার দেখা পাব। এই বছরে সে আসে। কোথাও না কোথাও আছে, এবার দেখা হলে আর ছাড়ছি না।’

কেমন ধোঁকা লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘শেষবার কত দিন আগে তাকে দেখেছেন?’

লোকটি বলিল, ‘১৭৭৯ শকাব্দে। সিপাহী যুদ্ধের সময়।’

কিছুক্ষণের জন্য গুম্ হইয়া গেলাম। মনের মধ্যে একটি আশঙ্কা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল— পাগল নয় তো? আড়চোখে তাহাকে নিরীক্ষণ করিলাম। বেশভূষা একটু অসাধারণ বটে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। শুনিলাম সে কতকটা আপন মনেই বলিয়া চলিল— ‘তখন আমি কাশীতে। একজন সিদ্ধপুরুষকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ চতুর্দিকে আগুন জ্বলে উঠল। দাবানলের মতো।— আপুনি দাবানল দেখেছেন?’

‘না।’

‘বনে আগুন লাগে। গ্রীষ্মকালে শুকনো গাছের ডালে ডালে ঘষা লেগে দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে, তারপর আগুন এক গাছ থেকে লাফিয়ে অন্য গাছে যায়; সারা বন জ্বলে ওঠে। কাঁচা গাছও পুড়ে ছাই হয়ে যায়—’

‘মাফ করবেন, আপনার নামটি কি?’

‘নাম? চিরঞ্জীব সিংহ।’

‘নিবাস?’

‘আদি নিবাস রাঢ় দেশ।’

‘বয়স কত?’

চিরঞ্জীব সিংহ এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, ‘বয়স? কে জানে... অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জন্ম... আমার জন্মদিনে একটা বট গাছ পোঁতা হয়েছিল, সেটা এখন দু’বিঘে জমির ওপর ছড়িয়ে গেছে—’

‘আপনার আত্মীয়স্বজন?’

‘কেউ নেই, সব মরে গেছে।’

‘যাক্। তা কাশীর কথা কি বলছিলেন?’

‘হ্যাঁ— কাশীর কথা।’—

চিরঞ্জীব ক্ষণেক চিন্তা করিল— ‘কাশীতে অনেক বনেদী বেশ্যা আছে।’

লোকটির কথা বলিবার বিচিত্র ভঙ্গি, এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অন্য কথা বলিতে আরম্ভ করে।

বলিলাম, ‘কাশীতে বনেদী বেশ্যা থাকতে পারে, আমি জানি না। কিন্তু আপনি বলছিলেন, সিদ্ধপুরুষের খোঁজে কাশী গিয়েছিলেন, হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল।’

‘হ্যাঁ— আগুন জ্বলে উঠল, লড়াইয়ের আগুন। মারামারি কাটাকাটি। কোম্পানীর লোক সিপাহীদের মারে, সিপাহীরা কোম্পানীর লোকদের মারে। দিল্লী আগ্রা কাশী গয়া মৃজাপুর, সব শহরেই রক্তারক্তি কাণ্ড। তখন জানতাম না যে বিরিঞ্চি এর মধ্যে আছে। জানলে কি আর হাতিয়ার না নিয়ে রাস্তায় বেরুতাম!’

‘বিরিঞ্চি লোকটা কে?’

‘লোকটা শয়তান, সাক্ষাৎ পাপের অবতার। যেখানে গণ্ডগোল, যেখানে ঝগড়া বিবাদ, যেখানে বেইমানি বিশ্বাসঘাতকতা, সেখানে সে আছে। মানুষের দুঃখ নিয়ে তার কারবার, মানুষের দুর্গতি নিয়ে তার ব্যবসা। মূর্তিমান শনি, মূর্তিমান রাহু।’

চিরঞ্জীব উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিলাম, ‘তারপর কাশীতে কি হল?’

সে কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর বলিল, ‘বিকালবেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি সামনে একদল কোম্পানীর পল্টন আসছে। সঙ্গে দুটো লালমুখো গোরা— আর বিরিঞ্চি। বিরিঞ্চির পরনে ফৌজী পোষাক।

‘আমাকে দেখে বিরিঞ্চি চিৎকার করে উঠল, গোরা দুটোকে খাটো গলায় কি বলল, তারপর তলোয়ার উঁচিয়ে আমার দিকে তেড়ে এল।

‘গোটা চার-পাঁচ সিপাহীও তার সঙ্গে হা-রে-রে-রে করে তেড়ে এল। আমার হাতে হাতিয়ার নেই, কি করি? পাশে একটা সরু গলি ছিল, ঢুকে পড়লাম।

‘জানতাম না যে গলিটা কানা গলি, দু’পাশে বেশ্যাদের বাড়ি। বিরিঞ্চি আর সিপাহীরা পিছনে হৈ-হৈ শব্দে ছুটে আসছে। বাড়িগুলোর দরজা জানলা পটাপট্ বন্ধ হয়ে গেল।

‘সবশেষে যে বাড়িটা গলির মুখ বন্ধ করে রেখেছে, তার সদর দরজার মাথার ওপর বারান্দা বেরিয়ে আছে, বাঈজী সেখানে বসে বেসাতি করে। আমার আর পালাবার রাস্তা নেই, আমি বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম।

‘গলি এত সরু যে দু’জন লোকের বেশি পাশাপাশি আসতে পারে না। দেখলাম আগে আগে বিরিঞ্চি আর একজন সিপাহী ছুটে আসছে, তাদের পিছনে আরও তিন-চার জন।

‘একটা সুবিধা, ওরা আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে মারতে পারবে না। কিন্তু ওদের হাতে তলোয়ার, আমার হাত খালি। খালি হাতে তলোয়ারের সঙ্গে কে লড়তে পারে?

‘ওরা যখন প্রায় আমার নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে, তখন ওপরের বারান্দা থেকে একটা মেয়ে সামনে ঝুঁকে চিৎকার করে বলল, ‘এই নাও তলোয়ার, বিদেশী কুত্তাগুলোকে মেরে তাড়িয়ে দাও।’

‘তলোয়ার লুফে নিলাম। তখন আর আমাকে মারে কে?

‘বিরিঞ্চি আর সিপাহীরা থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর সাবধানে এগিয়ে আসতে লাগল। বিরিঞ্চি হিংস্র জন্তুর মতো দাঁত বার করে রইল।

‘লড়লাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু আমি একা। ওরা সামনের দু’জন পিছু হটে তো আর দু’জন এগিয়ে আসে। ক্রমে আমার হাতের তলোয়ার বোঝার মতো ভারি হয়ে উঠল।

‘এই সময় হঠাৎ পিছনের দরজা খুলে গেল। আমি দরজায় পিঠ দিয়ে হাঁপাচ্ছিলাম, ভিতরে পড়ে গেলাম। অমনি দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

‘বেশ্যা মেয়েটা আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিল।

‘বিরিঞ্চি আর সিপাহীরা দরজা ভাঙবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। শেষ পর্যন্ত গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল।’

এই পর্যন্ত বলিয়া চিরঞ্জীব চুপ করিল।

বৃষ্টির বেগ যেন একটু কমিয়াছে, কিন্তু অন্ধকার কমে নাই; মেঘের অন্তর পথে সূর্যাস্ত হইয়াছে।

আমি বলিলাম, ‘তারপর?’

চিরঞ্জীব বলিল, ‘তারপর বিরিঞ্চির আর দেখা পাইনি।’

প্রশ্ন করিলাম, ‘আপনাকে যে তলোয়ার দিয়েছিল সে কে?’

‘সে ও বাড়ির বেশ্যা... তার নাম ছিল শিউ মোহিনী... চার বছর তার সঙ্গে ছিলাম। সে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিল।’

‘তারপর?’

‘তারপর সে মরে গেল। আমিও আবার বেরিয়ে পড়লাম।’

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম, ‘কিছু মনে করবেন না। আপনি যা বললেন তা থেকে মনে হয়, একশো বছর আগে সিপাহী যুদ্ধের সময় আপনি বেঁচে ছিলেন; এখনো দিব্যি বেঁচে আছেন। মাঝের এই একশো বছর আপনি কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন?’

আমার প্রশ্নের মধ্যে যে স্পষ্ট শ্লেষ ছিল তাহা সে ধরিতেই পারিল না, সহজ ভাবে বলিল, ‘নেপালে গুরুর আশ্রমে থাকতাম আর ইতি-উতি ঘুরে বেড়াতাম। কত রদ-বদল দেখলাম। মোগল গেল, লালমুখো ফিরিঙ্গি এল; এখন আবার ফিরিঙ্গি গিয়ে কালো চামড়া এসেছে। কিন্তু বিরিঞ্চিকে খুঁজে পাচ্ছি না।’

‘বিরিঞ্চি হয়তো মরে গেছে।’

চিরঞ্জীব মাথা নাড়িল, ‘না, সে আছে। সে না থাকলে মন্বন্তর আসবে কোথা থেকে? বুঝতে পারছেন না, সে শয়তান। একশো বছর অন্তর ভারতে মহাদুর্যোগ আসে, তখন সে মাথা তোলে। এই ভারতেই কোথাও সে পাপের বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এবার আমি তৈরি আছি, এবার তাকে ছাড়ছি না।’ বলিয়া কালো মোটা লাঠিটা তুলিয়া ধরিল।

‘লাঠি দিয়ে বিরিঞ্চিকে ঠেঙিয়ে মারবেন?’

‘কেবল লাঠি নয়। এই দেখুন—’ চিরঞ্জীব লাঠির মুঠ ধরিয়া ঘুরাইল। ভিতরে লিকলিকে লম্বা তলোয়ার রহিয়াছে। গুপ্তি লাঠি।

লোকটা সদ্য মানুষ কিংবা পাগল কিংবা গঞ্জিকা-বীর ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। যদি গঞ্জিকা-বীর হয়, আমাকে বোকা বানাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে! দেখি, জেরা করিয়া যদি ফাঁদে ফেলিতে পারি।

বলিলাম, ‘সিপাহী যুদ্ধের সময় যখন বিরিঞ্চির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন তাকে দেখেই চিনেছিলেন! তার মানে, আগে থাকতেই তাকে চিনতেন!’

সে বলিল, ‘চিনতাম বৈকি। বিরিঞ্চিকে কি আজ থেকে চিনি!’

‘তার আগে কবে তাকে দেখেছিলেন?’

‘কেন, ১৬৭৯ শকাব্দে, পলাশীর যুদ্ধের সময়। বিরিঞ্চি ছিল ক্লাইভের তেলেঙ্গি সিপাহীদের দলে। আর আমি—’

উঠিয়া পড়িলাম।

চিরঞ্জীবকে ফাঁদে ফেলা আমার কর্ম নয়, এই ভাবে পিছাইয়া পিছাইয়া হয়তো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে গিয়া ঠেকিবে।

এদিকে বৃষ্টিও থামিয়া আসিয়াছে। চলিয়া আসিবার সময় একটি শ্লেষ-বাণ নিক্ষেপ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না— ‘আচ্ছা, আজ আসি। আবার ১৯৭৯ শকে দেখা হবে।’

চিরঞ্জীবকে গঞ্জিকা-বীর বলিয়া মন হইতে সরাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি একটু গণ্ডগোল বাঁধিয়াছে। কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। সত্যই কি—?

পুণা ভারতের একটি সামরিক কেন্দ্র। এখানে যেসব রথী মহারথী আছেন, তন্মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা খুব অল্প নয়। আমি পুণায় আসার পর তাঁহাদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে।

চিরঞ্জীবের সহিত দেখা হইবার মাসখানেক পরে মেজর গাঙ্গুলীর বাড়িতে চায়ের জলসা ছিল। বিকালবেলা গিয়াছি। দেখিলাম ত্রিশ-চল্লিশ জন সপত্নীক অফিসার সমবেত হইয়াছেন। কয়েকজন অবাঙালীও আছেন।

একটি লোককে দেখিয়া স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া পড়িলাম। গৃহস্বামিনী শীলা দেবী পরিচয় করাইয়া দিলেন— 'ইনি কর্নেল ভর্মা, কয়েকদিনের জন্যে কাশ্মীর থেকে এসেছেন।'

যখের মতো কালো লম্বা চেহারা, ড্যাবডেবে চোখ, একটা কান ছোট একটা কান বড়, বাঁ গালে কাটা ঘায়ের মতো রক্তাভ জড়ুল। পরিধানে ফৌজী পোষাক নয়, সাধারণ বিলাতী পোষাক। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ।

আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, 'আপনার নাম কি বিরিঞ্চি বর্মা?'

কর্নেল ভর্মা ঈষৎ ভ্রূ তুলিলেন, 'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি করে?'

বলিলাম, 'চিরঞ্জীব সিংহের মুখে আপনার নাম শুনেছি।'

কর্নেল ভর্মার মুখে দ্রুত একটা পরিবর্তন হইল; ভদ্রতার মুখোশ ছাড়িয়া দাঁতগুলা হিংস্রভাবে বাহির হইয়া আসিল, চোখ দু'টাতে গরিলার মতো নিষ্ঠুর কুটিলতা ফুটিয়া উঠিল। তিনি একবার চারিদিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি ফিরাইয়া চাপা কর্কশ স্বরে বলিলেন, 'চিরঞ্জীব! কোথায় সে?'

বলিলাম, 'এখানে নেই, মাসখানেক আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল।'

কর্নেল ভর্মা ক্রূর মর্মভেদী দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ পিছু ফিরিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

আমি মোহাচ্ছন্নের মতো দাঁড়াইয়া রহিলাম।

চমক ভাঙিলে মনে হইল কর্নেল ভর্মাকে আরও দু'একটা প্রশ্ন করিলে ভাল হইত। অতিথিদের মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না।

মেজর গাঙ্গুলী বলিলেন, 'কর্নেল ভর্মা এইমাত্র চলে গেলেন। তাঁকে আজ রাত্রেই কাশ্মীর ফিরে যেতে হবে।'

১৯ বৈশাখ ১৩৬৪

মায়া কুরঙ্গী

জংলীবাবা যে সত্যকার একজন সাধুলোক, ঠক-দাগাবাজ নন, তার দুইটি প্রমাণ পাইয়াছিলাম। প্রথমত, অনুরাগী ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিতেছে দেখিলেই তিনি তারস্বরে এমন অশ্লীল গালিগালাজ শুরু করিতেন যে, রীতিমত গণ্ডারের চামড়া না হইলে কেহ তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে সাহস করিত না। দ্বিতীয়ত, তিনি এক মুষ্টি যবের ছাতু ছাড়া আর কিছু ভিক্ষা লইতেন না। প্রভাতে সর্বাগ্রে যে ভিক্ষা দিত তাহার ভিক্ষা লইতেন, আর কাহারও ভিক্ষা লইতেন না।

মহারাষ্ট্র দেশে বহু সাধু-সন্ত জন্মিয়াছেন; জ্ঞানেশ্বর একনাথ রামদাস তুকারাম সাঁইবাবা। বর্তমানেও বহু সাধু-সন্ত আছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সহজে দেখা দেন না। মানুষের বর্তমান জীবনধারা যে-পথে চলিয়াছে সাধু-সজ্জনেরা সে-পথ সযত্নে পরিহার করিয়া চলেন। আর আমরা, যাহারা প্রতীচ্য-সভ্যতার কৃপায় সিনেমা পাইয়াছি, টেলিভিশন পাইয়াছি, হাইড্রোজেন বোমা পাইয়াছি, নেংটি-পরা সাধুতে আমাদের কি প্রয়োজন?

আমি নিতান্তই সংসারী মানুষ; জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। তবু সাধু-সন্ন্যাসীর খবর পাইলে মনটা চঞ্চল হয়। একদিন শুনিলাম শহরের উপকণ্ঠে এক সাধু আসিয়াছেন, নাম জংলীবাবা; প্রকৃতি নামের অনুরূপ অর্থাৎ একেবারে বন্য। জংলীবাবাকে দর্শন করিবার জন্য মন উশখুশ করিতে লাগিল। জানি, সাধু-সন্ন্যাসীকে দর্শন করিলেই ইষ্টলাভ হয় না; কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েরাও তো জানে, সিনেমার দেবদেবীদের দর্শন করিলে চতুর্বর্গ লাভ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ঠেকাইয়া রাখা যায় কি? ওটা একটা বায়ুঘটিত রোগ।

একদিন অপরাহ্নে সাধু-দর্শনে বাহির হইলাম। পুণা হইতে যে পথটি শোলাপুরের দিকে গিয়াছে সেই পথের ধারে নির্জন প্রান্তে সাধুর আস্তানা। মাইল দেড়েক গিয়া দেখিলাম, রাস্তার ধারে কয়েকটি দামী এবং চকচকে মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মোটরের আরোহীরা— সকলেই মেদপুষ্ট মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি— রাস্তার এক ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। বুঝিলাম, তাঁহারা যেদিকে তাকাইয়া আছেন সেইদিকেই সাধুর আড্ডা। তাঁহারা এ-পর্যন্ত আসিয়া বাকী পথটুকু অতিক্রম করিতে সাহস করিতেছেন না। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম সাধুর ঢিল ছোঁড়া অভ্যাস আছে।

যাহা হউক, এতদূর যখন আসিয়াছি তখন ভয় করিয়া লাভ নাই। রাস্তা হইতে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে একটি খর্জুরকুঞ্জ। মোটরওয়ালাদের পিছনে ফেলিয়া সেই দিকে চলিলাম। চারিদিকে বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়ানো খর্জুরকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মাঝখানে কয়েকটি পাথরের চাঙড় মিলিত হইয়া কুলুঙ্গির মতো একটি কোটর রচনা করিয়াছে; সেই কোটরের মধ্যে ঘিয়ে-ভাজা ডালকুত্তার মতো রক্তচক্ষু লেলিহজিহ্ব জংলীবাবা বসিয়া আছেন।

বাবাকে দেখিলে ভক্তির চেয়ে ভয় বেশি হয়। আমি নত হইয়া প্রণাম করিলাম।

বাবা রাষ্ট্রভাষায় আমাকে বড়কুটুম্ব সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “কী চাস? কবে নোবেল প্রাইজ পাবি তাই জানতে এসেছিস?”

অবাক হইয়া বাবার পানে চাহিলাম। সাধু-সন্ন্যাসীরা তো সংসারের কোনও খবরই রাখেন না, বাবা নোবেল প্রাইজের কথাও জানেন!

আমি কোটরের বাহিরে উপবেশন করিয়া জোড়হস্তে বলিলাম, “না বাবা, আমি ও-সব কিছু জানতে চাই না। আমি শুধু শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি।”

বাবা বলিলেন, “কবে তোর বৌ মরবে, কবে নতুন বিয়ে করবি তাও জানতে চাস না?”

“না বাবা।”

বাবা ঘোর বিস্ময়ে আমাকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর ঘাড় তুলিয়া দূরস্থিত ভক্তদের উদ্দেশে অকথ্য মুখখিস্তি করিলেন। অবশেষে আমাকে বলিলেন, “শ্রীচরণদর্শন তো হয়েছে, এবার যা, দূর হ।”

কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম, “বাবা, আপনি সিদ্ধপুরুষ, অন্তর্যামী, আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। আমিও নেহাত বোকা নই, বুঝতে পেরেছি আপনার অগ্নিশর্মারূপ একটা ছদ্মবেশ, আমার মতো হতভাগ্য সংসারীদের দূরে রাখতে চান।”

বাবা মিটিমিটি চাহিয়া বলিলেন, “তুই দেখছি একটা বিচ্ছু। কী চাস বল।” বাবার কণ্ঠস্বর যেন একটু নরম হইয়াছে।

বলিলাম, “বাবা, সারাজীবন ধরে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি। কোথাও উত্তর পাইনি। আপনি কৃপা করে অধমের অজ্ঞানমসী দূর করুন।”

“ভণিতা ছাড়, কী প্রশ্ন বল।”

“বাবা, পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, সকলের ভিত্তি হচ্ছে জন্মান্তরবাদ; অর্থাৎ আত্মা অমর, দেহের বিনাশ হলেও আত্মা বেঁচে থাকে। এই জন্মান্তরবাদ বা আত্মার অমরত্ব যদি সত্যি না হয়, তাহলে কোনও ধর্মেরই কিছু থাকে না। এখন কথা হচ্ছে, আত্মা যে বেঁচে থাকে তার কোনও প্রমাণ আছে কি?”

“কী প্রমাণ চাস?”

“শাস্ত্রে দু'রকম প্রমাণের উল্লেখ আছে, প্রত্যক্ষ আর অনুমান। এর যেটা হোক একটা পেলেই সব সন্দেহ দূর হবে।”

বাবা বলিলেন, “হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রে একটা প্রমাণ আছে, তাকে বলে আপ্তবাক্য।”

সক্ষোভে বলিলাম, “আজকাল আপ্তবাক্যে কেউ বিশ্বাস করে না বাবা, হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, বুদ্ধদেব যীশুখ্রীষ্ট সবাই গাঁজা খেতেন। তবে কি বাবা, সত্যিকার প্রমাণ কিছু নেই?”

জংলীবাবা কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, “প্রমাণ আছে। কিন্তু তোরা অন্ধ, দেখাব কী করে?”

বলিলাম, “আপনি মহাপুরুষ, জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়া আপনি যদি অন্ধের চক্ষুরুন্মীলন না করেন, তবে কে করবে?”

বাবা আবার তেরিয়া হইয়া উঠিলেন, পাঁচ মিনিট ধরিয়া আমার চৌদ্দ পুরুষান্ত করিয়া শেষে বলিলেন, “নিজের পূর্বজন্ম স্বচক্ষে দেখলে তোর বিশ্বাস হবে?”

জোড়হস্তে বলিলাম, “হবে বাবা।”

“তবে যা, রাত্রিবেলা ঘরে দোর দিয়ে বসবি, একটা মোমবাতি জ্বেলে একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে থাকবি। যতক্ষণ মোমবাতি পুড়ে শেষ না হয়ে যায় ততক্ষণ চেয়ে থাকবি। এমনি রোজ করবি। যদি বাপের পুণ্যি থাকে একদিন দেখতে পাবি!— যা, এখন বেরো।”

আমি উঠিবার উপক্রম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “মোমবাতির দিকে চেয়ে থাকবার সময় কী ভাবব বাবা?”

“কিছু ভাববি না, মন শূন্য করে ফেলবি। যা ভাগ।”

সেইদিনই সন্ধ্যার পর এক বাণ্ডিল মোমবাতি কিনিয়া আনিলাম এবং আমার লেখা-পড়ার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া গেলাম। বাড়ির সবাই জানে এ-সময়ে আমি একান্ত মনে লেখা-পড়া করি, তাই কেহ বিরক্ত

করে না।

জ্বলন্ত মোমবাতির পানে চাহিয়া বসিয়া থাকা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, কিন্তু মনকে নির্বিষয় করাই প্রাণান্তকর।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন, ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ। গীতা বলেন, মনকে আত্মসংস্থ করিয়া ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। কথাগুলি জানা আছে। সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি করিলাম না। কিন্তু মন প্রমাথী এবং বলবদ্দৃঢ়। একদিক পরিষ্কার করি তো অন্যদিক হইতে পঙ্গপালের মতো চিন্তা ঢুকিয়া পড়ে। ঝাঁটা হস্তে মনের এদিক হইতে ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কোনও ফল হইতেছে না। এ-যেন মশক-পরিবৃত স্থানে কেবল চড়-চাপড় চালাইয়া মশা তাড়াইবার চেষ্টা।

প্রথম দিন বৃথা গেল, দ্বিতীয় তৃতীয় দিনও তাই। মোমবাতি পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আমার পূর্বজন্মের 'আমি'র দেখা পাইতেছি না।

ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার মন বোধ হয় শূন্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, আমি জানিতে পারি নাই।

পঞ্চম দিনে ফল পাইলাম।

মোমবাতি জ্বালিয়া সবেমাত্র বসিয়াছি, মনটা নিস্তরঙ্গ হইয়া আসিতেছে, দেখিলাম মোমবাতির শিখা ঘিরিয়া অভঙ্গ রামধনুর মতো একটি সপ্তবর্ণের মণ্ডল রচিত হইয়াছে। ক্রমে মণ্ডলের ভিতর দিয়া ঘরের যে অংশ দেখা যাইতেছিল, তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল, শুধু মণ্ডলের মধ্যবর্তী মোমবাতির পীতাভ স্নিগ্ধ শিখাটি রহিল... তারপর শিখাটিও অদৃশ্য হইয়া গেল। মণ্ডলের মধ্যে রহিল অচ্ছাভ শূন্যতা।

এইবার ধীরে ধীরে মণ্ডলমধ্যবর্তী শূন্যতা চিহ্নিত হইতে লাগিল। একটা মুখ ছায়াছবির পটের উপর আলোকচিত্রের মতো ফুটিয়া উঠিল। জীবন্ত মুখ; চোখের দৃষ্টিতে প্রাণপূর্ণ সজীবতা। পুরুষের মুখ; মস্তক এবং মুখ মণ্ডিত, একটু শীর্ণ অস্থিসার গঠন, কণ্ঠের অস্থি উচ্চ। মুখখানা যেন চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে। চক্ষু উন্মীলিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু বাহিরের কিছু দেখিতেছে না, নিজের মনের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আছে।

এই মুখখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত উদ্বেগ বদ্ধ কক্ষে ধূমকুণ্ডলীর মতো তাল পাকাইতে লাগিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মনে হইল ঐ মুখখানা আমারই মুখ, ঐ মুখের অন্তরালে যে চিন্তার ক্রিয়া চলিতেছে, তাহা আমারই চিন্তা; জানি না কতকাল পূর্বে কোথায় বসিয়া আমি এই চিন্তা করিয়াছিলাম। ক্রমে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল; আমার বর্তমান সত্তা ধীরে ধীরে ঐ অতীত সত্তার সহিত মিশিয়া অভিন্ন হইয়া গেল।—

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। বর্তমানে আমি আয়নায় নিজের যে-মুখ দেখিতে পাই তাহার সহিত ঐ মুখের বিশেষ সাদৃশ্য নাই; কিন্তু একেবারে বিসদৃশও নয়। ভ্রূর হাড় উঁচু, কান বড়, চিবুক ছোট; এই রকম সাধারণ মিল আছে। একই বংশের দুইজন মানুষের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য থাকা সম্ভব।

আমি কে, কোথায় আছি, কী করিতেছি তাহা জানি। কিন্তু কত দিন আগেকার কথা তাহা জানি না। অব্দ সম্বতের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এইটুকু বলিতে পারি, অজন্তায় মাত্র পাঁচটি গুহা তখন খোদিত হইয়াছিল।

অজন্তার একটি গুহার মধ্যে আমি বসিয়া আছি। গভীর রাত্রি। আমার দুই জানুর পাশে দুইটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোতে গুহা-প্রাচীরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। আমি একাকী বসিয়া ছবি আঁকিতেছি।

গুহায় আর কেহ নাই, আমি একা।

দিনের বেলা অনেক ভিক্ষু শ্রমণ এখানে কাজ করে। কেহ পর্বতগাত্র কাটিয়া গুহা রচনা করে, কেহ মূর্তি গড়ে, কেহ গুহা-প্রাচীরে চিত্র আঁকে। সন্ধ্যার সময় তাহারা পর্বতপৃষ্ঠ হইতে উপত্যকায় নামিয়া যায়।

দুই সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝখান দিয়া উপলবন্ধুর অগভীর জলপ্রবাহ গিয়াছে, সেই নির্ঝরিণীর কূলে

আমাদের মৃৎকুটির। সেখানে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে আমরা আবার উপরে উঠিয়া আসি, সারাদিন কাজ করি। ইহাই আমাদের জীবন। সংসারের একান্তে গিরিসঙ্কটের নির্জনতায় গোপন স্বর্লোক রচনা করিতেছি, ভগবান বুদ্ধের অলৌকিক মহিমার শিল্প-কায়া গঠন করিতেছি। আমরা যখন থাকিব না, আমাদের অনামা কীর্তি তখনও অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।

আমার নাম পুণ্ডলীক। কলিঙ্গ দেশে এক ক্ষুদ্র জনপদের অধিবাসী ছিলাম। কিন্তু স্বদেশে আমার সহজ শিল্প-কৃতিত্বের আদর হইল না। কুড়ি বৎসর বয়সে আমি সংসার ছাড়িয়া বৌদ্ধ সঙেঘ প্রবেশ করিলাম।

বুদ্ধের সঙ্ঘ-বিহারে শিল্পের আদর আছে। শীঘ্রই আমার শিল্পক্রিয়া গুণিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শিল্পাচার্য গোতমশ্রী আমাকে শিষ্য করিয়া লইলেন।

তারপর চৌদ্দ বৎসর কাটিয়াছে।

গুরুর সঙ্গে বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি, বহু সঙ্ঘারাম স্তূপ চৈত্য অলঙ্কৃত করিয়াছি।

নিভৃত গিরিসঙ্কুল প্রদেশের পর্বতগাত্রে গুহা খোদিত করিয়া শিল্প-মন্দির রচনার রীতি দাক্ষিণাত্যের রাজারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দুই-তিন শত বৎসর ধরিয়া এই রীতি প্রচলিত আছে। রাজারা অর্থদান করেন, শিল্পীরা পাষাণপটে তথাগতের অলৌকিক জীবনকথার রূপদান করে।

গত তিন বৎসর আমরা অজন্তায় কাজ করিতেছি। আচার্য গোতমশ্রীর সঙ্গে আমরা দশজন প্রতিমা-শিল্পী ও দশজন চিত্রশিল্পী আছি। আমি চিত্রশিল্পী। আরও অনেক শ্রমণ আছে, তাহারা শ্রমসাধ্য কাজ করে।

আজ গভীর রাত্রে অন্ধকারে গুহামধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া আমি চিত্র আঁকিতেছি। চিত্র প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে একটু রঙের স্পর্শ, একটু ব্যঞ্জনার সংস্কার করিতে হইবে। কাল মহারাজ বাণদেব চিত্র পরিদর্শন করিতে আসিবেন। তৎপূর্বেই চিত্র প্রস্তুত থাকা চাই।

প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া চিত্রটিকে পরীক্ষা করিলাম। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চারি হস্ত পরিমাণ চিত্র। আশেপাশে উপরে জাতক হইতে অন্য চিত্র আঁকিয়াছি, সকলের মধ্যস্থলে এই চিত্রটি। চিত্রের বিষয়বস্তু— সিদ্ধার্থ ও গোপার বিবাহ। চারিদিকে বহু পরিজন, কেন্দ্রস্থলে গোপার পাণিগ্রহণ করিয়া বরবেশী সিদ্ধার্থ।

চিত্রটি শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী হইয়াছে, আচার্য গোতমশ্রী দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছেন। সামান্য অঙ্কনের ত্রুটি যেটুকু আছে তাহা আজ রাত্রেই সংশোধন করিব।

কিন্তু— এই চিত্রের মূলে যে বিপুল প্রতারণা আছে তাহা কেবল আমি জানি; আর কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই। গোপার যে-মূর্তি আঁকিয়াছি তাহা দেবীমূর্তি নয়, আমার কামনার রসে নিষিক্ত লালসাময়ী স্ত্রীমূর্তি।

আমি ভিক্ষু, আমার জীবন নারীহীন। কিন্তু নারীর জন্য কোনও দিন তীব্র আকাঙক্ষা অনুভব করি নাই। আমার শিল্পই আমার জীবন।

বহু নারীচিত্র আঁকিয়াছি।— দেবী মানবী অপ্সরী কিন্নরী গন্ধর্ববধূ, নির্লিপ্ত নিরাসক্ত চিত্তেই আঁকিয়াছি। এইভাবে চৌদ্দ বৎসর কাটিয়াছে। তারপর সহসা আজ হইতে তিন মাস পূর্বে আমার অন্তর্লোকে বিপ্লব ঘটিয়া গেল।—

তিন মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠান নগর হইতে পরমসৌগত শ্রীমন্মহারাজ বাণদেব আসিয়াছিলেন; সঙ্গে ছিলেন রানী কুরঙ্গিকা।

নবীন রাজা নবীনা রানী।

একটি গুহায় উচ্চ পাষাণ-চৈত্য আছে, রাজারানী সেই চৈত্যমূলে স্বর্ণমুষ্টি রাখিয়া পূজা দিলেন। তারপর রাজা আচার্য গোতমীকে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা একটি গুহাপ্রাচীরে সিদ্ধার্থ ও গোপার পরিণয়-দৃশ্য অঙ্কিত করা হয়।"

গোতমশ্রী দেখিলেন, রাজা ও রানীর নূতন বিবাহ হইয়াছে, নব-অনুরাগের মাদক রসে উভয়ের মন মজ্জিত হইয়া আছে; তাই সিদ্ধার্থ ও গোপার বিবাহ-চিত্র অঙ্কিত করাইতে তাঁহাদের এত আগ্রহ।

গোতমশ্রী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার প্রধান শিষ্য, রাজাদিষ্ট চিত্র আমিই আঁকিব।

সেই রানী কুরঙ্গিকাকে প্রথম দেখিলাম।

রাজা বাণদেবও অতিশয় সুপুরুষ: যৌবন-ভাস্বর দেহ, বুদ্ধি-দীপ্ত প্রসন্ন মুখমণ্ডল। কিন্তু আমি যেন তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার পাশে, একটু পিছনে রানী কুরঙ্গিকা নতমুখে লীলাকমলের দল নখে বিদ্ধ করিতেছিলেন; আমি কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম।

রানী কুরঙ্গিকার রূপের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শিল্পীর বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়া আমি তাঁহার রূপ দেখি নাই, দেখিয়াছিলাম অন্ধ আবেগের আশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়া। মুহূর্তমধ্যে আমার দেহ-মন উন্মথিত করিয়া এক মাদান্ধ রসোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছিল।

আমার চৌত্রিশ বছর বয়স হইয়াছে। আমি জানি, আমার অন্তরে যে রসোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে তাহা অমৃতের উৎস নয়, তীব্র গরলের ধারা। আমার মনের গরলের সহিত রানী কুরঙ্গিকার কোনও সংস্রব নাই, ইহা একান্তভাবে আমার মনের গরল। কোথায় এতদিন লুক্কায়িত ছিল, দেহের কোন গূঢ়-গহন গুহায় আত্মগোপন করিয়াছিল; আজ সহসা অগ্ন্যুৎপাতের মতো বাহির হইয়া আসিয়াছে।

বাহির হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু তবুও বাহিরে উহার প্রকাশ কেহ লক্ষ্য করে নাই।

গোতমশ্রী কিছু জানিতে পারেন নাই, রাজাও না। আশ্চর্য মানুষের মুখ! আমরা শিল্পী, মানুষের মুখ আঁকিয়া মানুষের মনের কথা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু বাস্তবজীবনে মুখ দেখিয়া মনের কথা কতটুকু জানা যায়? মানুষের মনে অনেক পাপ। তাই ছদ্ম-সাধুতা তাহার সহজাত সংস্কার।

গোতমশ্রী রাজার প্রস্তাব আমাকে শুনাইলেন।

আমি চিত্র আঁকিতে সম্মত হইলাম।

প্রাচীরের কোন্ স্থানে চিত্র অঙ্কিত হইবে তাহা স্থির হইল। নূতন গুহার প্রাচীরে অধিকাংশ স্থান এখনও শূন্য; মনোমত স্থান নির্বাচনের অসুবিধা নাই। পুরাতন গুহাগুলির সকল স্থান ভরিয়া গিয়াছে।

অজন্তার নিকট দিয়া প্রতিষ্ঠান নগর হইতে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত দীর্ঘ বাণিজ্যপথ আছে, সেই পথে বহু সার্থবাহ মহার্ঘ পণ্য লইয়া যাতায়াত করে। তাহারা দৈবতুষ্টির জন্য চৈত্যে পূজা দিয়া যায়, গুহা-প্রাচীরে আপন মনোমত চিত্র আঁকাইয়া লয়। এইভাবে গুহাগুলি একে একে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা বাণদেব অঞ্জলি ভরিয়া নানা বর্ণের রত্ন আমার সম্মুখে ধরিলেন, বলিলেন, "ভিক্ষু, এই রত্নগুলি আপনি নিন। এদের চূর্ণ করে যে বর্ণ হবে সেই বর্ণ দিয়ে চিত্র আঁকবেন। যেন যুগ-যুগান্তরেও চিত্রের বর্ণ মলিন না হয়।"

রাজা বাণদেব কবি এবং প্রেমিক।

আমার চক্ষু তাঁহার মুখ হইতে দেবী কুরঙ্গিকার দিকে ফিরিল। তিনি আমার পানে কুরঙ্গ-নয়ন তুলিয়া মৃদু হাসিলেন। যেন স্বামীর নির্বন্ধের সহিত নিজের আগ্রহ যোগ করিয়া দিলেন।

আমার অন্তরের মধ্যে একটা আর্ত আকুতি চিৎকার করিয়া উঠিল— 'দেবি, আমার মনকে ক্ষমা কর, আমার মনের পঙ্ক যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে।'

রত্নগুলি নিজ অঞ্জলিতে লইয়া মহারাজ বাণদেবকে বলিলাম, "তাই হবে আর্য।"

বিদায় গ্রহণের পূর্বে বাণদেব আমাকে আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলেন, "ভিক্ষু, শিল্পীকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু দেবদেবীর আলেখ্য রচনার সময় মানুষী মূর্তিরই আশ্রয় নিতে হয়।"

ইঙ্গিতের তাৎপর্য— আমি যেন রাজা বাণদেব ও রানী কুরঙ্গিকার আদর্শে সিদ্ধার্থ এবং গোপার চিত্র অঙ্কন করি।

বলিলাম, "অবশ্য। আমার স্মরণ থাকবে।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতদিনে চিত্র প্রস্তুত হবে?"

বলিলাম, "তিন মাস লাগবে!"

তিনি বলিলেন, "ভাল। তিন মাস পরে এই কৃষ্ণা নবমী তিথিতে আবার আসব, আপনার শিল্পকলা দেখে যাব।"

তারপর রত্নগুলির বর্ণনানুসারে পৃথক্‌ভাবে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত অন্য রসায়ন মিশাইয়া রং প্রস্তুত করিয়াছি, গুহা-প্রাচীরের গাত্র মসৃণ করিয়া করিয়া তাহার উপর চিত্র আঁকিয়াছি।

সিদ্ধার্থের চিত্রে কালায়ত লোকসিদ্ধ আকৃতির সহিত বাণদেবের আকৃতি মিশাইয়াছি। আর গোপাকে আঁকিয়াছি রানী কুরঙ্গিকার প্রতিচ্ছবি করিয়া। নীলকান্ত মণির চূর্ণ দিয়া তাঁহার কেশ আঁকিয়াছি, ভ্রূ আঁকিয়াছি, নেত্রতারা আঁকিয়াছি। পদ্মরাগের গুঁড়া দিয়া আঁকিয়াছি তাঁহার অধর। পীত পুষ্পরাগ-চুর্ণের সহিত শঙ্খচূর্ণ মিশাইয়া রচিয়াছি তাঁহার দেহবর্ণ। আর— তাঁহার সমস্ত দেহে লেপিয়া দিয়াছি আমার মনের গলিত-তপ্ত লালসা।

কেন এমন হইল?

যাহাকে চিনিতাম না, জানিতাম না, যাহার মনের পরিচয় পাই নাই, তাহার দেহটা এমন করিয়া কেন আমার মন জুড়িয়া বসিল! আমি নারী-লোলুপ লম্পট নই, শুদ্ধাচারী ভিক্ষু। যৌবনের সীমান্তে আসিয়া আমার এ কী হইল?

গোপার চিত্র আঁকিতে আঁকিতে আমি যে দুরন্ত হৃদয়াবেগ অনুভব করিয়াছি তাহা পূর্বে কখনও অনুভব করি নাই। কখনও অলৌকিক উল্লাসে মন ভরিয়া উঠিয়াছে; কখনও মনের অশুচিতায় নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়াছে। এত আনন্দ এবং এত কলুষ যে আমার মধ্যে ছিল, তাহা আমি নিজেই জানিতাম না।

চিত্র শেষ হইয়াছে, আমার সঙ্গে চিত্রের সম্বন্ধও ফুরাইয়া আসিতেছে। কাল রাজা বাণদেবের নিকট এই চিত্র সমর্পণ করিয়া আমি নিষ্কৃতি পাইব।

আমার গুরু এবং সতীর্থগণ চিত্র দেখিয়া অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন, আমি লজ্জায় অন্তরের মধ্যে আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছি। কেবল একটি সান্ত্বনা আমার আছে— আমার মনের কথা কেহ জানিতে পারে নাই। গোপার মুখে যে দেবীভাব না ফুটিয়া মানুষী ভাব ফুটিয়াছে তাহা রসজ্ঞের চক্ষে বিবাহকালীন বিভ্রমের স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শিল্পীর মনের লালসা-কলুষ যে চিত্রিতার অঙ্গে লিপ্ত হইয়াছে তাহা কেহ ধরিতে পারে নাই।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে। গুহার মুখের কাছে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকের আভা ফুটিয়াছে।

আমি প্রদীপ ধরিয়া গোপার আলেখ্য তিল তিল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। অধরে আরও একটু লালিমা যোগ করিয়া দিলাম, কটিতে ত্রিবলীর রেখা নীল বর্ণ দিয়া একটু স্পষ্ট করিলাম। তারপর দীপ নিভাইয়া গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

বাহিরে গুহা হইতে গুহান্তরে যাইবার সঙ্কীর্ণ পথ, তাহার অন্য ধারে গভীর উপত্যকার খাদ। উপত্যকার পরপারে রোমশ পাহাড়ের মাথায় ভাঙা চাঁদ মুখ তুলিয়াছে।

চারিদিক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

বহিঃপ্রকৃতির বিপুল স্তব্ধতার পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল আজিকার রাত্রি আমার জীবনের শেষ রাত্রি; আমার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে।—

দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে রাজা বাণদেব আসিলেন। কিন্তু রানী কুরঙ্গিকা তাঁহার সঙ্গে আসেন নাই, রাজা বাণদেব একাকীই আসিয়াছেন।

চিত্রের সম্মুখে সারি সারি দীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কারণ দিবাভাগেও গুহার অভ্যন্তর ছায়াচ্ছন্ন।

রাজা বাণদেব দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া চিত্রটি দেখিলেন। তাঁহার মুখে নানা ভাবের ব্যঞ্জনা পর্যায়ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; কখনও সংবৃত গাম্ভীর্য, কখনও ভঙ্গুর হাস্য। রসিক ব্যক্তি পরম রসবস্তু পাইলে এমনই

আত্মসমাহিত হইয়া যায়।

অবশেষে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আমার পানে চক্ষু ফিরাইলেন।

তাঁহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া আমার অঙ্গ সহসা হিম হইয়া গেল। তিনি বুঝিয়াছেন: আর কেহ যাহা অনুমান করিতে পারে নাই, তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। তিনি শুধু চিত্রই দেখেন নাই, চিত্রকরের অন্তরও দেখিয়াছেন।

প্রেমের চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, তাই এই তরুণ যুবকের চক্ষে আমি ধরা পড়িয়া গিয়াছি।

বাণদেব মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ভিক্ষু, ধন্য আপনার প্রতিভা।— একবার এদিকে আসুন, আপনাকে আড়ালে দুটি কথা বলতে চাই।"

গোতমশ্রী ও অন্য শিল্পীরা গুহামধ্যে রহিলেন, রাজা গুহার বাহিরে গেলেন। আমি তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখেই অতলস্পর্শ খাদ; তাহার তলদেশে উপলচপলা নির্ঝরিণী রবিকরে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

রাজা কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষু, আপনার কলানৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু—"

কম্পিতস্বরে বলিলাম, "কিন্তু কী আর্য?"

রাজা বলিলেন, "বুদ্ধের সঙ্ঘ আপনার প্রকৃত স্থান নয়। আপনার অন্তরের তৃষ্ণা এখনও দূর হয়নি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে, সংসারে ফিরে চলুন—"

রাজা বাণদেব যদি তরবারি দিয়া আমার শিরশ্ছেদ করিতেন তাহা হইলে পলকমধ্যে আমার লজ্জার অবসান ঘটিত। কিন্তু তাঁহার শান্ত সংযত বাক্যে সমস্ত পৃথিবী আমার চক্ষে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না।

বাণদেব বলিয়া চলিলেন, "ভোগেরও সার্থকতা আছে। সংযত ভোগে ধাতু শুদ্ধ হয়, শিল্পীর পক্ষে ভোগের প্রয়োজন আছে। যে-শিল্পীর ধাতু প্রসন্ন হয়নি সে রসলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে না। আপনি চলুন আমার সঙ্গে, আমার সভায় প্রধান শিল্পীর আসন অলঙ্কৃত করবেন—"

আর সহ্য হইল না। আমার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল।

চিৎকার করিয়া বলিলাম, "মহারাজ, আমি ধর্মভ্রষ্ট ভিক্ষু, আদর্শভ্রষ্ট শিল্পী— পৃথিবীতে আমার স্থান নাই।"

উন্মত্তের মতো আমি খাদে লাফাইয়া পড়িলাম।

আত্মস্থ হইয়া দেখিলাম, মোমবাতিটা দপ্‌দপ্ করিয়া নিভিয়া যাইতেছে।

পরদিন প্রাতঃকালেই জংলীবাবার আস্তানায় গেলাম। দেখি কোটর শূন্য, বাবা অন্তর্হিত হইয়াছেন।—

আমার জীবনে এই যে একটা আষাঢ়ে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, এই লইয়া মাঝে মাঝে চিন্তা করি। যখনই চিন্তা করি, মনের মধ্যে দুইটি প্রতিপক্ষ মাথা তোলে। এক পক্ষ নির্বিচারে বিশ্বাস করে, সে-রাত্রে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা আমার পূর্বজন্মেরই একটি দৃশ্য। যদি কোনও দিন অজন্তা দেখিতে যাই, নিশ্চয়ই নিজের হাতে আঁকা ছবি দেখিতে পাইব। অন্য পক্ষ বলে, জংলীবাবা সম্মোহন বিদ্যা দেখাইয়াছেন।

মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, আবার মোমবাতি জ্বালাইয়া বসি। কিন্তু ভয় হয়। যে তীব্র মনঃপীড়া একবার পাইয়াছি তাহা আর দ্বিতীয়বার অনুভব করিতে চাই না।

তবে একটা লাভ হইয়াছে। আমি যে ছবি আঁকিতে পারি তাহা এতদিন জানিতাম না, চেষ্টাও করি নাই। এখন চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, ছবি আঁকা আমার পক্ষে সহজ। সুদূর অতীত কালের একটি কুরঙ্গনয়না যুবতীর মুখ ইচ্ছা করিলেই আঁকিতে পারি।

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪

সতী

লোকটি হাত দেখিতে জানে, ঠিকুজি-কোষ্ঠী গণনা করিতে জানে, এবং গল্প বলিতে পারে। পেশা কিন্তু বীমার দালালি। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ; গম্ভীর, মোটা এবং ধড়িবাজ। এই জাতীয় লোককে আমি সর্বদাই এড়াইয়া চলি, কিন্তু কেমন করিয়া জানি না তাহার খপ্পরে পড়িয়া গিয়াছিলাম। দশ হাজার টাকা জীবনবীমা করিয়া ভবিষ্যতের পায়ে বর্তমানকে বন্ধক রাখিয়া চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতেছিলাম।

কিন্তু সে যাক্। নিজের দুঃখের কথা এখানে বলিতেছি না। লোকটি তাহার জীবনের একটি অভিজ্ঞতার যে কাহিনী শুনাইয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বীমা-দালালের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না। তাঁহারা হয়তো অহরহ সত্য কথাই বলিয়া থাকেন; কিন্তু এই কাহিনীর সত্যাসত্য বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করিতেও আমি অক্ষম। যেমন শুনিয়াছিলাম তেমনি লিখিতেছি।

আমি তখন বোম্বাই প্রবাসী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভের দিকে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি। সে কোনও দিন সকালে, কোনও দিন বিকালে আমার বাসায় আসিত। আমার হাত দেখিয়া এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়াছিল যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

লোকটির গল্প বলিবার ভঙ্গি নাটুকে নয়, বরঞ্চ তাহার বিপরীত। সামান্য সূত্র ধরিয়া সে গল্প আরম্ভ করিত, ধীর মন্থর কণ্ঠে বলিয়া যাইত; সে যে গল্প বলিতেছে তাহা প্রথমে ধরা যাইত না। তারপর কখন অলক্ষিতে গল্প জমিয়া উঠিত, আফিমের নেশার মতো ধীরে ধীরে মনকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

একদিন সন্ধ্যার পর সে আসিয়া জুটিয়াছিল। সেদিন আর কেহ আসে নাই। আমি আরাম-কেদারায় লম্বা হইয়া গড়গড়া টানিতেছিলাম, সে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া দীর্ঘ সিগার ধরাইয়াছিল। বাহিরে রিম্‌ঝিম্ বৃষ্টি চলিয়াছে। বোম্বাই বৃষ্টি, বজ্রহীন বিদ্যুৎহীন উদ্বেগহীন বৃষ্টি। এ বৃষ্টিতে শুধু বহিরঙ্গ নয়, মনও ভিজিয়া ভারি হইয়া ওঠে।

সে সন্তর্পণে অ্যাশ-ট্রেতে সিগারের ছাই ঝাড়িয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, 'আজকাল সীতা সাবিত্রী খুব বেশি দেখা যায় না বটে, কিন্তু সতীসাধ্বী মেয়ে একেবারে নেই এ কথা বলা চলে না।'

কথাটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, কোনও পূর্বসংযোগ নাই। আমি ভ্রূ বাঁকাইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'তাই নাকি! হঠাৎ এ কথা কেন?'

সে সিগার দাঁতে চাপিয়া দু'তিনটা মৃদু টান দিল। বলিল, 'বৃষ্টি দেখে মনে পড়ে গেল। গত বছর গ্রীষ্মের শেষে আমি গুজরাতে গিয়েছিলাম, একেবারে গুজরাতের অন্দর মহলে। সেখানে একটা ব্যাপার দেখিলাম—'

'কী— সতীদাহ? ওদিকে এখনও মাঝে মাঝে হয় শুনেছি।'

'না। সতীদাহ নয়'— একটু কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া সে বলিতে আরম্ভ করিল:

কাকুভাই দেশাই আমার বন্ধু, এক কোম্পানিতে কাজ করি। গুজরাতের কয়েকটা তসিল নিয়ে তার এলাকা; সেখানেই থাকে, মাঝে মাঝে বোম্বাইয়ের হেড্ অফিসে আসে। গত বছর কাকুভাই হেড্ অফিসে এসেছে, আমাকে বলল, 'চল না গুজরাত বেড়িয়ে আসবে। আমার অফিসে অনেক কাজ জমে গেছে, তোমাকে পেলে সামলে নিতে পারব।'

কর্তার অনুমতি নিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। আমি সুরাট আমেদাবাদে কয়েকবার গেছি বটে, কিন্তু অজ

গুজরাতে কখনও ঢুকিনি। দেশটা দেখবার ইচ্ছে ছিল। ভারতবর্ষে যত জাত আছে তার মধ্যে গুজরাতিরাই বোধ হয় সবচেয়ে বড়মানুষ। টাকা রোজগারের এত ধান্দা মাড়বারিরাও জানে না। ভাবলাম, দেখে আসি কোন্ গোলার চাল খেয়ে ওদের এত বিষয়বুদ্ধি!

সারা গুজরাতে বোধ হয় দু'চার শ' রাজ্য আছে। ক্ষুদে ক্ষুদে রাজ্য, ক্ষুদে রাজা, ক্ষুদে রাজধানী। শহরগুলির জীর্ণ অবস্থা; সরু সরু গলি, বাড়িগুলো গলে খসে পড়েছে। মৌচাকের মধু নিঙড়ে নিয়ে শুকনো ভাঙ্গা মৌচাকটা যেন কে ফেলে দিয়েছে। আসল গুজরাতের এই চেহারা। বেশ বোঝা যায়, গুজরাতিদের ঘরে কিছু নেই, মাড়বারিদের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা মধুসঞ্চয় করে। যে জাতের ঘরে খাবার আছে তারা বাইরে যায় না, বাঙালীর মতো ঘরের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। মধু সঞ্চয় করতে পারে না।

যা হোক্, আমরা তো গিয়ে পৌঁছুলাম। শ্রীহীন শহর, দেখবার কিছু নেই। তার ওপর পচা গরম। আকাশে মেঘ ঘোরাঘুরি করছে, দু'চার দিনের মধ্যে বৃষ্টি নামবে। তার আগে গ্রীষ্মঋতু অন্তিম কামড় দিয়ে যাচ্ছে।

কাকুভাইয়ের বাসাতেই আছি। তার ঘরে বৌ আর দু'টি মেয়ে। মহাত্মাজীর কল্যাণে গুজরাতী মেয়েরা পর্দা থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু তাদের মন এখনও রান্নাঘরের চৌকাঠ পার হতে পারেনি। বড় বেশি সংসারী গুজরাতী মেয়েরা, সংসার নিয়েই আছে। নিজেরা রাঁধে, জল তোলে, কাপড় কাচে, বাজার করে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মাছ-মাংসের পাট নেই; তবে খুব দুধ খায়, কথায় কথায় দুধ খায়। বাড়িতে কেউ এলে তাকে চায়ের বদলে দুধ দেয়। কাকুভাইয়ের বৌ সুশীলা বেন ভারি শান্ত প্রকৃতির মহিলা, আমাকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করলেন। তবু মনে হল তিনি যদি একটু কম সংসারী হতেন তাহলে বোধ হয় ভাল হত। কিন্তু কী করবেন উনি; গুজরাতী জাতের ধাতই ঐ। চড়ুইপাখি যেমন বেশি উঁচুতে উড়তে পারে না, ওদের মন তেমনি মাটি থেকে বেশি উঁচুতে ওঠে না।

তাই বলে কি ব্যতিক্রম নেই? আছে বৈ কি! মহাত্মাজীই তো মস্ত একটি ব্যতিক্রম। কিন্তু এরকম ব্যতিক্রম বড় বেশি চোখে পড়ে না। আদর্শ নিয়ে ওদের বেশি মাথাব্যথা নেই; তাই বোধ হয় মাঝে মাঝে ওদের মধ্যে বিরাট আদর্শবাদী মানুষ জন্মগ্রহণ করে জাতটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিন-চার দিন কেটে গেল। কাকুভাই আমাকে তার অফিসে নিয়ে যায়, সেখানে তার কাজকর্মে তাকে সাহায্য করি, অফিসের কাজকর্ম এগিয়ে দিই। অনেক লোক আসে অফিসে। বীমা কোম্পানির অফিস আড্ডা দেবার জায়গা; কেউ আড্ডা দিতে আসে, কেউ বীমা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে আসে; সাব-এজেন্টরা কেস নিয়ে আসে। কাকুভাইয়ের মুখে তারা যখন শোনে আমি হাত দেখতে জানি, সবাই আমাকে ঘিরে ধরে। সকলের মুখে এক প্রশ্ন— কবে আমার টাকা হবে?

একদিন বিকেলবেলা কাকুভাই বলল, 'চল, তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। শহরটা তো একবার দেখলেও না।'

বললাম, 'কি আছে তোমার শহরে?'

সে বলল, 'কিছুই না। তবু নদীর ধারটা মন্দ নয়। চল, সেইদিকেই যাওয়া যাক।'

দু'জনে বেরুলাম। আকাশে মেঘ বেশ গাঢ় হয়েছে; বাতাস নেই। ঘরে বসে বসে দম বন্ধ হয়ে আসে, তার চেয়ে বাইরে ভাল। বোধ হয় আজ রাত্রেই বর্ষা নামবে।

গলির পর গলি পার হয়ে নদীর দিকে চলেছি। এক সময় কাকুভাই বলল, 'চল, চম্পকভাইকে একবার দেখে যাই, অনেকদিন খোঁজ পাইনি। কাছেই তার বাড়ি।'

আর একটা গলিতে ঢুকলাম— 'চম্পকভাই কে?'

কাকুভাই বলল, 'চম্পকভাই পাটেল, আমার পরিচিত একটি ছোকরা। সাব-এজেন্টের কাজ করত, মাঝে মাঝে দু'একটি কেস আনত। বড় গরিব। কয়েক মাস হল টি. বি. ধরেছে।'

গলিটা সরু হয়ে যেখানে পাশাপাশি দু'জন হাঁটার অযোগ্য হয়ে পড়েছে সেখানে একটা ছোট একতলা

বাড়ি। বাড়ির গা থেকে খাবলা খাবলা প্ল্যাস্টার উঠে গেছে, বন্ধ দরজার রঙ মাছের আঁশের মতো ছেড়ে ছেড়ে আসছে। জরাজীর্ণ বাড়িটায় মানুষ আছে বলে মনে হয় না, যেন পোড়ো-বাড়ি। কাকুভাই দরজায় ধাক্কা দিল।

কিছুক্ষণ পরে একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। কাকুভাই জিজ্ঞেস করল, 'চম্পকভাই কেমন আছে, রমাবেন?'

এক নজর দেখে মনে হয় মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। তারপর বুঝতে পারা যায়, অপূর্ব সুন্দরী নয়, অপূর্ব তার লাবণ্য। মুখে আর সারা গায়ে লাবণ্য ফেটে পড়ছে। বয়স আন্দাজ ছাব্বিশ-সাতাশ; রঙ ফরসা, টানা-টানা চোখ, ঠোঁট দুটি পাকা তেলাকুচোর মতো টুক্‌টুকে লাল; কিন্তু মুখে রুজ পাউডার নেই। গুজরাতী মেয়েরা সিঁথেয় সিঁদুর পরে না, তাই সধবা কি বিধবা কি কুমারী বোঝা যায় না, তবু বুঝতে কষ্ট হল না যে, রমাবেন চম্পকভাইয়ের বৌ।

কাকুভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে রমাবেন একটু ঘাড় নাড়ল। তার টানা-টানা চোখের মধ্যে কি যেন রয়েছে ঠিক ধরা যায় না; যেন তার মন ইহলোক ছাড়িয়া অনেক দূর চলে গেছে। যেন সে পৃথিবীর মানুষ নয়! এটা তার স্বাভাবিক ভঙ্গি কিনা, প্রথমবার তাকে দেখে বুঝতে পারলাম না।

ঘরের ভিতর থেকে অবসন্ন কাশির আওয়াজ এল।

কাকুভাই বলল, 'এসেছি যখন, চম্পকভাইকে একবার দেখে যাই।'

রমাবেন একবার আমার মুখের পানে তাকাল, একবার কাকুভাইয়ের পানে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ— না!

কাকুভাই তৎক্ষণাৎ বলল, 'আচ্ছা থাক। আমার এই বন্ধুটি বোম্বাই থেকে এসেছেন, তাই ক'দিন খবর নিতে পারিনি। আমি কাল আবার আসব।'

রমাবেনের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, তারপর চটা-ওঠা দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ফিরে চললাম। যেতে যেতে কাকুভাই বলল, 'চম্পকভাই বোধ হয় বাঁচবে না। যদি না বাঁচে রমাবেনের কি হবে তাই ভাবছি। ওদের কারুর তিন কুলে কেউ নেই। চম্পকভাইকে বলেছিলাম অন্তত হাজার টাকার একটা পলিসি নাও। তা শুনল না—'

রমাবেনের লাবণ্যভরা মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। যার স্বামী টি. বি.-তে মরছে তার এত লাবণ্য! কী রকম মেয়ে রমাবেন? মুমূর্ষু স্বামীর সেবা করে না?

আরও কয়েকটা গলিঘুঁজি পেরিয়ে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছুলাম। মেঘলা আকাশ থম্‌থম্‌ করছে, মেঘের আড়ালে সূর্যাস্ত হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

নদী খুব চওড়া নয়, বড় জোর পঞ্চাশ-ষাট গজ, তাও জল শুকিয়ে বালি আর পাথরের ঢেলা বেরিয়ে পড়েছে, খাদের মাঝখান দিয়ে জলের একটা সরু নালা বয়ে যাচ্ছে। দু'ধারে উঁচু পাথুরে পাড়, বর্ষা নামলে নিশ্চয় কানায় কানায় জল ভরে ওঠে।

আমরা একটা পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলাম। এখানটা বেশ নিরিবিলি, নদীর ঘাট এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আমি সিগার ধরালাম। কাকুভাই সিগারেট বের করল। গুমট ভেঙে পশ্চিম থেকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। সমস্ত দিনের আকাট গরমের পর ভারি মিষ্টি লাগল।

নদীর এপাশে শহর, ওপারে জনবসতি নেই। ওদিকে পাড়ের ওপর একসারি ছোট ছোট মন্দির রয়েছে, বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশটা। সবগুলো এক মাপের, ছ'ফুট কি সাত ফুট উঁচু। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওগুলো কিসের মন্দির?'

কাকুভাই একবার সেদিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকাল, বলল, 'ওগুলো সতী মন্দির।'

সতী মন্দির! সে কাকে বলে? কেষ্টবিষ্টুর মন্দির, গণপতি মহালক্ষ্মীর মন্দির, জগন্নাথ মা-কালীর মন্দির জানি। কিন্তু সতী মন্দিরের নাম কখনও শুনিনি। বললাম, 'সে কাকে বলে?'

কাকুভাই তখন গল্প ফেঁদে বসল। বলল, 'আজকের কথা নয়, প্রায় হাজার বছর ধরে চলে আসছে। যখনি

এই শহরে কোনও সতী নারীর মৃত্যু হয়েছে তখনি শহরের লোকেরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে নদীর ধারে একটি করে মন্দির তৈরি করেছে। সবসুদ্ধ চব্বিশটি মন্দির আছে। শেষ মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ষাট-সত্তর বছর আগে। তারপর আর হয়নি। প্রতি পূর্ণিমায় শহরের মেয়েরা মন্দিরে গিয়ে ফুল জল দিয়ে আসে। কামনা করে, তারাও যেন সতী হতে পারে। মন্দিরগুলি আমাদের শহরের মস্ত গৌরব।'

আমি বললাম, 'ঠিক বুঝলাম না। তুমি বলছ এক হাজার বছরে মাত্র চব্বিশটি সতী পাওয়া গেছে। আর বাকী সব মেয়েরা কি অসতী ছিল? কে সতী কে অসতী তার বিচার হয় কি করে?'

কাকুভাই একটু চুপ করে থেকে বলল, 'গোড়ার দিকে কি হয়েছিল জানি না, কিন্তু গত দেড়শ দু'শ বছরে যা হয়েছে তা বলতে পারি। শহরের বুড়ো বুড়িদের মুখে শুনেছি, এক অলৌকিক ব্যাপার হয়। যেদিন শহরে কোনও সতী নারীর মৃত্যু হয় সেদিন সন্ধ্যার পর ঐ মন্দিরগুলোতে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে, তারপর প্রদীপ হাতে নিয়ে সতী নারীরা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন, তাঁরা দল বেঁধে মন্দিরগুলোকে প্রদক্ষিণ করেন, তারপর আবার মন্দিরে অদৃশ্য হয়ে যান; শহরের লোকেরা তাই দেখে বুঝতে পারে; তখন তারা নতুন মন্দির তৈরি করে।'

অলৌকিক ব্যাপারে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না; আবার সংস্কারের বিরুদ্ধে তর্ক করাও চলে না, তাতে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়। আমি চুপ করে রইলাম।

এতক্ষণে চারিদিক ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে, বাতাসে একটা ভিজে ভিজে স্পর্শ, যেন কাছেই কোথাও বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে কুয়াশার মতো একটা আবছায়া পর্দা এগিয়ে আসছে। কাকুভাই উঠে পড়ল, 'চল, ফেরা যাক।'

নিভে যাওয়া সিগারটা ফেলে দিয়ে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। কুয়াশার পর্দা তখন ওপারের মন্দিরগুলোর ওপর এসে পড়েছে, কিন্তু মন্দিরগুলো একেবারে ঢাকা পড়ে যায়নি। হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। মন্দিরগুলোর মধ্যে দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল, যেন কেউ সুইচ টিপে সবগুলো মন্দিরের আলো একসঙ্গে জ্বালিয়ে দিলে।

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কাকুভাইও দেখতে পেয়েছিল। সে দু'হাত জোড় করে বলতে লাগল, 'জয় সতী-মা! জয় সতী-মা!' তার গলা থর্থর্ করে কাঁপছে।

আমি ফিস্ফিস্ করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মন্দিরগুলোতে ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট আছে নাকি?'

সে চাপা গলায় বলল, 'ইলেক্‌ট্রিক্ কোথায়! জয় সতী-মা! কত পুণ্যে আমি এ দৃশ্য দেখলাম! জয় সতী-মা।'

ওদিকে আলোর সারি নড়তে আরম্ভ করেছে। এত দূর থেকে স্পষ্ট মানুষের মূর্তি দেখতে পেলাম না, তবু মনে হল এক দল মেয়ে প্রদীপ হাতে নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ শুরু করেছে। আলোর সারি সাপের মতো মন্দির প্রদক্ষিণ করে ফিরে এল। তারপর প্রদীপগুলো ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে নিভে গেল।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি মুখে লাগছে; যাকে কুয়াশা মনে করেছিলাম তা আসলে বৃষ্টির সূত্রপাত। কাকুভাই তখনও তদ্গতভাবে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, 'চল, এবার ফেরা যাক!'

কাকুভাই চমকে উঠল। তারপর বলল, 'কোন্ সতীর দেহান্ত হয়েছে কে জানে। চল, শহরে খবর নিই।'

ফিরে চললাম। শহরের দোকানপাটে আলো জ্বলছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি বাতিগুলোকে ঘিরে রঙ ফলাচ্ছে। কিছুক্ষণ চলবার পর দেখলাম কোট-প্যান্ট পরা একজন লোক হাতে ব্যাগ নিয়ে হন্‌হন্ করে আসছে। কাকুভাইকে দেখে থমকে দাঁড়াল; বলল, 'কে, কাকুভাই?'

কাকুভাই বলল, 'হ্যাঁ। কি খবর ডাক্তার সামন্ত? কোথায় চলেছ?'

ডাক্তারকে চিনতে পারলাম, আমাদের কোম্পানির স্থানীয় ডাক্তার। সে বলল, 'শোননি চম্পকলাল মারা গেছে?'

দু'জনেই চমকে উঠলাম। কাকুভাই বলে উঠল, 'মারা গেছে! এই ঘণ্টাখানেক আগে তার বাড়িতে

গিয়েছিলাম, তার বৌ রমাবেন—'

ডাক্তার বলল, 'রমাবেনও নাকি মারা গেছে।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ। কিছু বুঝতে পারছি না। আসবে তো এস।' বলে ডাক্তার হন্‌হন্‌ করে চলল।

আমরা আচ্ছন্নের মতো তার পিছু পিছু চললাম। যাকে এক ঘণ্টা আগে সহজ সুস্থ মানুষ দেখেছি, যার অপরূপ লাবণ্য চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে, সে মরে গেছে! চম্পকভাইকে দেখিনি, তার হয়তো মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল— কিন্তু—

ডাক্তার চলতে চলতে বলল, 'চম্পকলালকে আমিই দেখছিলাম, সে দু'এক দিনের মধ্যে যাবে জানতাম। কিন্তু রমাবেনের স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই ছিল। কে জানে হয়তো স্বামীর মৃত্যুর শক্‌ সহ্য করতে পারেনি, কিংবা হয়তো বিষ-টিষ কিছু—'

চম্পকভাইয়ের বাড়ির দরজা খোলা, সামনে কয়েকজন লোক জড়ো হয়েছে। আমরা ডাক্তারের পিছনে পিছনে ভিতরে গেলাম।

একটি ঘরে আলো জ্বলছে। বিছানার উপর শুয়ে আছে কঙ্কালসার একটি মৃতদেহ, আর তার পাশে তার একটা হাত দু'হাতে বুকের ওপর চেপে ধরে রমাবেন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখে কোনও বিকৃতি নেই, যেন পরম নিশ্চিন্ত মনে স্বামীর পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডাক্তার দু'জনকে পরীক্ষা করল, তারপর মুখ তুলে বলল, 'দু'জনেই মৃত!'

আমি আর কাকুভাই আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে অন্ধকারে তখনও কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির জোর বেড়েছে; আমরা ভিজতে ভিজতে বাসায় ফিরে চললাম।

হঠাৎ কাকুভাই আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে উঠল, 'ভাই! সতী নারীরা কেন আজ প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলেন এখন বুঝতে পারলে? রমাবেনকে আমি হাজার বার দেখেছি, কিন্তু সে যে এতবড় সতী তা একবারও মনে হয়নি।'

রমাবেন বিষ খেয়েছিল কিনা আমরা জানতে পারিনি। ডাক্তার ডেথ্‌ সার্টিফিকেট দিয়েছেন, দু'জনের দেহ এক চিতায় দাহ হয়েছিল। সতীত্ব বলতে ঠিক কি বোঝায়, আমার চেয়ে আপনি ভাল জানেন। কায়মনোবাক্যে একটি পুরুষকে যে-মেয়ে ভালবাসে তাকেই আমরা সতী বলি। রমাবেন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। মাত্র একবার দু'মিনিটের জন্য তাকে দেখেছিলাম; কিন্তু সে যে মহাসতী ছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই! স্বামীর হাত বুকে নিয়ে মহানিদ্রায় ডুবে যাওয়ার সে দৃশ্য যে দেখেছে সেই বুঝেছে রমাবেনের মন কী ধাতুতে তৈরি ছিল।— তাই বলছিলাম আজকালকার দিনেও সতী নারী একেবারে নেই এ কথা বলা চলে না।

২৫ পৌষ ১৩৬৪

নীলকর

সেদিন সন্ধ্যার পর আমরা মাত্র তিনজন সভ্য ক্লাবে উপস্থিত ছিলাম— আমি, বরদা এবং একজন নূতন সভ্য, হিরন্ময়বাবু। ইনি সম্প্রতি সিগারেট ফ্যাক্টরিতে চাকরি লইয়া এখানে আসিয়াছেন। সন্ধ্যা কাটাইবার জন্য ক্লাবের সভ্য হইয়াছেন। বেশ মিশুক ও রসিক লোক।

ফাল্গুন মাস। খোলা জানালা দিয়া বাতাস আসিয়া টেবিলের উপর পাট-করা খবরের কাগজখানাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, মাথার উপর বিদ্যুৎবাতিটা প্রখরভাবে জ্বলিতেছে। আমরা দুই-চারিটা অনাবশ্যক কথা বলিয়া নীরব হইয়া পড়িয়াছি। বরদা কড়িকাঠের দিকে তন্ময় চক্ষু তুলিয়া বোধকরি নূতন ভৌতিক গল্প উদ্ভাবন করিতেছে। হিরন্ময়বাবু লম্বা একটা হোল্‌ডারে সিগারেট জুড়িয়া টানিতেছেন এবং থাকিয়া থাকিয়া বরদার দিকে কটাক্ষপাত করিতেছেন। আমি ভাবিতেছি—

হঠাৎ হিরন্ময়বাবু বলিলেন, “বরদাবাবু, আপনি নাকি ভূত দেখেছেন?”

চমকিয়া মুখ তুলিলাম। বরদাকে এই প্রশ্ন করা আর পাগলকে সাঁকো নাড়িতে বারণ করা একই কথা। হিরন্ময়বাবু নূতন লোক, বরদাকে এখনও ভাল করিয়া চেনেন নাই। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম।

বরদা কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইয়া তন্ময় দৃষ্টিতে হিরন্ময়বাবুর পানে চাহিল। এবং ঠিক এই সময় বিদ্যুৎবাতি নিবিয়া ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। অতর্কিত ঘটনায় হিরন্ময়বাবু হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ করিলেন।

হিরন্ময়বাবুর প্রশ্নের সঙ্গে আলো নিবিয়া যাওয়ার কোনও অনৈসর্গিক সংযোগ আছে তাহা মনে করিবার কারণ নাই। কিছুদিন হইতে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, হঠাৎ আলো নিবিয়া সমস্ত পাড়াটাই নিরালোক হইয়া যাইতেছিল। বৈদ্যুতিক কর্তারা বলিতেছিলেন লাইনের দোষ হইয়াছে। কিন্তু দোষ ধরিতে পারিতেছিলেন না। আজও তাহাই হইয়াছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে আলো জ্বলিবে না।

অন্ধকারে বসিয়া আছি। প্রথম কথা কহিল বরদা, তাহার কণ্ঠস্বরে বেশ একটু পরিতৃপ্তির সুর ধরা পড়িল। যেন তাহার গল্পের পরিবেশ রচনার জন্যই আলো নিবিয়া গিয়াছে। সে বলিল, “ভূত আমি অনেক দেখেছি, হিরন্ময়বাবু! দিশী ভূত, বিলিতি ভূত, ভালমানুষ ভূত, দুর্দান্ত ভূত। মানুষ যেমন হরেক রকমের আছে ভূতও তেমনি। কিন্তু গত পৌষ মাসে যে-ভূতটিকে দেখেছিলাম, তার মতো অশ্লীল ভূত জীবনে দেখিনি।”

বরদার গল্প ফাঁদিবার টেকনিক আমাদের জানা আছে। গোড়াতেই চমকপ্রদ একটা কথা বলিয়া শ্রোতাদের হতবুদ্ধি করিয়া দেয়, তারপর শ্রোতারা সামলাইয়া উঠিবার আগেই গল্প শুরু করে। তখন আর তাহাকে থামাইবার উপায় থাকে না। উপরন্তু আজ হিরন্ময়বাবু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন, বলিলেন, “অশ্লীল ভূত কী রকম। কাপড়-চোপড় পরে না?”

বরদা বলিল, “ঠিক ওরকম নয়। ভূতকে অশ্লীল কেন বলছি তা বুঝতে হলে গল্পটা শোনা দরকার। গত পৌষ মাসে আমি মজঃফরপুরে গিয়েছিলাম—”

গল্প আরম্ভ হইয়া গেল। অন্ধকারে হিরন্ময়বাবুর সিগারেটের অগ্নিবিন্দুটি থাকিয়া থাকিয়া স্ফুরিত হইতেছে, দক্ষিণা বাতাস খবরের কাগজ লইয়া ফর্ ফর্ শব্দে খেলা করিতেছে, তাহার মধ্যে বরদার নিরালম্ব কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি:

“মজঃফরপুর জেলায় আমাদের সামান্য জমিজমা আছে। জায়গাটার নাম নীলমহল। আগে সাহেবরা

নীলের চাষ করত। তারপর নীলের চাষ যখন উঠে গেল তখন আমার ঠাকুরদা ওটা কিনেছিলেন। এখন সেখানে ধান হয়, আখ হয়, আম-লিচুর বাগানও আছে। দু-চার ঘর প্রজা আছে। আমাদের সাবেক নায়েব শিবসদয় দাস সেখানে থেকে সম্পত্তি দেখা-শোনা করেন। দাদা শীতকালে গিয়ে তদারক করে আসেন।

"এ বছর দাদা লম্বেগো নিয়ে বিছানায় শুলেন। কী করা যায়? ধান কাটার সময়, আখও তৈরি হয়েছে। এ সময় মালিকদের একবার যাওয়া দরকার। শিবসদয়বাবু অবশ্য লোক ভালই, বিপত্নীক নিঃসন্তান মানুষ, চুরি-চামারি করেন না। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাড়ি এবং অন্যান্য ব্যাপারে বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছেন, কাজকর্ম ভাল দেখতে পারেন না, প্রজারা লুটেপুটে খায়। সুতরাং আমাকেই যেতে হল।

"ছেলেবেলায় দু'-একবার নীলমহলে গিয়েছি, তারপর আর যাইনি। মজঃফরপুর শহর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে; সাম্পানী নামে একরকম বলদ-টানা গাড়ি আছে, তাতেই চড়ে যেতে হয়। পৌষের মাঝামাঝি একদিন বিকেলবেলা গিয়ে পৌঁছলাম। ওদিকে তখন প্রচণ্ড শীত পড়েছে।

"আগে খবর দিয়ে যাইনি, আগে খবর দিয়ে গেলে জমিদারির প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায় না, কর্মচারীরা ধোঁকার টাটি তৈরি করে রাখে। গিয়ে দেখি কাছারি-বাড়ির সামনে তক্তপোশ পেতে শিবসদয়বাবু রোদ্দুরে বসে বৃহৎতন্ত্রসার পড়ছেন, তাঁর সামনে এক কলসি তাড়ি। রোদ্দুরে তাড়ি গেঁজিয়ে কলসির গা বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

"আমাকে দেখে শিবসদয় বড়ই অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, তারপর এসে পায়ের ধুলো নিলেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, কিন্তু আমি মালিক, তার উপর ব্রাহ্মণ। পায়ের ধুলো নিয়ে আমতা আমতা করে বললেন, 'আগে খবর দিলেন না কেন? খবর পেলে আমি ইস্টিশনে গিয়ে—'

"মনে মনে ভাবলাম, খবর দিলে তাড়ির কলসি দেখতে পেতাম না। ন্যাকা সেজে বললাম, 'দাদা আসতে পারলেন না, তাঁর কোমরে বাত হয়েছে। হঠাৎ আমার আসা স্থির হল।' তারপর কলসির দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কী?'

"শিবসদয় এতক্ষণে সামলে নিয়েছেন, বললেন, 'আজ্ঞে, তালের রস। শীতটা চেপে পড়েছে, এ-সময় তালের রসে শরীর গরম থাকে। একটু হবে নাকি?'

"বললাম, 'না। অনেকদিন বেহারে আছি কিন্তু তাড়ি এখনও ধরিনি। আমার জন্যে বরং একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন।'

"শিবসদয় 'হলধর' বলে হাঁক দিলেন। কাছারি-বাড়ির পিছন দিক থেকে হলধর এসে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি আমার পায়ের কাছে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। হলধরকে চিনি, মাঝে মাঝে ধান বিক্রির টাকা নিয়ে মুঙ্গেরে আসে। বুড়ো লোক, জাতে কাহার কিংবা ধানুক, চোখ দুটো ভারি ধূর্ত। কাছারিতে চাকরের কাজ করে আর বিনা খাজনায় দু-তিন বিঘে জমি চাষ করে।

"শিবসদয় বললেন, 'ছোটবাবুর জন্যে চা আর জলখাবার তৈরি কর।'

"হলধর বলল, 'চা-জলখাবার! আজ্ঞে— তা— আমি কবুতরীকে এখুনি ডেকে আনছি। সে সব জানে।'

"হলধর ব্যস্তসমস্তভাবে বাইরে চলে গেল, বোধ হয় গ্রামে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবুতরী কে?'

"শিবসদয় একটু থমকে বললেন, 'কবুতরী— হলধরের নাতনী।'

"শিবসদয় আমাকে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। কাছারি পাকা বাড়ি নয়, পাশাপাশি তিনটে মেটে ঘর, সামনে টানা বারান্দা, মাথায় খড়ের চাল। ভিত বেশ উঁচু, কিন্তু অনাদরে অবহেলায় মাটি খসে খসে পড়ছে। চালের অবস্থাও তথৈবচ, কতদিন ছাওয়া হয়নি তার ঠিক নেই। তিনটে ঘরের একটাতে দপ্তর, মাঝের ঘরটা শিবসদয়বাবুর শোবার ঘর, তার পাশে রান্নাঘর। তিনটে ঘরের অবস্থাই সমান; মেঝেয় ধুলো উড়ছে, চালে ফুটো। শিবসদয়ের উপর মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল। তাড়ি খেয়ে খেয়ে লোকটা একেবারে অপদার্থ হয়ে পড়েছে। নেহাত পুরনো চাকর, নইলে দূর করে দিতাম।

"শিবসদয় বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন, কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'আমার বড় চুক হয়ে

গেছে। আপনি আসবেন জানলে সব ফিটফাট করে রাখতাম। নিজের জন্যে কে অত করে! যা হোক, এবার ধান কাটা হলেই চালটা ছাইয়ে ফেলব।’

“মনটা একটু নরম হল। কাছারি থেকে নেমে বললাম, ‘চায়ের দেরি আছে, আমি ততক্ষণ চারদিক ঘুরে দেখি। ছেলেবেলায় দেখেছি, ভাল মনে নেই।’

“শিবসদয় বললেন, ‘চলুন আমি দেখাচ্ছি।’

“দু’জনে বেরুলাম। সত্তর-আশি বিঘে চাষের জমি, তার মাঝখানে বিঘে চারেক উঁচু জায়গা; এদেশে বলে ভিঠ্‌জমি। এই উঁচু জায়গাটার উপর আমাদের কাছারি। আগে এখানে নীলকর সাহেবদের কুঠি ছিল। মাঝখানে মস্ত একটা পুকুর; এই পুকুরে নীলের ঝাড় পচিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়ায় সেদ্ধ করে নীলের ক্বাথ বার করত। এখন পুকুর মজে গেছে, যেটুকু জল আছে তা পদ্ম আর কলমির দামে ভরা। পুকুরের উঁচু পাড়ের একধারে সারি সারি সাহেবদের কুঠি ছিল, এখন ইটের স্তূপ। পুকুরের আর এক পাড়ে কাতার দিয়ে এক সারি বিরাট উনুন; উনুনের গাঁথুনি পাকা, তাদের ওপরে এখনও কয়েকটা লোহার কড়া বসানো রয়েছে। এই সব কড়ায় নীল সেদ্ধ হত, এখন মরচে ধরে ফুটো হয়ে গেছে। তবু আছে, সাহেবরা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি পড়ে আছে।

“এই চার-বিঘে জোড়া ভগ্নস্তূপের চারদিকে ঝোপঝাড় জন্মেছে। বড় বড় গাছ গজিয়েছে। একটা বিশাল সূচীপর্ণ ঝাউগাছ হাত-পা মেলে পুকুরের ঈশান কোণটাকে আড়াল করে রেখেছে। বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে মনে হয়, সবুজ সমুদ্রের মাঝখানে পাথুরে দ্বীপের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ধানের খেত, আখের খেত, আম-লিচুর বাগান; বিকেলবেলায় পড়ন্ত রৌদ্রে তার উপর বাতাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আম-লিচুর বাগানের কোলে প্রজাদের গ্রাম, মোট কুড়ি-পঁচিশটা খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর। বড় সুন্দর দেখতে।

“কিন্তু দেখতে যতই সুন্দর হোক, ওখানকার আবহাওয়া ভাল নয়। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নিজের অগোচরেই একটা কাঁটা আমার মনে বিঁধতে লাগল। কোথায় যেন একটা বিকৃত পচা অশুচিতা লুকিয়ে আছে, ঢাকা নর্দমার চাপা দুর্গন্ধের মতো। নীলকর সাহেবরা শুধু অত্যাচারী ছিল না, পাপী ছিল। এমন পাপ নেই যা তারা করত না। তাদের পাপের ছাপ যেন এখনও ও-জায়গা থেকে মুছে যায়নি। মনে পড়ল, দাদা বলেছিলেন — নীলমহলের বাতাসে ম্যালেরিয়ার চেয়েও সাংঘাতিক বিষ আছে; ওখানে বেশিদিন থাকলে মানুষ অধঃপাতে যায়, অমানুষ হয়ে যায়।

“ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ চোখে পড়ল, ঝাউগাছটার আড়ালে একটা পাকা ঘর। আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, ‘ওটা কী?’

“শিবসদয় বললেন, ‘ওটা কোৎঘর।’

“কোৎঘর! সে কাকে বলে?”

“নীলকরদের আমলের ঘর। প্রজারা বজ্জাতি করলে সাহেবরা তাদের ধরে এনে ঐ কোৎঘরে বন্ধ করে রাখত। খুব মজবুত ঘর গড়েছিল, যেন লখীন্দরের লোহার ঘর।’

“চলুন তো দেখি।’

“গিয়ে দেখি ঝাউগাছের আওতায় ছোট একটি ঘর। খুব উঁচু নয়, বেঁটে নিরেট চৌকশ, জগদ্দল পাথরের মতো মজবুত ঘর। চব্বিশ ইঞ্চি চওড়া দেওয়াল, মোটামোটা গরাদ লাগানো জানালার লোহার কবাট খোলা রয়েছে, দরজার লোহার কবাটও খোলা। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম; ইট কাঠ দরজা জানালা কিছুই নষ্ট হয়নি, ষাট-সত্তর বছর ধরে দিব্যি অটুট রয়েছে!

“মনে হল, কোৎঘর কিনা, তাই অটুট আছে। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে, তার জায়গায় অন্য শাসনতন্ত্র আসে, কিন্তু কারাগার ঠিক খাড়া থাকে। মানুষ যখন সমাজ গড়েছিল তখন কারাগারও গড়েছিল— যতদিন একটা আছে ততদিন অন্যটাও থাকবে।

“দোরের কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি মারলাম। মেঝে শান-বাঁধানো, দেওয়ালের চুনকাম এখনও বোঝা যায়।

আমি শিবসদয়কে বললাম, ‘ঘরটা তো বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। ব্যবহার করেন না কেন? দরজা জানালা কি জাম হয়ে গেছে?’

“শিবসদয় ‘আজ্ঞে—’ বলে থেমে গেলেন। আমি দরজার কবাট ধরে টানলাম, মরচে ধরা হাঁসকলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল বটে, কিন্তু বেশ খানিকটা নড়ল। আমি শিবসদয়ের পানে তাকালাম। তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে বললেন, ‘সন্ধে হয়ে এল, চলুন এবার ফেরা যাক।’

“সূর্যাস্ত হয়েছে কি হয়নি, কিন্তু ঝাউগাছতলায় ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে। কাছারিবাড়ি এখান থেকে বড় জোর এক শ’ গজ। আমি দরজা ছেড়ে পা বাড়ালাম। ঠিক এই সময় আমার কানের কাছে কে যেন খিসখিস শব্দ করে হেসে উঠল। আমি চমকে ফিরে তাকালাম। কেউ নেই। উপর দিকে চোখ তুলে দেখলাম, ঝাউগাছের ডালগুলো একটা দমকা হাওয়া লেগে নড়ে উঠেছে। তারই শব্দ। কিন্তু ঠিক মনে হল যেন চাপা গলার হাসি।

“পুকুরের পাড় দিয়ে অর্ধেক পথ এসেছি, শিবসদয় একটু কেশে কেশে বললেন, ‘কোৎঘরের জানালা দরজা বন্ধ করা যায়, কিন্তু বন্ধ থাকে না। আপনা-আপনি খুলে যায়।’

“তার মানে?’ আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

“শিবসদয় বললেন, ‘সেই জন্যেই ঘরটা ব্যবহার করা যায় না। ওতে সাহেব থাকে।’

“সাহেব থাকে! কোন্ সাহেব?’

“আজ্ঞে, আছে একজন।’ শিবসদয় একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন, বললেন, ‘এখন চলুন, রাত্রে বলব।’

“একটু বিরক্ত হলাম। লোকটা কি আমাকে ভূতের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাতে চায় নাকি! পীরের কাছে মামদোবাজি!

“যা হোক্, কাছারিতে ফিরে এসে দেখলাম, পূর্ণকুম্ভটি স্থানান্তরিত হয়েছে; তক্তপোশের উপর কম্বল পাতা, তার উপর ফরাস, তার উপর মোটা তাকিয়া। গদিয়ান হয়ে বসলাম। পশ্চিম আকাশে তখনও বেশ আলো রয়েছে, কিন্তু বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। শিবসদয় ঘরে গিয়ে একটা বালাপোশ গায়ে জড়িয়ে চৌকির কোণে এসে বসলেন। বোধ হয় এই ফাঁকে শরীর-গরম করা সঞ্জীবনী-সুধা সেবন করে এলেন।

“এই সময় একটা মেয়ে রান্নাঘর থেকে নেমে এল দু’হাতে বড় কাঁসার থালার উপর চায়ের পেয়ালা আর জলখাবারের রেকাবি নিয়ে। চলনের ভঙ্গিতে বেশ একটু ঠমকে আছে, হিন্দীতে যাকে বলে লচক্। উচক্কা বয়স, নিটোল পুরন্ত গড়ন। গায়ের রঙ ময়লা বটে, মুখখানাও সুন্দর বলা চলে না। পুরু ঠোঁট, চোয়ালের হাড় চওড়া, চোখের দৃষ্টি নরম নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা দুরন্ত আকর্ষণ আছে—

“হলধরের নাতনী কবুতরী।’

“আমার সামনে থালা রেখে আমার মুখের পানে চেয়ে হাসল, সাদা দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। সহজ ঘনিষ্ঠ প্রগল্‌ভতার সুরে বললে, ‘ছোট মালিককে এই প্রথম দেখলাম।’

“আমি উত্তর দিলাম না। শিবসদয়ের দিকে তাকালাম। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি চা খাবেন না?’

“শিবসদয় অস্পষ্ট স্বরে বললেন, ‘আমি খাই না।’

“কবুতরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, ‘ছোট মালিক, দেখুন না চায়ে মিষ্টি হয়েছে কি না।’ গলায় এতটুকু সঙ্কোচ নেই।

“চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, ‘ঠিক আছে।’

“কবুতরী বলল, ‘আর নিমকি? খেয়ে দেখুন না।’

“আমি নিমকিতে কামড় দিয়ে বললাম, ‘ঠিক আছে।’

“কবুতরী তবু দাঁড়িয়ে রইল। আমি তার দিকে একবার তাকালাম, সে আমার পানে অপলক চোখ মেলে চেয়ে আছে। মুখে ঘনিষ্ঠ নির্লজ্জ হাসি।

“শিবসদয় তার দিকে না তাকিয়েই একটু অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, ‘কবুতরী, দাঁড়িয়ে থেকো না, তাড়াতাড়ি রান্নার কাজ সেরে নাও। বাবু ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়বেন।’

“কবুতরী আরও খানিক দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অনিচ্ছাভরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

“আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার রান্না কি কবুতরীই করে?’

“হ্যাঁ।”

“ওর ঘরে কে কে আছে?”

“একটু চুপ করে থেকে শিবসদয় ম্রিয়মাণ স্বরে বললেন, ‘ও হলধরের কাছেই থাকে। একটা স্বামী ছিল, বছরখানেক আগে ওকে ত্যাগ করে চলে গেছে।’

“শিবসদয়ের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। এতক্ষণ যা চোখে পড়েনি হঠাৎ তাই দেখতে পেলাম। তাঁর শীর্ণ চেহারা, নিষ্প্রভ চোখ, ঝুলে-পড়া আলগা ঠোঁট— তার সাম্প্রতিক জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস যেন ঐ মুখে লেখা রয়েছে। বুড়ো বয়সে তিনি শুধু তালরসেরই রসিক হননি, অন্য রসেও মজেছেন। পরকীয়া রস। কবুতরী ছোট ঘরের স্বৈরিণী মেয়ে, সে তাঁকে গ্রাস করেছে। কিন্তু কবুতরী শিকারী মেয়ে, বড় শিকার সামনে পেয়ে সে ছোট শিকারের পানে তাকাবে কেন? কবুতরীর ভাবভঙ্গি থেকে শিবসদয় তা বুঝতে পেরেছেন। তাই তাঁর মনে সুখ নেই।

“অথচ যখন বয়স কম ছিল, শিবসদয় তখন সচ্চরিত্র ছিলেন। লেখাপড়া বেশি না জানলেও মনটা ভদ্র ছিল। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত তিনি আমাদের মুঙ্গেরের জমিজমা দেখতেন। কাজকর্মে দক্ষতা ছিল, অবৈধ লাভের লোভ ছিল না। আর আজ নীলমহলে এসে তাঁর এই অবস্থা। এটা কি স্থান-মাহাত্ম্য? ম্যালেরিয়ার চেয়েও সাংঘাতিক বিষ তাঁর রক্ত দূষিত করে দিয়েছে?

“চা-জলখাবার শেষ করে বললাম, ‘চলুন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক। বাইরে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।’

“হলধর ঘরে ঘরে লণ্ঠন জ্বেলে দিয়েছে। আমরা দপ্তরের মেঝেয় পাতা গদির ওপর গিয়ে বসলাম। শিবসদয় মচ্ছিভঙ্গ হয়ে আছেন, মাঝে মাঝে চোখ বেঁকিয়ে আমার পানে চাইছেন; বোধ হয় বোঝবার চেষ্টা করছেন কবুতরীর দিকে কতটা আকৃষ্ট হয়েছি।

“জিজ্ঞেস করলাম, ‘রাত্রে শোবার ব্যবস্থা কী রকম? আমার সঙ্গে লেপ বিছানা সব আছে।’

“শিবসদয় বললেন, ‘শোবার ঘরে আপনার বিছানা পেতে দিয়েছি। আমি এই গদির ওপরেই রাত কাটিয়ে দেব।’

“সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলাম। বললাম, ‘এবার কোৎঘরের সাহেবের গল্প বলুন।’

“একটু বসুন, আমি রান্নার খবরটা নিয়ে আসি।’ বলে শিবসদয় উঠে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে আবার ফিরে এসে বসলেন। গন্ধ পেয়ে বুঝলুম, শুধু রান্না পরিদর্শন নয়, শীতের অমোঘ মুষ্টিযোগও বেশ খানিকটা টেনেছেন। তাঁর চোখে মুখে সজীবতা ফিরে এসেছে।

“বললেন, ‘আপনি কি সাহেবের কথা কিছু জানেন না?’

“কিছু না। কেউ কিছু বলেনি।’

“শিবসদয় তখন আরম্ভ করলেন— ‘আমারও শোনা কথা। হলধর আর গাঁয়ের পাঁচজনের মুখে যা শুনেছি তাই বলছি।— আশি-নব্বুই বছর আগেকার ঘটনা। তখন নীলকর সাহেবদের ব্যবসা গুটিয়ে আসছে, জার্মানির কারখানায় নকল নীল তৈরি হয়েছে। সেই সময় এখানে যে-সব সাহেব থাকত তাদের মধ্যে একটা ছোঁড়া ছিল ভয়ঙ্কর পাজি। এখানকার নীলচাষীরা তার নাম দিয়েছিল ‘বিল্লি-সাহেব’। প্রজারা কিছু করলে তাদের ধরে এনে হাসতে হাসতে যে-সব যন্ত্রণা দিত, তা শুনলে এখনও গা শিউরে ওঠে। গ্রীষ্মকালে হাত-পা বেঁধে রোদ্দুরে সারা দিন ফেলে রেখে দিত, শীতের রাত্তিরে পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখত।

আঙুলের নখের উপর পেরেক ঠুকে দিত। আর, কমবয়েসী মেয়েমানুষ দেখলে তো রক্ষে নেই। অন্য সাহেবরাও দরকার হলে প্রজাদের উপর অত্যাচার করত, ধরে এনে কোৎঘরে বন্ধ করে রাখত; কিন্তু বিল্লি-সাহেবের তুলনায় সে কিছুই নয়। বিল্লি-সাহেব রোজ নতুন নতুন যন্ত্রণা দেবার ফন্দি বার করত। অন্য সাহেবরা তাকে সামলাবার চেষ্টা করত, কিন্তু পেরে উঠত না।

"একবার একটা প্রজা দাদনের টাকা নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল, সাহেবরা তার সোমত্ত বৌকে ধরে এনে কোৎঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। বৌটার উপর অত্যাচার করার মতলব তাদের ছিল না। প্রজাটাকে জব্দ করাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু বিল্লি-সাহেব মনে মনে অন্য ফন্দি এঁটেছিল। দুপুর-রাত্রে অন্য সাহেবরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে কোৎঘরের তালা খুলে ঘরে ঢুকল।

"বৌটার কাছে ছোরাছুরি ছিল না। কিন্তু তার দু'হাতে ছিল ভারী ভারী রূপোর বালা, এদেশে যাকে বলে কাঙনা। তাই দিয়ে সে মারল বিল্লি-সাহেবের রগে। সাহেব সেইখানে পড়ে মরে গেল। বৌটা পালাল।

"অন্য সাহেবরা জেগে উঠেছিল; তারা ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে গেল। তখন দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ বেরিয়েছে, লং সাহেব তার তর্জমা করে জেলে গেছে; এ সময় যদি এই ব্যাপার জানাজানি হয়, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। সাহেবরা সেই রাত্রেই কোৎঘরের মেঝে খুঁড়ে বিল্লি-সাহেবকে কবর দিলে। তারপর মেঝে আবার শান বাঁধিয়ে ফেললে। বাইরে রটিয়ে দিলে, বিল্লি-সাহেব দেশে ফিরে গেছে।

"এই ঘটনার দু-তিন বছরের মধ্যেই নীলের ব্যবসা উঠে গেল, সাহেবরা জমিদারি বিক্রি করে দেশে চলে গেল। আপনার ঠাকুরদা নীলমহল কিনলেন।

"কোৎঘরটা সেই থেকে পড়ে আছে। শুনেছি, গোড়ার দিকে ঘরটাকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, ওর দরজা-জানালা বন্ধ রাখা যায় না, যতবার বন্ধ করা হয় ততবার খুলে যায়। এমন কি দরজায় তালা লাগালেও ফল হয় না, তালা আপনা-আপনি খুলে যায়। তাই সকলের বিশ্বাস, বিল্লি-সাহেব ওখানে আছে।

"শিবসদয় চুপ করলেন। আমিও খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'বিল্লি-সাহেবের ভূতকে কেউ দেখেছে?'

"'আজ্ঞে না, কেউ কিছু চোখে দেখেনি।'

"'আপনিও দেখেননি?'

'না— কিন্তু অনুভব করেছি। একটা দুষ্ট প্রেতাত্মা আছে।' বলে শিবসদয় চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন।

"'আপনি প্রেতাত্মা বিশ্বাস করেন? মানে, ভূত মানেন?'

"'আজ্ঞে, সে কী কথা! প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করব না! আত্মা যদি থাকে প্রেতাত্মাও আছে।'

"'তা বটে।'

"'যাঁরা আত্মার অস্তিত্বই বিশ্বাস করেন না তাঁদের কাছে এ যুক্তির কোনো মূল্য নেই। কিন্তু বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে।'

"কোৎঘরের ব্যাপারটা হয়তো একেবারে বুজরুকি নয়। ভূতপ্রেত সম্বন্ধে আমার একটু কৌতূহল আছে। ভাবলাম, ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। বিল্লি-সাহেব যদি সত্যি থাকে, অজ্ঞ চাষাভুষোর অলীক কুসংস্কার না হয়, তাহলে সেটা জানা দরকার।

"রাত্রি আটটার মধ্যে খাওয়া সেরে নিলাম। শিবসদয়ও আমার সঙ্গে বসলেন। রান্না বেশি নয়; ফুলকা রুটির সঙ্গে বেগুনপোড়া, হিঙ দিয়ে ঘন অড়র ডাল, মাংস, পুদিনার চাটনি আর ক্ষীর। মাংস কোথায় পেল কে জানে, হয়তো আমার জন্যেই পাঁঠা কেটেছিল। কিন্তু কবুতরী মাংসটা রেঁধেছিল বড় ভাল। এ-দিশী রান্না; একটু ঝাল বেশি, তার সঙ্গে আদা পেঁয়াজ রসুন-বাটা আর আস্ত গোলমরিচ। খাওয়া একটু বেশি হয়ে গেল।

"খেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচাতেই শীত ধরে গেল। আর বসলাম না, একেবারে শোবার ঘরে গেলাম।

শিবসদয়ও সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

"একটা তক্তপোশের উপর পুরু বিছানা পাতা হয়েছে, ঘরের কোণে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। আমি সঙ্গে একটা ইলেকট্রিক টর্চ এনেছিলাম, সেটা সুটকেস থেকে বার করে বালিশের পাশে রাখলাম। তারপর বিছানায় বসে সিগারেট বার করলাম। ঠাণ্ডায় আঙুলগুলো কালিয়ে গেছে, হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে।

"শিবসদয় আমার অবস্থা দেখে একটু কেশে বললেন, 'এখানকার ঠাণ্ডা আপনার অভ্যেস নেই, লেপে শীত ভাঙবে না। কিন্তু—'

"কিন্তু কী?'

"যদি এক পেয়ালা গরম তালের রস খেয়ে শোন, তাহলে আর শীত করবে না।'

"একটু কড়া সুরেই বললাম, 'না।' তারপর সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সকালে আপনার খাতা-পত্তর দেখব।'

"শিবসদয় আর কিছু বললেন না, আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

"আমিও আলোটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছি। নানা রকম চিন্তা মনে আসছে...শিবসদয় আমাকে তাড়ি ধরাবার চেষ্টা করছেন... কবুতরী চেষ্টা করছে বড় শিকার ধরবার... যদি বেশি দিন এখানে থাকি আমার মনের অবস্থাটা কী রকম দাঁড়াবে?... বিল্লি-সাহেব— উঃ, নীলকর সাহেবগুলো কী শয়তানই ছিল...

"লেপের মধ্যে শরীর গরম হয়ে আসছে, সিগারেট শেষ করে চোখ বুজে শুয়ে আছি। এত তাড়াতাড়ি ঘুমনো অভ্যেস নেই, তবু একটু তন্দ্রা আসছে—

"হঠাৎ চোখ খুলে গেল। দেখি, কবুতরী বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কমানো লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় তাকে দেখে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে এল; কখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে জানতে পারিনি।

"আমি চোখ খুলেছি দেখে কবুতরী আমার মুখের কাছে ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, "ছোট মালিক, আপনি জেগে আছেন, আপনার পা টিপে দিই?"

"ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম: 'না, দরকার নেই। তুমি যাও।'

"কবুতরী মোটেই অপ্রস্তুত হল না, সহজভাবে বলল, 'আচ্ছা। কাল ভোরে আমি আপনার চা তৈরি করে আনব। এখন ঘুমিয়ে পড়ুন।' সে ছায়ার মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"আমি কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর উঠে দরজা বন্ধ করতে গেলাম। দরজায় হুড়কো থাকবার কথা, কিন্তু হুড়কো নেই। বাইরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই। কী করা যায়? দরজাটা ভাল করে চেপে দিয়ে এসে শুলাম।

"আমি সাধু-সন্ন্যিসি নই, আবার লুচ্চা-লম্পটও নই। নিজেকে ভদ্রলোক বলে মনে করি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। জীবনে প্রলোভন এসেছে, কিন্তু প্রলোভন যে এমন দুর্নিবার হতে পারে তা কখনও কল্পনা করিনি। মনের মধ্যে যে-সব চিন্তা আসতে লাগল সেগুলোকে ভদ্র চিন্তা বলতে পারি না। এ যেন নর্দমার পাঁক নিয়ে নোংরামির হোলিখেলা। সঙ্গে সঙ্গে কবুতরীর ওপর রাগও হতে লাগল; রাগ হতে লাগল তার চুম্বকের মতো আকর্ষণ করার শক্তির ওপর। ছোটলোকের মেয়ে! নির্লজ্জ নষ্ট মেয়েমানুষ! পুরুষ-হ্যাংলা রক্তচোষা সূর্পনখার জাত।

"কন্টকশয্যায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল একেবারে শেষরাত্রে। দেখি লেপের মধ্যে ঠাণ্ডায় জমে গেছি। বাইরে একটা হাড়কাঁপানো হাওয়া উঠেছে; সে হাওয়া কুলকুল করে ঘরে ঢুকছে কোথা দিয়ে? টর্চ জ্বেলে চারদিকে ঘোরালাম। মাথার দিকে একটা ছোট জানালা আছে বটে, কিন্তু সেটা বন্ধ। দরজাও চাপা রয়েছে। মাটির দেয়ালে আলো ফেলে দেখলাম কোথাও ফুটোফাটা আছে কি না। কিন্তু নেই। তারপর টর্চের আলো গিয়ে পড়ল চালের নীচে। সেখানে একটি মস্ত ফুটো। শেষরাত্রের হাওয়া সেই ফুটো দিয়ে ঢুকছে।

"নিরুপায়, চালের ফুটো বন্ধ করা যাবে না। আগাপাস্তলা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম; কিন্তু হাড়ের কাঁপুনি গেল না। মনে হল, এই সময় শিবসদয়বাবুর তালের রস পেলে কাজ হত। হাত-ঘড়িটা দেখলাম, পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী আছে। এখনও সকাল হতে দেড় ঘন্টা। বিছানায় উঠে বসে সিগারেট ধরালাম।

"গোটা তিনেক সিগারেট পর-পর টানলাম, কিছু হল না। লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না। ভাবছি এবার কী করব, লণ্ঠনটাকে কোলে নিয়ে বসলে কেমন হয়! এমন সময় দোর ঠেলে কবুতরী ঘরে ঢুকল। তার হাতে চায়ের পেয়ালা ধোঁয়াচ্ছে। বাক্যব্যয় না করে পেয়ালা হাতে নিলাম। এক চুমুক দিতেই জিভটা যেন পুড়ে গেল। কিন্তু শরীরের মধ্যে তৃপ্তি ভরে উঠতে লাগল। রক্ত গরম হওয়ার তৃপ্তি।

"কবুতরী হেসে বলল, সিগারেটের গন্ধ পেয়ে বুঝলাম, ছোট মালিকের ঘুম ভেঙেছে।'

বললাম, 'তুমি কি বাড়ি যাওনি?'

"সে বলল, 'না। রান্নাঘরে উনুনের পাশে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছি। নইলে মালিকের চা তৈরি করতাম কী করে?"

"চা শেষ করে পেয়ালা তার হাতে দিলাম, বললাম, 'আর এক পেয়ালা নিয়ে এস।'

"সে একগাল হেসে ছুটে চলে গেল। আশ্চর্য মেয়ে! কী অসম্ভব খাটতে পারে, শরীরে ক্লান্তি নেই। ভোরবেলা মালিকের চা তৈরি করে দেবার জন্যে সারা রাত উনুনের পাশে শুয়ে থাকতে পারে। অথচ অন্য দিকে আবার—

"দ্বিতীয় পেয়ালা চা এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'যাই, রাত্তিরের এঁটো বাসনগুলো এই বেলা মেজে ফেলি। দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন কিন্তু—অ্যাঁ?' ঘাড় বেঁকিয়ে হেসে কবুতরী চলে গেল।

"সেদিন বেলা ন'টার সময় দপ্তরে গিয়ে বসলাম, শিবসদয়কে বললাম, "ওঘরে আর আমি শোব না। আজ থেকে কোৎঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা করুন।'

"শিবসদয় ঘাবড়ে গেলেন: 'কোৎঘরে! কিন্তু—'

"আমি বললাম, 'কিন্তু কী? বিল্লি-সাহেব? বিল্লি-সাহেবের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করব, আপনার ভাবনা নেই।'

"তারপর প্রায় সারা দিনটাই কাজকর্মে কেটে গেল। হিসেব-নিকেশ, জমা-খরচ, আম-লিচুর বাগান জমা দেওয়ার ব্যবস্থা, ধান কাটা এবং বিক্রির ব্যবস্থা। প্রজারা খবর পেয়েছিল আমি এসেছি, তারা এসে সেলাম করে গেল। কেউ এক টাকা, কেউ আট আনা সেলামি দিলে।

"দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে আমার নতুন শোবার ঘর তদারক করতে গেলাম। দুপুরের আলোয় জায়গাটা মোটেই ভূতুড়ে বলে মনে হয় না। দিব্যি ঝরঝরে। হলধর ঘরটা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে রেখেছে, একটা তক্তপোশ ঢুকিয়েছে। দেখে-শুনে ফিরে এলাম। কোৎঘরে ভূত থাকে থাক, ছাদে ফুটো নেই।

"বিকেলবেলাটাও কাজে-কর্মে কাটল। যত সন্ধ্যে হয়ে আসতে লাগল, শিবসদয় ততই শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষে রাত্রে খেতে বসে বললেন, 'দেখুন, আমার ভয় করছে। যদি কিছু ঘটে—'

"বললাম, 'কিছু ঘটবে না। বরং এ ঘরে শুলেই নিউমোনিয়া ঘটবার সম্ভাবনা আছে।'

"কবুতরী পরিবেশন করছিল, খিল খিল করে হেসে উঠল। ও যখন থেকে শুনেছে আমি কোৎঘরে শোব, তখন থেকে ওর মুখে চোখে বিদ্যুৎ খেলছে। মনে মনে কী বুঝেছে কে জানে! কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ভূত-টূত ও বিশ্বাস করে না। হয়তো ভেবেছে—

"শিবসদয় কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বললেন, 'মালিকের সামনে হাসছিস! তোর সহবৎ নেই?'

"কবুতরী হাসি থামাল বটে, কিন্তু তার চোখে-মুখে চাপা কৌতুক উপচে পড়তে লাগল।

"রাত্রি সাড়ে আটটার সময় কাছারি-বাড়ি থেকে বেরুলাম। কবুতরী দাঁড়িয়ে রইল, শিবসদয় লণ্ঠন নিয়ে

আমার আগে আগে চললেন, হলধর আর একটি লণ্ঠন নিয়ে পিছনে চলল। আকাশে এক ফালি চাঁদ আছে। কনকনে ঠাণ্ডা, কিন্তু হাওয়া নেই।

"কোৎঘরে পৌঁছলাম। দরজা জানালা খোলা রয়েছে; ঘরে বোধ হয় ধূপধুনো দিয়েছিল, এখনও একটু গন্ধ লেগে আছে। তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা, লেপ বালিশ সব আছে। এক কোণে গেলাস-ঢাকা জলের কুঁজো।

"হলধর ধূর্ত চোখে আমার পানে চেয়ে বলল, 'সব ঠিক আছে বাবু?' বুড়োটা সব জানে, সব বোঝে, কিন্তু বেশি কথা কয় না।

'টর্চ, সিগারেটের টিন, হাত-ঘড়ি বালিশের পাশে রাখলাম, ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে বললাম, 'সব ঠিক আছে। তোমরা এবার যাও! জানালাটা আপাতত খোলা থাক। পরে বন্ধ করব। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যেও।'

"শিবসদয় একটু খুঁতখুঁত করলেন, তারপর লণ্ঠন নিয়ে বাইরে গেলেন। হলধর নিজের হাতের লণ্ঠনটি একটু উস্কে দিয়ে তক্তপোশের শিয়রের কাছে রাখল, ধূর্ত চোখে আমার পানে চেয়ে ঘাড় হেলিয়ে যেন ইশারা করল, তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে লোহার দরজা ভেজিয়ে দিলে। মরচে-ধরা হাঁসকলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল। আমি একা।

"জানালাটা খোলা, তার ভিতর দিয়ে চৌকশ খানিকটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আমি গিয়ে জানালাটা পরীক্ষা করলাম। জানালায় ছিটকিনি আছে, ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়। পাল্লা দুটো নেড়ে দেখলাম, সচল আছে, দরকার হলে বন্ধ করা যাবে।

"ফিরে এসে বিছানায় বসলাম। তরিবত করে সিগারেট ধরাতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, আলোটা আস্তে আস্তে নিবে আসছে। তেল ফুরিয়ে গেল নাকি? কিন্তু তা তো হবার কথা নয়, সমস্ত রাত জ্বলবে বলে হলধর লণ্ঠনে তেল ভরে দিয়েছে। তবে—?

"আলোটা দপ্ দপ্ করল না, কমতে কমতে নীল হয়ে নিবে গেল, যেন কেউ কল ঘুরিয়ে নিবিয়ে দিলে। ঘর অন্ধকার। জানালা দিয়ে কেবল বাইরের ফিকে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। আমি মনটাকে শক্ত করে নিয়ে আবার সিগারেট ধরাতে গেলাম। ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল; চোখ তুলে দেখি, লোহার দরজা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে।

"তারপর কানের কাছে শুনতে পেলাম খিসখিস হাসির শব্দ। ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাসি কিন্তু বন্ধ হল না, কানের কাছে খিসখিস শব্দ চলতে লাগল। এবার আর ঝাউপাতার শব্দ বলে ভুল করবার উপায় নেই। হাসিই বটে। একটা অসভ্য অশ্লীল হাসি।

"হাসি অনেক রকম আছে। প্রাণখোলা হাসি, বিদ্রূপের প্যাঁচানো হাসি, মুরুব্বিয়ানার গ্রাম্ভারী হাসি। কাষ্ঠ হাসি। এ হাসি ও ধরনের নয়। এ হাসির বর্ণনা করা শক্ত, এ হাসি শুনলে মনে হয় এর পিছনে অকথ্য নোংরামি লুকিয়ে আছে, যে হাসছে তার মনের পাঁক শ্রোতার গায়ে লেগে যায়। গা ঘিনঘিন করে।

"আমার গা ঘিনঘিন তো করলই, উপরন্তু শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। কতটা ভয় কতটা ঘেন্না বলতে পারব না। তবে ভূত আছে, বিল্লি-সাহেব চাষাদের অলীক কল্পনা নয়।

"ভূতের সঙ্গে গা শোঁকাশুঁকি আমার নতুন নয়। জানি, ভয় পেলেই বিপদ। আমি জোর করে নিজেকে শক্ত করে নিলাম। তারপর সিগারেট ধরালাম। নিবে-যাওয়া লণ্ঠনটা নেড়ে দেখলাম, তাতে তেল ভরা রয়েছে।

"লণ্ঠন আবার জ্বালালাম। লোহার দরজা টেনে আবার বন্ধ করলাম; তারপর খোলা জানালাটা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম। দেখি এবার কী হয়!

"ইতিমধ্যে হাসি থেমে গিয়েছিল। আমি বিছানায় এসে বসলাম। লণ্ঠন আর নিবল না। কিছুক্ষণ পরে আর এক রকমের শব্দ কানে আসতে লাগল। এ শব্দও খুব মৃদু; যেন একটা কুকুর নিশ্বাস টেনে টেনে কী

শুঁকছে আর ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধঘরে সিগারেটের ধোঁয়া তাল পাকাচ্ছিল, হঠাৎ মনে হল, প্রেতটা সেই গন্ধ শুঁকছে নাকি? হয়তো যখন বেঁচে ছিল খুব সিগারেট খেত—

"একটা অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির অতৃপ্ত ক্ষুধিত প্রেতাত্মা এখানে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেতাত্মাদের শরীর ধারণ করবার ক্ষমতা থাকলেও দৈহিক অনিষ্ট করবার ক্ষমতা বেশি নেই। পাশ্চাত্য দেশে poltergeist নামে একরকম বিদেহাত্মার কথা জানা আছে, যারা শূন্য ঘরে বাসনকোসন ভাঙে, টেবিলের উপর থেকে জিনিস ঠেলে মাটিতে ফেলে দেয়, আরও নানা রকম ছোটখাটো উৎপাত করে, কিন্তু এর বেশি কিছু করতে পারে না। বিল্লি-সাহেব বোধ হয় সেই জাতের ভূত।

"সিগারেট শেষ করে ফেলে দিলাম। ঘড়িতে দেখলাম ন'টা বেজে গেছে। এই পরিবেশের মধ্যে ঘুম যদিও সুদূরপরাহত, তবু লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

"খুট্! ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, জানালার ছিটকিনি খুলে গেছে। পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে খুলছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজার কপাটও। উঠে বসলাম। অমনি কানের কাছে খিসখিস হাসি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

"টর্চ হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে গেলাম। দোরের সামনে পায়চারি করতে লাগলাম। কী করা যায়? জানালা দরজা বন্ধ করে লাভ নেই, যতবার বন্ধ করব ততবার খুলে যাবে। সারা রাত দরজা জানালা খোলা থাকলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া কিংবা প্লুরিসি। ফিরে যাব? কিন্তু ফিরে গেলে শিবসদয় মাথা নেড়ে বলবেন, আমি আগেই বলেছিলাম। কবুতরী খিলখিল করে হাসবে। না, তার চেয়ে যেমন করে হোক এই ঘরেই রাত কাটাতে হবে। যাক্ প্রাণ থাক্ মান।

"ঘরে গিয়ে আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে শুলাম। শুয়ে শুয়ে শুনছি, ঘরের মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার খস্‌খস্ পায়ের শব্দ। কখনও কানের কাছে জঘন্য অশ্লীল হাসি। একবার গব্ গব্ শব্দ শুনে মুণ্ডু বার করে দেখি, ঘরের কোণে কুঁজোটা কাত হয়ে পড়েছে, গব্ গব্ শব্দে জল বেরুচ্ছে। আমি আবার লেপ মুড়ি দিলাম।

"ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ভূতের সংসর্গ অনেকটা গা-সওয়া হয়ে এসেছে, এই ভাবে যদি রাতটা কেটে যায় মন্দ হবে না। বোধ হয় একটু তন্দ্রাও এসেছিল, হঠাৎ চমকে উঠলাম।

"ছোট মালিক!"

"মাথা বার করে দেখি, কবুতরী। এতক্ষণ ভূতের কার্যকলাপ দেখে যা হয়নি এবার তাই হল, বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। আমি কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বললাম: 'তুমি! তোমার এখানে কী দরকার?'

"লণ্ঠনের আলোয় কবুতরীর দাঁত ঝক্‌ঝক্ করে উঠল, সে বলল, 'ছোট মালিককে দেখতে এলাম।'

"আমার গলাটা বুজে এল, বললাম 'তোমার কি ভূতের ভয় নেই?'

"কবুতরী খিলখিল করে হাসল। এখানে চাপা সুরে কথা বলার দরকার নেই, বলল, 'মালিক কাছে থাকলে ভূতের ভয় কিসের?'

"এই সময় চোখে পড়ল, কবুতরীর পিছনে ঘরের দরজা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

"ও কী! ও কী!' বলে আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলাম।

"তারপর— এক বিশ্রী কাণ্ড।

"কবুতরী হঠাৎ চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। আমি সম্মোহিত হয়ে দেখছি, সে ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু উঠতে পারছে না। প্রাণপণে শুধু চেঁচাচ্ছে। যেন একটা অদৃশ্য মূর্তির সঙ্গে সে ধস্তাধস্তি করছে। তার গায়ের কাপড় আলুথালু হয়ে যাচ্ছে।

"আমি আর থাকতে পারলাম না। এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল জানি না, কিন্তু আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম। দরজা তখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। পাছে বন্ধ হয়ে যায় এই ভয়েই বোধ হয় পালিয়ে এলাম।

"বাইরে এসে দেখি, একটা লোক ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে। হলধর! কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে

ছিল, কবুতরীর চিৎকার শুনতে পেয়েছে। হলধর এখানে কেন, এ প্রশ্ন তখন মনে আসেনি; পরে বুঝেছিলাম, হলধর কবুতরীকে কোৎঘরে পৌঁছে দিতে এসেছিল, তারপর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাছে বসে অপেক্ষা করছিল।

"কী হয়েছে— কী হয়েছে বাবু?' হলধর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল। আমি কি বলব, দরজার দিকে শুধু আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'কবুতরী!'

"দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতর থেকে কবুতরীর চিৎকার আর গোঙানির শব্দ আসছে।

"হলধর দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমিও গেলাম। যে দরজা বন্ধ রাখা যেত না, সে দরজা এখন আর খোলা যায় না। দু'জনে ধরে টানতে লাগলাম; অতি কষ্টে একটু একটু করে দরজা খুলল। দেখি লণ্ঠনটা উল্টে গিয়ে দপ্‌দপ্‌ করছে। কবুতরী লণ্ঠনের কাছে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। আমরা ঢুকতেই সে যেন ছাড়া পেল। তার চুল এলোমেলো, কাপড় ছিঁড়ে গেছে, পাগলের মতো চেহারা। সে উঠে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। হলধর তার পিছনে পিছনে ছুটল। আমি কি করব ভাবছি, কানের কাছে সেই অসভ্য বেয়াড়া হাসি শুনতে পেলাম। আমিও ছুটলাম—"

এইসময় ইলেক্‌ট্রিক বাতি কয়েকবার চিড়িক মারিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এতক্ষণ অন্ধকারের পর তীব্র আলোকে বরদার মুখ ফ্যাকাসে দেখাইল। সে আলোর দিকে একবার চোখ তুলিয়া নীরস স্বরে বলিল, "এই গল্প। দু'দিন পরে আমি নীলমহল থেকে চলে এলাম। বেশি দিন থাকতে সাহস হল না। নীলকর সাহেবরা গিয়েও যায়নি; তাদের মনের পাপ প্রেতমূর্তি ধরে এখনও সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবুতরী সেই যে কোৎঘর থেকে পালিয়েছিল, আর তাকে দেখিনি, সে-রাত্রে সে কী অনুভব করেছিল তা জানা হয়নি। তবে যতটুকু চোখে দেখেছিলাম তা থেকে অনুমান করা শক্ত নয়।" হিরন্ময়বাবুর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল, "অশ্লীল ভূত কেন বলেছিলাম বুঝতে পেরেছেন?"

হিরন্ময়বাবু আমাদের একটি করিয়া সিগারেট দিলেন, নিজে একটি ধরাইলেন। বলিলেন, "খাসা গল্প। শুধু ভূত নয়, রসও আছে। তবে আলো নিবে না গেলে এতটা জমতো কি না বলা যায় না।" বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

১৮ আষাঢ় ১৩৬৫

কালো মোরগ

লজিকের প্রফেসর গোকুলবাবুর শিকারের নেশা ছিল। শীতকালে কলেজের ছুটিছাটা পাইলেই তিনি বন্দুক লইয়া বাহির হইয়া পড়িতেন। বাঘ ভালুক শিকারের দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না; ঘুঘু, বন-পায়রা, হরিয়াল, বড় জোর খরগোশ হত্যা করিয়া তাঁহার রক্তপিপাসা চরিতার্থ হইত।

ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক গোকুলবাবুর মনটি ছিল অতিশয় যুক্তিপরায়ণ। অমোঘ যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তিনি বিবাহ করেন নাই; একটি স্ত্রীলোককে কেন তিনি সারা জীবন ধরিয়া ভরণপোষণ করিবেন ইহার কোনও যুক্তিসম্মত কারণই তিনি খুঁজিয়া পান নাই। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবও কেহ ছিল না। তাঁহার কাছে এই সকল সম্পর্কের কোনও মানে হয় না। বস্তুত এই 'মানে হয় না' কথাটা তাঁহার মনের এবং কথার মাত্রা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূত ভগবান প্রেম আত্ম-বিসর্জন প্রভৃতি কথা শুনিলে তিনি একটু মুখ বাঁকাইয়া বলিতেন—'মানে হয় না।' নিজের শিকার-প্রীতিরও তিনি একটি মানে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জীবমাত্রেই হিংসাপরায়ণ, হিংসাবৃত্তি মানুষের স্বধর্ম; মাঝে মাঝে রক্তপাত না করিলে মনের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়। তাই শিকার করা আবশ্যক।

তিনি একাকী শিকারে যাইতেন। তাঁহার পরিচিতদের মধ্যে কাহারও শিকারের নেশা ছিল না, তাছাড়া গোকুলবাবুর মতে দল বাঁধিয়া শিকার করিতে যাওয়ার মানে হয় না। তাঁহার একটি সাইকেল ছিল; একনলা বন্দুকটি সাইকেলের রডে বাঁধিয়া তিনি বাহির হইতেন। শহরের আট-দশ মাইল বাহিরে লোকাল বোর্ডের রাস্তার ধারে একটি মাঝারি গোছের জঙ্গল আছে; শীতকালে যখন বট ও অশ্বত্থের ফল পাকিতে আরম্ভ করে, তখন পারাবত জাতীয় পাখিরা সেখানে ভিড় করে। গোকুলবাবু প্রতি বৎসর সেই জঙ্গলে শিকার সন্ধানে যান।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি এক মধ্যাহ্নে গোকুলবাবু সাইকেল চড়িয়া যাত্রা করিলেন। মন্দমন্থর চরণে সাইকেল চালাইয়া বনের কিনারায় উপস্থিত হইলেন। বনের কিনারায় একটি গ্রাম; গ্রামে এক মুদির দোকানে সাইকেল রাখিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বনটি আকারে প্রায় গোলাকৃতি, ব্যাস অনুমান তিন মাইল; ইহার নেমিবৃত্ত ঘিরিয়া কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম; কোনও গ্রাম হিন্দুপ্রধান, কোনও গ্রাম মুসলমানপ্রধান। গ্রামীণেরা সকলেই চাষী। জঙ্গলের চারিপাশে গ্রামগুলির অবস্থিতি দেখিয়া মনে হয় যেন জঙ্গলকে পাহারা দিবার জন্য থানা বসিয়াছে। বনটি খাসমহলের সম্পত্তি হইলেও গ্রামবাসীরা এখানে গরু মোষ চরায়।

গোকুলবাবু বন্দুক কাঁধে লইয়া বনের কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহর, সূর্য একটু পশ্চিমে ঢলিয়াছে; শষ্পাকীর্ণ ভূমির এখানে ওখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলা একক দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বা কয়েকটা গাছ একত্র হইয়া ঘোঁট পাকাইতেছে। বটগাছগুলা ফলে ফলে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য! কোথাও একটি পাখি নাই। এই সময় গাছে গাছে ফলাশী পাখির ভিড় লাগিয়া থাকে, আজ পাখিগুলা গেল কোথায়? গোকুলবাবু একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিলেন। ঘুঘুর উদাস বিলাপ, বন-কপোতের ফট্ ফট্ পাখার আওয়াজ কিছুই শোনা যায় না। তিনি চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন; কই, গরু ভেড়াও তো চরিতেছে না। বনের সকল পশুপক্ষী সলা-পরামর্শ করিয়া একসঙ্গে অদৃশ্য হইয়াছে নাকি? বিরক্ত হইয়া তিনি মনে মনে মন্তব্য করিলেন— মানে হয় না।

তবু তিনি অগ্রসর হইলেন। কাল হয়তো একদল শিকারী আসিয়াছিল; দমাদ্দম বন্দুক ছুঁড়িয়া পাখিগুলাকে বনছাড়া করিয়াছে। কিংবা হয়তো বনের অন্য প্রান্তে তাহারা জড়ো হইয়াছে।

গোকুলবাবু বড় বড় গাছগুলার তলা দিয়া চলিতে চলিতে ঊর্ধ্বে গাছের ঘন ডালপালার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হরিয়াল পাখিগুলা বর্ণচোরা, তাহারা যখন আকাশে ওড়ে, তাহাদের সবুজ রঙ সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু একবার গাছে বসিলে নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যায়; গাছের পাতার সঙ্গে তাহাদের গায়ের রঙ এমন বেমালুম মিশিয়া যায় যে, তাহাদের আর দেখা যায় না। গাছের তলা হইতে শিকারীর অভিজ্ঞ চক্ষু তাহাদের সিলুয়েট দেখিয়া চিনিতে পারে। গোকুলবাবু দেখিতে দেখিতে চলিলেন, কিন্তু একটিও হরিয়াল দেখিতে পাইলেন না।

বনের কেন্দ্রস্থলে আট-দশটা বড় বড় গাছ একত্র হইয়া নিম্নে ঘন ছায়া রচনা করিয়াছিল। গোকুলবাবু কাঁধ হইতে বন্দুক নামাইয়া একটি গাছের গুঁড়িতে হেলাইয়া দিলেন, একটু নিরাশভাবে গাছতলায় বসিলেন। যে-পুকুরে মাছ নাই সে-পুকুরে মাছ ধরা এবং যে-বনে পাখি নাই সে-বনে পাখি মারিতে আসা একই কথা, মানে হয় না। তিনি পকেট হইতে কুচা সুপারি লইয়া কিছুক্ষণ চিবাইলেন। তারপর মন একটু চাঙ্গা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই কে যেন তাঁহার পিছন হইতে গরম পাঞ্জাবির ছুট ধরিয়া টান দিল। গোকুলবাবু চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

ভয়ের কিছু নয়, গাছের গোড়ায় একটা কাঁটালতা ছিল, তাহারই কাঁটায় পাঞ্জাবির প্রান্ত আটকাইয়া গিয়াছিল। গোকুলবাবু ধাতস্থ হইলেন। কিন্তু গত বৎসরের একটি ঘটনা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি গাছটিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। হ্যাঁ, এই গাছটাই বটে। গত বৎসর এই সময় এই গাছতলায় একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

গত বৎসর এমনি একটি দ্বিপ্রহরে গোকুলবাবু এই বনে পাখি মারিতে আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পুলিস বন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। একজন ডি এস পি, দু'জন দারোগা পাঁচ-ছয় জন ছোট দারোগা এবং অসংখ্য কনস্টেবল। সকলেই সশস্ত্র। কী ব্যাপার? একজন ছোট দারোগার সঙ্গে গোকুলবাবুর সামান্য আলাপ ছিল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে? আপনারাও পাখি শিকার করবেন নাকি?'

'পাখি নয়, আরও বড় শিকার।' ছোট দারোগা বলিল, আবদুল্লা নামে একটা দুর্দান্ত খুনী আসামী এই বনে লুকাইয়া আছে। আবদুল্লা একজন বড় গুণ্ডা, বিপক্ষ দলের একটা গুণ্ডাকে খুন করিয়া সে ধরা পড়িয়া যায়। বিচারে তাহার ফাঁসির আজ্ঞা হয়। বিচারের পর আদালত হইতে জেলখানায় যাইবার সময় সে দুইজন রক্ষীকে গুরুতর আহত করিয়া দড়িদড়া ছিঁড়িয়া পলাইয়াছিল। এই বনের কিনারায় একটি গ্রামে আবদুল্লার আত্মীয়স্বজন বাস করে; পুলিস সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছে সে এই বনে লুকাইয়া আছে, আত্মীয়স্বজনেরা তাহার খাদ্য সরবরাহ করে। তাই পুলিস আজ এই বনে হানা দিয়াছে, আবদুল্লাকে ধরিবে।

শুনিয়া গোকুলবাবু বলিলেন, 'তাহলে আমি ফিরে যাই, আজ আর শিকার হল না। আমি বৃথাই এতদূর এলাম। মানে হয় না।'

ছোট দারোগা বলিল, 'আপনি তো প্রায়ই এ জঙ্গলে শিকার করতে আসেন। জঙ্গলের ঘাৎঘোঁৎ সব জানা আছে!'

'তা আছে!'

'আসুন আমার সঙ্গে—'

ছোট দারোগা গোকুলবাবুকে ডি এস পি-র কাছে লইয়া গেল। ডি এস পি গোকুলবাবুর পরিচয় শুনিয়া এবং জঙ্গলের সহিত ঘনিষ্ঠতার কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'বেশ তো। আপনিও খুঁজুন না। আপনার সঙ্গে বন্দুক আছে, ভয়ের কিছু নেই। যদি ধরতে পারেন, নামও হবে।'

গোকুলবাবু বনে প্রবেশ করিলেন। ভাবিলেন, পাখির বদলে মানুষ মৃগয়া মন্দ কি! একটা নূতন

অভিজ্ঞতা। বনের মধ্যে আরও অনেক পুলিসের লোক খোঁজাখুঁজি করিতেছে, ঝোপঝাড় ঠেঙাইয়া বিবিধভাবে বনের কিনারা হইতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে। গোকুলবাবু তাহাদের অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তর দিকে চলিলেন।

তাঁহার দৃষ্টি গাছের মাথার দিকে। পুলিস ঝোপঝাড় ঠেঙাইতেছে, ঠেঙাক, গোকুলবাবুর যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি বলিতেছে আসামী যদি বুদ্ধিমান হয় সে গাছের নীচে থাকিবে না, উপরে থাকিবে।

ঘণ্টা দুই এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে গোকুলবাবু একাকী এই গাছটির তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকাণ্ড গাছ, একেবারে মহীরুহ; গুঁড়িটা তিনজন মানুষ জড়াইয়া ধরিতে পারে না, ডালগুলা অতিকায় হাতির গুঁড়ের মতো জড়াজড়ি করিয়া বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বহু ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে; ঘন পাতার আবরণের মধ্যে গোধূলির অন্ধকার।

গোকুলবাবু গাছের নীচে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

ঊর্ধ্ব মুখে দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ পড়িল, মাটি হইতে আন্দাজ বিশ হাত উচ্চ একটা মোটা ডালকে গিরগিটির মতো জড়াইয়া আছে একটা মনুষ্যদেহ। অভিজ্ঞ চক্ষু নহিলে মনুষ্যদেহ ঠাহর করা যায় না, মনে হয় গাছেরই একটা শাখা।

গোকুলবাবুর বন্দুকে টোটা ভরাই ছিল, তিনি ডাকিলেন, 'এই, নেমে আয়!'

উপর হইতে সাড়াশব্দ আসিল না, গিরগিটির মতো আকৃতিটা নিশ্চল রইল। তিনি তখন বলিলেন, 'আমি তোকে দেখতে পেয়েছি। ভাল চাস তো নেমে আয়, নইলে গুলি করবো।'

এবারও আকৃতিটা নিশ্চল। গোকুলবাবুর ইচ্ছা ছিল আসামীকে নিজেই ধরিবেন এবং বন্দুকের আগায় লইয়া গিয়া ডি এস পি-র হাতে সমর্পণ করিয়া দিবেন। কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া তিনি গলা চড়াইয়া হাঁক দিলেন, 'আসামীকে দেখেছি!' শিগ্‌গির এস— জলদি—!'

মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চাশজন লোক আসিয়া গাছ ঘিরিয়া ফেলিল।

আসামী তবু গাছ হইতে নামিতে চায় না। ডি এস পি তখন কয়েকবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া বলিলেন, 'আবদুল্লা, যদি স্বেচ্ছায় নেমে না আসো, তোমাকে গাছের ওপরেই গুলি করে মারব।'

অবশেষে আবদুল্লা নামিয়া আসিল। কয়লার মতো কালো লিকলিকে একটা লোক, পরনে শুধু একটা নীল রঙের লুঙ্গি। পুলিস তাহার হাতে হাতকড়া পরাইল, সে বাধা দিল না। কেবল তাহার বিষাক্ত হিংস্র দৃষ্টি গোকুলবাবুর উপর স্থির হইয়া রহিল।

পুলিস আবদুল্লাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে গোকুলবাবু খবর পাইলেন আবদুল্লার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

ইহা এক বছর আগের ঘটনা।

বন্দুক কাঁধে তুলিয়া গোকুলবাবু আর একবার গাছটিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। হ্যাঁ, এই গাছ হইতেই তিনি আবদুল্লাকে ধরিয়াছিলেন; ঐ যে ডালটা, যাহার গায়ে তাহার কালো দেহটা গিরগিটির মতো জড়াইয়া ছিল। কিন্তু আজ পিছনে অতর্কিতে টান পড়ায় তাঁহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল কেন? তাঁহার মনে কুসংস্কার নাই, লজিকের ফাঁদে যাহা ধরা যায় না তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তবে? নিশ্চয় গত বৎসরের ঘটনাটা তাঁহার অবচেতন মনে সঞ্চিত হইয়াছিল। মনের অনাবশ্যক জঞ্জাল। মানে হয় না।

তিনি আবার চলিলেন। শীতের সূর্য আর একটু পশ্চিমে ঢলিয়াছে, রৌদ্রের রঙ পীতাভ হইয়াছে। গোকুলবাবু দ্রুত পা চালাইলেন; বনের ওদিকটা দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিতে হইবে। বনের মধ্যে রাত্রি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

আরও মাইলখানেক গিয়া গোকুলবাবু দাঁড়াইলেন। দুত্তোর! আর টো টো করিয়া কি হইবে? সব পাখি পালাইয়াছে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গেলেই ভাল। গোকুলবাবু অসংখ্যবার শিকারে আসিয়াছেন,

কিন্তু নিষ্ফল যাত্রা কখনও হয় নাই।

তিনি ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছেন, এমন সময়—

কোঁকর কোঁ!

গোকুলবাবু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় পাশের দিকে ফিরিলেন।

পাশের দিকে লম্বা খানিকটা খোলা জমি, গাছপালা নেই। তাহার অপর প্রান্তে প্রায় দুই শত গজ দূরে একটা শুষ্ক মৃত শেওড়া গাছ নিষ্পত্র ডালপালা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এত দূর হইতে স্পষ্ট দেখা না গেলেও শেওড়া গাছের মাথায় হাঁড়ির মতো কি একটা রহিয়াছে। গোকুলবাবু চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মোরগই মনে হইতেছে। বন-মোরগ! শিকারীর কাছে বন-মোরগের মতো লোভনীয় পাখি আর নাই। গোকুলবাবু জানিতেন এ বনে মোরগ আছে, কিন্তু কোনও দিন মারিতে পারেন নাই।

এই সময় গাছের চূড়ায় হাঁড়িটা গলা উঁচু করিয়া আবার ডাকিয়া উঠিল— কোঁকর কোঁ।

আর সন্দেহ রহিল না। একটা চাপা উত্তেজনা গোকুলবাবুর স্নায়ুমণ্ডলীকে ধনুর্গুণের মতো টান করিয়া দিল। তিনি দূরে বৃক্ষশীর্ষে দৃষ্টি রাখিয়া কাঁধ হইতে বন্দুক নামাইলেন, পকেট হইতে চার নম্বরের একটি টোটা লইয়া বন্দুকে ভরিলেন— তারপর বন্দুক হস্তে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্রসর হইলেন।

একশো গজের মধ্যে পৌঁছিয়া তিনি মোরগটাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। প্রকাণ্ড মোরগ, যেন একটা ময়ূর। কুচকুচে কালো গায়ের পালক, তাহার উপর রৌদ্র পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে, পুচ্ছের ময়ূরকণ্ঠী পালকগুলি বক্রভাবে উদ্যত হইয়া আছে। মোরগ সগর্বে গলা উঁচু করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। গোকুলবাবুর শরীরের ভিতর উত্তেজনার একটা শিহরণ খেলিয়া গেল।

তাঁহার বন্দুকের পাল্লা একশো গজ, মোরগটা পাল্লার মধ্যে আসিয়াছে। কিন্তু গোকুলবাবু সাবধানী লোক, একশো গজ দূর হইতে ছর্‌রা এদিক ওদিক নিক্ষিপ্ত হয়, লক্ষ্যে না লাগিতে পারে। তিনি অতি সন্তর্পণে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইলেন। কাছে-পিঠে গাছ থাকিলে ভাবনা ছিল না, কিন্তু গাছ নাই; তাঁহাকে খোলা মাঠ দিয়া অগ্রসর হইতে হইল।

আরও পঁচিশ গজ গিয়া তিনি থামিলেন। এইবার বেশ পাল্লার মধ্যে আসিয়াছে, আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই। তিনি ধীরে ধীরে বন্দুক তুলিলেন।

কিন্তু টিপ করিয়া ঘোড়া টিপিবার আগেই মোরগটা ফর্‌ফর্ শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল।

মোরগ জাতীয় পাখি ভাল উড়িতে পারে না, তাহাদের ওজনের তুলনায় পাখনা ছোট। কিন্তু উঁচু হইতে লাফাইয়া পাখনার সাহায্যে অক্ষত দেহে মাটিতে নামিতে পারে। মোরগটা পাখনা নাড়িতে নাড়িতে মাটিতে নামিয়া কোঁক কোঁক শব্দ করিতে করিতে একদিকে ছুটিল। গোকুলবাবু দেখিলেন, প্রায় একশো গজ গিয়া মোরগটা একটা গাছের তলায় দাঁড়াইল, তারপর যেন কিছুই হয় নাই এমনিভাবে গাছের নিচু ডালে উঠিয়া ডাকিল— কোঁকর কোঁ।

গাছের তলায় ছায়া-ছায়া, তবু মোরগটাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। গোকুলবাবু বিড়াল পদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই, সমস্ত ইন্দ্রিয় ঐ পাখিটির উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তিনি আবার তাহার পাল্লার মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু এবারও বন্দুক তোলার সঙ্গে সঙ্গে মোরগ উড়িয়া গেল। বেশিদূর গেল না, ঠিক পাল্লার বাহিরে গিয়া একটা ঝোপের পাশে দাঁড়াইল। গলা উঁচু করিয়া ব্যঙ্গভরে ডাকিল, কোঁকর কোঁ।

গোকুলবাবু আবার চলিলেন, নিয়তির চুম্বক তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ক্রমে সূর্য বনের আড়ালে ঢাকা পড়িল, চারিদিক ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিল। গোকুলবাবুর সেদিকে লক্ষ্য নাই, তিনি মোহগ্রস্তের মতো মোরগের পিছনে চলিয়াছেন।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি মোরগটাকে মারিতে পারিলেন না। যতবার পাল্লার মধ্যে আসেন ততবার বন্দুক তোলার সঙ্গে সঙ্গে মোরগ পলাইয়া যায়। তাহার অনুসরণ করিয়া তিনি কোনদিকে চলিয়াছেন

তাহাও তাঁহার লক্ষ্য নাই। কেবল একাগ্র ব্যগ্রতায় পাখির পিছনে চলিয়াছেন।

একবার তাঁহার মনে হইল গাছপালার ওপারে ধোঁয়া উঠিতেছে, তাহার মনের উপর অস্পষ্ট ছায়া পড়িল, বনের কিনারে কোনও গ্রামের কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। দিনের আলো দ্রুত নিভিয়া আসিতেছে, চারিদিকের গাছপালা আবছায়া হইয়া গিয়াছে। তবু কালো মোরগটাকে পরিষ্কার দেখা যায়—

হঠাৎ মোরগটা থামের মতো একটা উঁচু জায়গায় উঠিয়া তীব্রকণ্ঠে ডাক দিল। গোকুলবাবু দেখিলেন, একটা গোরস্থান। গ্রাম্য গোরস্থান, অধিকাংশ কবরই মাটির, ইটের কবর যে দুই-চারিটা আছে তাহাও চুন-সুরকি খসিয়া জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কেবল একটা গোর নূতন, তাহার গায়ের চুনকাম সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। সেই গোরের শিরঃস্তম্ভের ওপর মোরগটা গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে।

গোকুলবাবু শীর্ণ একটা নিশ্বাস টানিলেন। অন্ধকারে পাল্লা বোঝা যায় না, তবু ষাট সত্তর গজের বেশি নয়। গোকুলবাবুর বুক উত্তেজনায় দুরুদুরু করিয়া উঠিল। এবার ফস্‌কাইলে আর মোরগ মারা যাইবে না।

সামনে বাঁ পাশে একটা বড় ফণী-মনসার ঝোপ। সেটার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইতে পারিলে—

গোকুলবাবু কোণাচে ভাবে ফণী-মনসার ঝোপের দিকে চলিলেন, দৃষ্টি মোরগের দিকে। তারপর হঠাৎ ঝোপের দিক হইতে একটা স্‌রস্‌র্ শব্দ শুনিয়া মোরগের উপর হইতে তাঁহার দৃষ্টি সরিয়া গিয়া ঝোপের উপর পড়িল।

ঝোপের ভিতর হইতে একটা কালো মানুষের মুখ বাহির হইয়া আসিতেছে। নিষ্ক্রান্ত দন্ত, চক্ষু দুটা অপার্থিব হিংসায় জ্বলিতেছে। দুই হাতে ফণী-মনসার কাঁটা সরাইয়া মূর্তি বাহির হইয়া আসিল। কয়লার মতো কালো গায়ের রঙ, পরনে নীল রঙের লুঙ্গি।

নরঘাতক আবদুল্লা! তাহার অভিপ্রায় সম্বন্ধেও সংশয়ের অবকাশ নাই। গোকুলবাবু দ্বিধা করিলেন না, বন্দুক তুলিয়া ফায়ার করিলেন আবদুল্লার মুখে।

কিন্তু কিছুই হইল না। আবদুল্লা অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। গোকুলবাবু ক্ষণেক হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। তারপর যে কথাটা সঙ্কটকালে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িয়া গেল। আবদুল্লার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, সে বাঁচিয়া নাই!

গোকুলবাবুর হৃৎপিণ্ডটা একবার উন্মত্তভাবে লাফাইয়া উঠিল। তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ মস্তিষ্কে শেষবারের জন্য চিন্তার ছাপ পড়িল— মানে হয় না।

২৬ ভাদ্র ১৩৬৫

নখদর্পণ

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল পঁচিশ বছর আগে, বিহার প্রদেশের একটি ছোট শহরে। আমার বাল্যবন্ধু শম্ভুনাথের পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। বরযাত্রী যাইবার কথা ছিল কিন্তু কাজের চাপে যাইতে পারি নাই; তাই বৌভাতের ভোজ খাইতে স্ত্রী ও ছোট দুটি ছেলেমেয়েকে লইয়া এক রাত্রির জন্য উপস্থিত হইয়াছিলাম।

আমার কর্ম্মস্থল হইতে শম্ভুর বাসস্থান ট্রেনযোগে বেশি দূর নয়, আন্দাজ আশি মাইল। শনিবার দুপুরবেলা যাত্রা করিয়া ভাবিয়াছিলাম বেলা থাকিতে থাকিতে অকুস্থলে পৌঁছিব, কিন্তু ট্রেন দেরি করিয়া ফেলিল। যখন পৌঁছিলাম তখন শীতের রাত্রি নামিয়াছে।

স্টেশনে নামিয়া দেখি শম্ভু উপস্থিত। আশি মাইলের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও বহুকাল শম্ভুর সঙ্গে দেখা হয় নাই। আমার মনের মধ্যে তাহার চেহারার যে চিত্রটি ছিল তাহার সহিত বর্তমান চেহারার তফাৎ হইয়াছে, গোঁফ ও জুল্‌ফিতে পাক ধরিয়াছে; গাল শীর্ণ, বুঝিলাম দাঁত পড়িয়াছে। সেও বোধ করি আমার চেহারার অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিল, কিন্তু কিছু বলিল না। বলিবার আছে কি? যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল দিনগুলি তো আর ফিরিবে না!

শম্ভু গাড়ি আনিয়াছিল। সে সম্পন্ন গৃহস্থ, নিজের মোটর আছে; আমাদের মোটরে তুলিয়া নিজে মোটর চালাইয়া লইয়া চলিল। আমি বলিলাম, 'তোর নিজের বাড়িতে আজ যজ্ঞি, তুই নিজে এলি কেন? কাউকে পাঠিয়ে দিলেই তো হত।'

শম্ভু বলিল, 'আমি বরকর্তা, আমার আর কাজ কি? তাই চলে এলাম।'

বলিলাম, 'বলিস কি, বরকর্তার কাজ নেই! কত লোক নেমন্তন্ন করেছিস?'

'তা বাঙালী বেহারী মিলিয়ে শ'তিনেক হবে।'

'তবে! বাড়ি ফিরে দেখবি, অতিথিতে ঘর ভরে গেছে।'

শম্ভু একটু হাসিয়া বলিল, 'তা হোক। নটবর আছে।'

'নটবর! সে কে?'

'তুই চিনবি না। নটবর মল্লিক, কয়েক বছর হল এখানে এসেছে। চৌকশ লোক, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব জানে। নিজের কাজ ফেলে পরের কাজ করে বেড়ায়। কারুর বাড়িতে বিয়ে পৈতে থাকলে নটবর সেখানে আছেই। নটবর না হলে কাজ কারুর চলে না।'

এই জাতীয় সেবক পৃথিবীতে আছে শুনিয়াছি, যাহারা পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে, যাহাদের অফুরন্ত কর্ম্মস্পৃহা কেবল নিজের কাজ করিয়া নিঃশেষিত হয় না। আমার ভাগ্যদোষে আমি এ পর্যন্ত এরূপ মানুষের সাক্ষাৎ পাই নাই। শম্ভুকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে।

শম্ভুর বাড়িতে পৌঁছিলাম। গ্যাস-লাইট আলো। শানাইয়ের বাজনায় বাড়ি সরগরম। শম্ভুর বাড়িটি একতলা, কিন্তু বেশ বড়; চারিদিকে আম কাঁঠালের বাগান, মাঝখানে বাড়ি। সম্মুখে খোলা জমির উপর শামিয়ানা পড়িয়াছে।

শম্ভুর স্ত্রী আসিয়া আমার স্ত্রীকে ও নিদ্রালু ছেলেমেয়ে দুটিকে ভিতরে লইয়া গেলেন, শম্ভু আমাকে লইয়া গিয়া শামিয়ানার আসরে বসাইল। কয়েকজন বাঙালী ও বেহারী অতিথি ইতিমধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পান সিগারেট চলিতেছে। শম্ভু কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিল।

অতিথিদের মধ্যে বাঙালীই বেশি, কয়েকজন বেহারী হিন্দু মুসলমান আছেন।

এইখানে নটবরকে দেখিলাম। দোহারা মজবুত চেহারা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ; এই শীতেও হাতকাটা ফতুয়া পরিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। বাংলা ও হিন্দী ভাষায় সমান অধিকার। চাকরদের হুকুম করিতেছে, অতিথিদের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেছে, আতরদান সামনে ধরিয়া খাতির করিতেছে। আবার অন্দরে গিয়া ফুলশয্যার ফুলের কি ব্যবস্থা হইল তাহার তদারক করিয়া আসিতেছে। লুচি ভাজা কখন আরম্ভ করিলে গরম গরম লুচি অতিথিদের পাতে পড়িবে অথচ লুচিতে টান পড়িব না, সে-হিসাবও তাহার মাথার মধ্যে আছে। নটবরের তত্ত্বাবধানে কোথাও এতটুকু ত্রুটি হইবার যো নাই। সত্যি দারুণ কাজের লোক।

রাত্রি সাড়ে দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেল, অতিথিরা পান চিবাইতে চিবাইতে বিদায় লইলেন। তারপর বর-বধূকে ফুলশয্যায় শয়ন করাইয়া মেয়েদের আড়ি পাতার পালা শেষ হইতে মধ্যরাত্রি হইল।

ক্লান্ত দেহে শুইতে যাইতেছি, শুনিলাম বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া নটবর শম্ভুকে বলিতেছে, 'দাদা, আজ তাহলে চলি। আবার ভোরবেলাই আসতাম, এখনও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, শামিয়ানা ফেরত দিতে হবে, গ্যাস-লাইটের দাম চুকোতে হবে— কিন্তু বৌটার শরীর ভাল নয়, ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে। ক'দিন ওদিকে মন দিতে পারিনি; সকালে তাকে একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু আপনি কিছু ভাববেন না, সাড়ে দশটার মধ্যেই আমি এসে হাজির হব। আপনার বাড়ির কাজ তুলে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।'

ধন্য নটবর!

যে অতিপ্রাকৃত ঘটনাটি এই কাহিনীর বিষয়বস্তু তাহার পরিবেশ রচনা করিতে গিয়া দেখিতেছি অনেক বাজে কথা বলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর নয়, সরাসরি মূল কাহিনী আরম্ভ করি।

বিয়ে বাড়িতে যেমন হইয়া থাকে, রাত্রে যে যেখানে পাইল শয়ন করিল। মেয়েরা শিশুদের লইয়া অন্দরে রহিলেন, পুরুষেরা বার-বাড়িতে। আমি ও শম্ভু বৈঠকখানা ঘরের চৌকির উপর শয়ন করিলাম।

পরদিন সকালবেলা আমার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র নীলু আমার ঘুম ভাঙাইয়া দিল, গায়ে ঠেলা দিতে দিতে উত্তেজিত স্বরে বলিল, 'বাবা, ওঠ ওঠ, চোর এসেছে।'

ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। আমার কন্যা নবমবর্ষীয়া বুলা উপস্থিত ছিল, সে নীলুকে বিরক্ত ভাবে সরাইয়া দিয়া বলিল, 'যা, তুই কিছু জানিস না। বাবা, কাল রাত্তিরে চোর এসেছিল, নতুন বৌয়ের সব গয়না নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

দেখিলাম শম্ভু আগেই উঠিয়া গিয়াছে। চারদিক হইতে উৎকণ্ঠিত উত্তেজনার গুঞ্জন আসিতেছে। আমিও উঠিয়া পড়িলাম।

খবরটা মিথ্যা নয়।

বর-বধূ রাত্রে যে-ঘরে ফুলশয্যা করিয়াছিল তাহার লাগাও একটা কুঠুরিতে কনে-বৌয়ের যাবতীয় গহনা একটি স্টীলের ট্রাঙ্কে রাখা হইয়াছিল। ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। রাত্রে চোর আসিয়া বাহিরের জানালার শিক বাঁকাইয়া প্রবেশ করিয়াছে ও গহনার বাক্সটি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। পাশের ঘরে বর-বধূ কিছুই জানিতে পারে নাই। প্রায় দশ হাজার টাকার গহনা।

খবরটা বাড়ির মধ্যেই আবদ্ধ নাই, পাড়াতেও রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে; পড়শী আসিয়া জুটিয়াছে। পুলিসেও খবর পাঠানো হইয়াছে। আমরা বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গুলতান করিতেছি। শম্ভু অত্যন্ত বিচলিত। দশ হাজার টাকার গহনা—

একটা চাকর হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া আসিয়া খবর দিল, বাড়ির পিছনদিকে আম বাগানের মধ্যে গহনার বাক্সটা ভাঙা অবস্থায় পড়িয়া আছে। সকলে সেই দিকে ছুটিল, ছোট ছেলেমেয়েরা আগে আগে, বয়স্থরা পিছনে। দল বড় কম নয়; পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোক তো আছেই, দু'-একজন ভদ্রশ্রেণীর লোকও আছেন। মোসীন সাহেব নামক এক মুসলমান ভদ্রলোকের সহিত কাল রাত্রে শম্ভু আলাপ করাইয়া দিয়াছিল; পাড়াতেই

থাকেন, গম্ভীর প্রকৃতির প্রৌঢ় ব্যক্তি; মুখে ছাঁটা দাড়ি, চোখে সুরমা। সাহেব তালিমের লোক, ইংরেজী লেখাপড়া অল্পই জানেন। তিনি খবর পাইয়া আসিয়াছেন।

বাড়ির পিছনদিকে বাগানের কিনারায় আমগাছের তলায় ভাঙা ট্রাঙ্কটা পড়িয়া আছে। আমরা গিয়া ঘিরিয়া ধরিলাম। ট্রাঙ্কের তলা চাড় দিয়া ভাঙা হইয়াছে; বধূর কয়েকটা আটপৌরে শাড়ি সেমিজ আশেপাশে ছড়ানো, কিন্তু গহনা ও দামী কাপড়-চোপড় অদৃশ্য হইয়াছে। চোর অতি বিজ্ঞ, খেলো জিনিস লইয়া নিজেকে ভারাক্রান্ত করে নাই।

পুলিস আসিয়া পড়িল। একজন ছোট দারোগা, সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল। আমাদের দেশের পুলিসের কর্মতৎপরতার কথা কাহারও অবিদিত নাই। যাহার বাড়িতে চুরি হইয়াছে পুলিসের জেরার ঠেলায় সে চোর বনিয়া যায়; তারপর কথায় কথায় থানায় দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে গৃহস্থের কালঘাম ছুটিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চোর অবশ্য ধরা পড়ে না এবং চোরাই মাল কোন্ বিচিত্র পথে কোথায় গিয়া উপনীত হয় তাহা নির্ণয় করা শিবেরও অসাধ্য।

বর্তমান ক্ষেত্রেও ছোট দারোগা অশেষ তৎপরতা দেখাইলেন। শম্ভু শহরের গণ্যমান্য লোক। তাহাকে হুমকি দেওয়া চলে না কিন্তু তিনি বাড়িসুদ্ধ লোককে জেরা করিলেন, সকলের নাম ধাম লিখিয়া লইলেন, চাকরদের ধমকাইলেন, চোরাই মালের ফিরিস্তি তৈরি করিলেন। ঘণ্টা দুই এইভাবে কাটাইয়া তিনি একজন কনস্টেবলকে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া অন্য কনস্টেবলকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। শম্ভুকে আশ্বাস দিয়া গেলেন— 'বাড়ির লোকের কাজ বলেই মনে হচ্ছে। —আপনি চিন্তা করবেন না, চোর ধরা পড়বে।'

আমরা কয়জন বিমর্ষভাবে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। মোসীন সাহেব আমাদের সকলের মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'পুলিসের দ্বারা কিছু হবে না। চোরকে ধরে যদি ওদের সামনে হাজির করা যেত, তাহলে ওরা তাকে বেঁধে নিয়ে যেত। তার বেশি ওরা পারবে না।'

শম্ভু বলিল, 'তা কি জানি না? কিন্তু উপায় কি বলুন? কাউকে সন্দেহ করাও যাচ্ছে না। চাকরদের মধ্যে কেউ চুরি করেছে আমার বিশ্বাস হয় না। এ পেশাদার চোরের কাজ।'

কিছুক্ষণ এই লইয়া আলোচনা হইল। যদি পেশাদার চোর হয় তাহা হইলে বমাল ফেরত পাইবার কোনও আশাই নাই; এতক্ষণে গহনাগুলো চোরা-স্যাকরার কাছে গিয়া সোনার তালে পরিণত হইয়াছে।

হঠাৎ মোসীন সাহেব বলিলেন, 'আপনারা যে মন্ত্রতন্ত্র মানেন না, নইলে চেষ্টা করে দেখা যেত।'

শম্ভু চকিত হইয়া বলিল, 'মন্ত্রতন্ত্র! সে কি রকম?'

মোসীন সাহেব বলিলেন, 'আছে। হিন্দুদের মধ্যেও আগে ছিল। আমাদের মধ্যেও আছে। যে চুরি করেছে তার চেহারা দেখা যায়, চেনা লোক হলে সনাক্ত করা যায়; কি ভাবে চুরি করেছে, কোন্ পথে গিয়ে কোথায় চোরাই মাল লুকিয়ে রেখেছে তাও দেখা যায়। কিন্তু আপনারা কি এসব বুজরুকি বিশ্বাস করবেন?'

বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু বিপাকে পড়িলে বাঘ ফড়িং খায়। শম্ভু কয়েকবার ঘাড় চুলকাইয়া আমার দিকে আড়চোখে চাহিয়া বলিল, 'তা চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? হাত কোলে করে বসে থাকার চেয়ে ভাল। কী করতে হবে মোসীন সাহেব?'

মোসীন সাহেব উঠিয়া বলিলেন, 'আপনাদের কিছুই করতে হবে না, যা করবার আমি করব। বসুন, আমি এখনি আসছি।'

তিনি নিজের বাড়িতে চলিয়া গেলেন। পনেরো কুড়ি মিনিট পরে ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মাথায় পশমের রোমশ টুপি, গায়ে দামী শেরোয়ানি। আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ডান হাতের মুঠি খুলিয়া দেখাইলেন; হাতের তেলোয় একটি আংটি রহিয়াছে।

আংটিটি বোধ হয় চাঁদির, বেশ ভারী গড়নের। তাহাতে বসানো রহিয়াছে একটি আধুলির মতো গোল কালো পাথর। চক্‌চকে কালো সমতল পাথর। আংটি দেখিয়া খুব দামী বলিয়া মনে হয় না।

শম্ভু বলিল, 'আংটি দেখছি। কী হবে আংটি?'

মোসীন সাহেব বলিলেন, 'মন্ত্রপূত আংটি। প্রায় চারশো বছর এই আংটি আমাদের বংশে আছে। আকবর বাদশার সময় দিল্লীর এক ফকির আমার পূর্বপুরুষকে দিয়েছিলেন। এর গুণ এখনি দেখতে পাবেন। —একটু তেল আনান।'

'তেল!'

'হাঁ, যে কোন তেল। এক ফোঁটা হলেই চলবে।'

ইতিমধ্যে বাড়ির কচিকাঁচা ছেলেমেয়েরা আসিয়া বৈঠকখানায় জমা হইয়াছিল; শম্ভুর ইঙ্গিতে একটি মেয়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং এক শিশি কেশতৈল লইয়া উপস্থিত হইল। মোসীন সাহেব শিশির মুখে আঙুল ভিজাইয়া আংটির সমতল পাথরের উপর মাখাইয়া দিলেন, মসৃণ কালো পাথরটা আয়নার মতো চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, 'আসুন, খোলা জায়গায় যাওয়া যাক।'

বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় ছেলেবুড়ো সকলে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমার ছেলে মেয়ে নীলু ও বুলা বাচ্চাদের দলে আছে এবং খুবই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। একে তো চোর সম্বন্ধে তাহাদের মনে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নাই, তার উপর চোর ধরিবার এই অভিনব প্রক্রিয়া তাহাদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। আমরাও কম আকৃষ্ট হই নাই; বাটি-চালা, বাঁশ-চালা প্রভৃতির কথা শোনা ছিল; সেকালে নখদর্পণ ছিল। মোসীন সাহেবের আংটি বোধ করি তাহারই মুসলমানী সংস্করণ। কিন্তু সত্যই কি ইহার দ্বারা কিছু জানা যায়? না স্রেফ বুজরুকি?

মোসীন সাহেব শিশুর দলকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, 'দুটি বাচ্চা দরকার।' বলিয়া বুলা ও নীলুকে কাছে ডাকিলেন।

বুলা ও নীলু একটু ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম; তাহাদের দিয়া কিরূপ প্রক্রিয়া করাইবেন? বলিলাম, 'বয়স্ক লোক দিয়ে কি হবে না?'

মোসীন সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না। মন সরল এবং নিষ্পাপ হওয়া চাই।'

আর কিছু বলিলাম না। মোসীন সাহেব আংটিটি বুলার হাতে দিয়া বলিলেন, 'তোমরা দু'জনে এই আংটি ধর, পাথরের দিকে চেয়ে থাকো। যদি কিছু দেখতে পাও বোলো।'

বুলা ও নীলু পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আংটি ধরিল, বুলা বাঁ হাতে এবং নীলু ডান হাতে ধরিল, একাগ্র চক্ষে আংটির পাথরের দিকে চাহিয়া রহিল।

মোসীন সাহেব দুই পা পিছনে সরিয়া আসিলেন, চোখের উপর করতল আড়াল করিয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

প্রায় দশ মিনিট। বয়স্থ ব্যক্তিরা সকলেই একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। তারপর বুলা হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল, 'একটা মুখ— একটু মুখ দেখতে পাচ্ছি।' নীলুও মুখে একটা সমর্থনসূচক শব্দ করিল, দু'জনেই দেখিয়াছে।

আমরা সকলে তাহাদের পানে ছুটিয়া গেলাম। কিন্তু মোসীন সাহেব দুই হাত তুলিয়া আমাদের নিবারণ করিলেন, বলিলেন, 'আপনারা কেউ দেখবেন না, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

আমরা থমকিয়া গেলাম। তিনি নীলু ও বুলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কার মুখ দেখছ? চেনা লোক?'

তাহারা দুজনেই মাথা নাড়িল, 'না, চিনতে পারছি না।'

মোসীন সাহেব আবার অনুচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন, 'এবার কি দেখছ?'

বুলা বলিল, 'মুখটা মিলিয়ে যাচ্ছে।'

নীলু বলিল, 'যাঃ, অন্ধকার হয়ে গেল।'

মোসীন সাহেব বলিলেন, 'চেয়ে থাকো। কী দেখতে পাও বলো।' তিনি আবার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বুলা একটি তীক্ষ্ন নিশ্বাস টানিয়া বলিল, 'অন্ধকার কেটে যাচ্ছে... একটা বাড়ির জানালা... যে লোকটার মুখ দেখেছিলুম সে জানালার গরাদ খুলে ভেতরে ঢুকছে... ঐ আবার বেরিয়ে আসছে... হাতে একটা কী রয়েছে... তোরঙ্গ!'

নীলু ভীতকণ্ঠে বলিল, 'দিদি, পালিয়ে আয় দেখতে পাবে!'

মোসীন সাহেব বলিলেন, 'ভয় নেই, ও তোমাদের দেখতে পাবে না। এখন কী হচ্ছে বলো।'

বুলা বলিল, 'চলে যাচ্ছে। তোরঙ্গ কাঁধে তুলে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে যাচ্ছে।'

মোসীন সাহেব বলিলেন, 'তোমরাও ওর সঙ্গে যাও, দেখো কোথায় যাচ্ছে।'

বুলা ও নীলু আংটি চোখের সম্মুখে ধরিয়া বাড়ির পিছন দিকে চলিল। মোসীন সাহেব তাহাদের অনুসরণ করিলেন, আমরা চলিলাম তাঁহার আশেপাশে। বিচিত্র শোভাযাত্রা। সকলের চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। আমি চুপি চুপি শম্ভুকে প্রশ্ন করিলাম, 'কিরে, ব্যাপার কি?' সে অবোধের মতো হাত উল্টাইল।

গরাদ-ভাঙা জানালার পাশ দিয়া বুলা ও নীলু বাড়ির পিছনের আমগাছতলায় উপস্থিত হইল। বুলা বলিল, 'গজাল দিয়ে তোরঙ্গের তালা ভাঙছে... ডালা খুলে গেল... পুঁটলি বাঁধছে... পুঁটলি বগলে করে চলে যাচ্ছে।'

'তোমরাও যাও।'

বুলা ও নীলু আবার চলিল। কাছেই বাগানের একটা আগড় ছিল; আগড়ের ওপারে খোলা ময়দান, ঝোপঝাড়। বুলা ও নীলু আগড় পার হইয়া ময়দানের ভিতর দিয়া চলিল। কিছুদূর যাইবার পর একটা ঝোপের কাছে আসিয়া বলিল, 'এইখানে চোরের পুঁটলি থেকে কি একটা পড়ে গেল— চক্‌চকে জিনিস—'

আমরা আসিয়া দেখিলাম ঝোপের নীচে ঘন ঘাসের মধ্যে একটা সোনালী দ্রব্য পড়িয়া রহিয়াছে। শম্ভু সেটা তুলিয়া লইল, বলিল, 'নতুন বৌয়ের কানের দুল।'

আমাদের উত্তেজনা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল, চোর যে পথে গিয়াছিল সেই পথেই আমরা চলিয়াছি। মোসীন সাহেবের আংটি বুজরুকি নয়। এ কী লোমহর্ষণ কাণ্ড!

বুলা ও নীলু কিন্তু দাঁড়ায় নাই, গতি একটু শ্লথ করিয়া আবার চলিয়াছিল। আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহে চলিলাম। অদৃশ্য চোর যেন পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ...আশ্চর্য! জীবনে কিছুই কি নষ্ট হয় না, লুপ্ত হয় না? কোন অদৃশ্য লোকে সঞ্চিত হইয়া থাকে? আমরা যত গোপনেই দুষ্কার্য করি ধরিত্রীর বুকে সেই দুস্কৃতির পদাঙ্ক অঙ্কিত হইয়া যায়, চর্মচক্ষে দেখা না গেলেও সে দাগ আর মোছে না।

ময়দানের ওপারে ডাইনে-বাঁয়ে একটা রাস্তা। বুলা ও নীলু রাস্তায় পড়িয়া বাঁ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। এখানে রাস্তা নির্জন, পাশে ঘরবাড়ি নাই। বাঁ দিকে ফিরিবার পর আমাদের একজন সহযাত্রী খাটো গলায় বলিল, 'বাজারের দিকে যাচ্ছে। শহুরে চোর।'

ক্রমে রাস্তার ধারে ঘর বাড়ি দেখা দিতে লাগিল। দুই চারিজন লোক আমাদের শোভাযাত্রায় আকৃষ্ট হইয়া দলে ভিড়িয়া পড়িল। যতই শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছি ভিড় তত বাড়িতেছে। শেষে আমাদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দল এক বৃহৎ মিছিলে পরিণত হইল।

শহরের এক রাস্তা হইতে অন্য রাস্তা ঘুরিয়া মিছিল চলিয়াছে। আগে আগে বুলা ও নীলু আংটির উপর চক্ষু রাখিয়া যেন স্বপ্নলোকে সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাদের পিছনে মোসীন সাহেব ও আমরা, এবং আমাদের পিছনে কলকোলাহলরত উত্তেজিত জনতা। সকলেই ব্যাপার বুঝিয়াছে। তাই এত উত্তেজনা। বেলা আন্দাজ দশটা; শীতের রৌদ্র খর হইয়াছে। কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।

শহরের বড় রাস্তা হইতে একটি অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা বাহির হইয়াছে, বুলা ও নীলু তাহাতে প্রবেশ করিল। তাহারা এখন আর কথা বলিতেছে না, নিঃশব্দে চলিয়াছে। অনুমান করা যায়, যে-বায়বীয় মূর্তিকে

তাহারা অনুসরণ করিতেছে তাহার কার্যকলাপে লক্ষণীয় বিশিষ্টতা কিছুই নাই।

এ রাস্তাটায় নিম্ন-মধ্য শ্রেণীর বসতি। অধিকাংশই খোলার চাল, দুই চারিটি পচনশীল পাকা বাড়ি আছে। শম্ভু এই সময় আমার একটা বাহু মুঠি করিয়া ধরিল। চাহিয়া দেখিলাম তাহার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে; যেন রাস্তার উপর তাহার পরিচিত কেহ থাকে, আংটির অমোঘ নির্দেশে সেইদিকে আমরা চলিয়াছি। আমি মুখ না তুলিয়া শম্ভুকে প্রশ্ন করিলাম, সে শঙ্কিতভাবে হাত উল্টাইয়া উত্তর দিল।

একটা ছোট পাকা বাড়ি, জীর্ণ এবং গলিত ত্বক; সদর দরজা বন্ধ। এই বাড়ির সম্মুখে আসিয়া বুলা ও নীলু থামিয়া গেল। বুলা সংহতস্বরে বলিল, 'লোকটা দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে... দোরে ধাক্কা দিচ্ছে... দোর খুলে গেল... লোকটা পুঁটলি নিয়ে ভেতরে চলে গেল... দোর আবার বন্ধ হয়ে গেল...'

আমি জানি না এ কাহার বাড়ি। শম্ভুর পানে চাহিয়া ছিলাম; তাহার মুখ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ভিড়ের মধ্য হইতে এক একজন চেঁচাইয়া উঠিল, 'ধাক্কা মারো— ভেঙে ফেল দরজা।'

কিছুক্ষণ সকলে নিশ্চল রহিল। তারপর আমি দৃঢ়পদে সম্মুখে গিয়া দরজায় টোকা দিলাম।

দরজা খুলিয়া গেল। যে দরজা খুলিল তাহাকে আমি চিনি, কাল রাত্রেই দেখিয়াছি। সে ঘুম-ভরা চোখে হতচকিত দৃষ্টি লইয়া জনতার পানে চাহিল।

নীলু ভয়ার্ত চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাবা—'

বুলাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিল, 'ঐ— ঐ চোর!'

নটবর মল্লিক সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কাল রাত্রে বুলা ও নীলু তাহাকে দেখে নাই। তাই আজ আংটিতে তাহার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। এখন আসল মানুষটাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছে।

পুলিস আসিয়া পরম পরোপকারী নটবর মল্লিককে ধরিল, তাহার বাড়ি হইতে চোরাই বস্ত্রালঙ্কার সমস্তই পাওয়া গেল।

আমি সেইদিনই সপরিবারে ফিরিয়া আসিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম, আদালতে বিচারকালে হাকিম পুলিস-তৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তখন ইংরেজের আমল। সাহেব হাকিম নখদর্পণ জাতীয় বর্বরোচিত কুসংস্কার বিশ্বাস করেন নাই।

১৫ আশ্বিন ১৩৬৫

প্রত্নকেতকী

কুকুরছানাটা বোধকরি অদৃষ্টপ্রেরিত হইয়াই সেদিন রাস্তায় নামিয়াছিল।

সুবীর সন্ধ্যার সময় স্ত্রীকে লইয়া মোটরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। মাথা-খোলা জাগুয়ার গাড়িটা আস্তে চলিতে জানে না, সামনে সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর খোলা রাস্তা পাইয়া উল্কার বেগে ছুটিয়াছিল।

কুকুরছানা সময় বুঝিয়া ফুটপাথ হইতে রাস্তায় অবতরণ করিল। তারপর মন্থরপদে রাস্তা পার হইয়া চলিল। তাহার আকৃতি অতি ক্ষুদ্র, গায়ের রঙ নোংরা হলুদবর্ণ। সুবীর প্রথমে তাহাকে দেখিতে পায় নাই; যখন দেখিতে পাইল তখন কুকুরছানা ও মৃত্যুর মাঝখানে বিশ গজের ব্যবধান। সুবীর সবেগে ব্রেক কষিল।

স্বামীর পাশে বসিয়া অরুণা এই বেগ-সংহতির জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহার কপাল ড্যাশ্‌বোর্ডের গায়ে সজোরে ঠুকিয়া গেল। কপাল কাটিল না বটে, কিন্তু অরুণা একটি ক্ষীণ কাকুতি উচ্চারণ করিয়া সুবীরের গায়ে হেলিয়া পড়িল।

কুকুরছানা চাপা পড়ে নাই, অক্ষত ছিল; সে গুটিগুটি ফিরিয়া গিয়া আবার ফুটপাথে উঠিল। সুবীর দেখিল অরুণা মূর্ছা গিয়াছে। সে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল— 'অরুণা! অরুণা!'

অরুণা সাড়া দিল না। সুবীরের বুকের মধ্যে একবার ধ্বক্ করিয়া উঠিল; তারপর সে মোটর ঘুরাইয়া তীরবেগে চলিল। মাইল খানেক দূরে একটা নার্সিং হোম আছে, সেখানকার ডাক্তার তাহার পরিচিত।—

সুবীর অবস্থাপন্ন বনেদী ঘরের ছেলে। শান্ত শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান যুবক, তাহার চরিত্রে একটি অচপল দৃঢ়তা আছে। মাত্র ছয় মাস হইল অরুণার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। অরুণা উচ্ছল রূপবতী। আধুনিক আদর্শে কৃশাঙ্গী তন্বী নয়। কিন্তু কালিদাস ও জয়দেবের চোখে বোধকরি ভাল লাগিত; তাহাকে দেখিলে গীতগোবিন্দ ও মেঘদূতের কথা মনে পড়িয়া যায়।

ছয় মাসের বিবাহিত জীবনে তাহারা মনের দিক দিয়া খানিকটা কাছাকাছি আসিয়াছে, কিন্তু একেবারে মিশিয়া গলিয়া একাকার হইয়া যায় নাই। সুবীর নিজের মন-প্রাণ অরুণার কোলে ঢালিয়া দিয়াছে, কিন্তু অরুণার মনের আড়াল এখনও পুরাপুরি ঘুচিয়া যায় নাই। বিবাহ এমন একটি অনুষ্ঠান যাহার ফলে দুইটি যুবক-যুবতী অকস্মাৎ পরস্পরের অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু দৈহিক ঘনিষ্ঠতা ঘটিলেই যে মনের ঘনিষ্ঠতা ঘটিবে এমন কোনও কথা নাই। কাহারও কাহারও মনের কবাট আস্তে আস্তে খোলে, খুলিতে বিলম্ব হয়।—

নার্সিং হোমের ডাক্তার অরুণাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন— 'ভয়ের কিছু নেই, সামান্য কংকাশন (concussion) হয়েছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই জ্ঞান হবে।'

অরুণার যখন জ্ঞান হইল সুবীর তখন তাহার শয্যাপাশে বসিয়া একাগ্র চক্ষে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। অরুণার চোখে কিন্তু মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি, সে ক্ষণকাল শূন্যে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল— 'কেয়ার গন্ধ!'

ডাক্তার বলিলেন— 'সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তিন-চার দিন লাগবে।'

অরুণা নার্সিং হোমেই রহিল। তিন দিন পরে সুবীর অরুণাকে গৃহে লইয়া আসিল। অরুণা এখন সারিয়া উঠিয়াছে, সেই আচ্ছন্ন ভাব আর নাই। তবু, তাহার মুখের হাসি চোখের চাহনি দেখিয়া মনে হয় সে যেন অন্তরের কোন্ সুদূর-লোকে প্রবেশ করিয়াছে, বহির্লোকের সহিত তাহার সম্পর্ক কমিয়া গিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর

মধ্যে যে সান্নিধ্য নিবিড় হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল তাহা আবার শিথিল হইয়া গিয়াছে।

কয়েকদিন লক্ষ্য করিয়া সুবীর নার্সিং হোমের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিল। ডাক্তার শুনিয়া বলিলেন— ‘ও কিছু নয়, দু’চার দিনে ঠিক হয়ে যাবে। এক কাজ করুন না, ওঁকে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসুন। চেঞ্জ লাগলে শিগ্‌গির আরাম হয়ে যাবেন।’

সুবীর বলিল— ‘কোথায় যাব? শীত এসে পড়ল, এখন তো পাহাড়ে যাওয়া চলবে না।’

ডাক্তার বলিলেন— ‘নাই বা গেলেন পাহাড়ে। অত বড় রাজস্থানের মরুভূমি পড়ে রয়েছে, সেখানে যান।’

রাজস্থানের মরুভূমি! সুবীরের মনে পড়িয়া গেল, তাহার এক দূর-সম্পর্কের ভগিনীপতি মস্তবড় প্রত্নতাত্ত্বিক, তিনি বর্তমানে রাজস্থানের পশ্চিম প্রান্তে খননকার্য চালাইতেছেন। ভালই হইয়াছে, সুবীর অরুণাকে লইয়া রাজস্থানের মরুভূমিতেই যাইবে। নূতন দেশ, নূতন পরিবেশ, অরুণা অচিরাৎ সারিয়া উঠিবে।

সে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া অরুণার কাছে প্রস্তাব করিল। অরুণা বিশেষ ঔৎসুক্য দেখাইল না, কিন্তু রাজী হইয়া গেল।

তারপর দিন দশেকের মধ্যে রাজস্থানে ভগিনীপতিকে চিঠি লিখিয়া সব রকম ব্যবস্থা করিয়া সুবীর অরুণাকে লইয়া রাজস্থানের পথে বাহির হইয়া পড়িল।

কলিকাতা হইতে রাজস্থানের অপরান্ত সামান্য পথ নয়, দিল্লীতে ট্রেন বদল করিয়া যাইতে তিন দিন লাগে। মেল ট্রেনের একটি কুপে কামরায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে অরুণার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল, চোখেমুখে উৎসুক আগ্রহ দেখা দিল। সে এ-জানালা হইতে ও-জানালায় ছুটাছুটি করিয়া, সুবীরকে নানা বিচিত্র প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অরুণার এই পরিবর্তনে সুবীর পরম আহ্লাদিত হইল, তাহাকে কাছে টানিয়া গদ্‌গদ্ সুরে বলিল— ‘ভাল লাগছে?’

অরুণা কাকলিকলিত স্বরে বলিল— ‘খুব ভাল লাগছে। আমার কী মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে অনেক দিন বিদেশে থাকার পর নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি।’

তারপর একদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে তাহারা রাজস্থানের একটি ছোট স্টেশনে অবতরণ করিল। তাহারা প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই স্টেশনের বাহিরের শুষ্ক প্রান্তর হইতে বালি-মাখা আতপ্ত বাতাসের একটা তরঙ্গ তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া গেল। অরুণা চকিত চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া বলিল— ‘গন্ধ পাচ্ছ? কেয়া ফুলের গন্ধ?’

অরুণা পূর্বেও একবার অর্ধচেতন অবস্থায় কেয়া ফুলের উল্লেখ করিয়াছিল, সুবীরের মনে পড়িল। সে দীর্ঘ ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বলিল— ‘কেয়া ফুলের গন্ধ? কই, না! ইঞ্জিনের পোড়া কয়লার গন্ধ পাচ্ছি।’

এই সময় কোট-প্যান্ট সোলা-হ্যাট-পরা প্রত্নবিৎ বিরাজমোহনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রৌদ্রতাম্র শীর্ণাঙ্গ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, বাংলা ইংরেজী হিন্দী সংস্কৃত মিশাইয়া কথা বলেন। সুবীর তাঁহাকে প্রণাম করিল, দেখাদেখি অরুণাও প্রণাম করিল। বিরাজমোহনবাবু ইতিপূর্বে অরুণাকে দেখেন নাই, সপ্রশংস হাসিয়া বলিলেন— ‘বাঃ, খাসা শ্যালবধূ তো!’

সুবীর অবাক হইয়া বলিল— ‘শ্যালবধূ!’

বিরাজবাবু বলিলেন— ‘শ্যালবধূ বুঝলে না? তুমি হলে আমার শ্যাল, মানে শ্যালক; ও হল গিয়ে তোমার বধূ, সুতরাং শ্যালবধূ।— এস, জীপ এনেছি, স্টেশন থেকে পনরো মাইল যেতে হবে।’

জীপে মালপত্র তুলিয়া তিনজনে গাড়িতে উঠিলেন, বিরাজবাবু গাড়ি চালাইলেন। স্টেশন হইতে আধ মাইল যাইবার পর আর লোকালয় দেখা যায় না; চারিদিকে ধূ ধূ বালি; দুই-চারিটা কঙ্কালসার বৃক্ষ ও ঝোপঝাড়, দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢিবি, তাহার মধ্যে দিয়া অস্পষ্ট পাথুরে পথের চিহ্ন চলিয়াছে।

জীপ চালাইতে চালাইতে বিরাজবাবু কথা বলিতে লাগিলেন। —‘এ দেশটা এখন প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু দু’হাজার বছর আগে এমন ছিল না, উর্বর দেশ ছিল। তখন এখানে একটি রাজ্য

ছিল; মরুভূমির উপান্তে ছোট্ট একটি রাজ্য। তারপর প্রকৃতি এবং মানুষ একসঙ্গে এই রাজ্যের পিছনে লাগিল। ইতিহাসে যাদের Parthian বলা হইয়াছে সেই পারদ জাতি এদেশ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল। কিন্তু বেশি দিন রাজ্য ভোগ করিতে পারিল না। দুই শত বছরের মধ্যে মরুভূমি আসিয়া রাজ্যটিকে গ্রাস করিয়া লইল। এখন এদেশে মানুষের বসতি নাই বলিলেই চলে, পুরাতন ঘরবাড়িও ভূমিসাৎ হইয়াছে কেবল প্রস্তরনির্মিত রাজপ্রসাদটি এখনও মরুভূমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বালুর মধ্যে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় মাথা জাগাইয়া আছে।

'এই রাজপ্রাসাদ এখন আমাদের স্কন্ধাবার, মানে হেড্ কোয়ার্টার্স। তোমাদের সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।'

সুবীর বলিল— 'সেখানেই খোঁড়াখুঁড়ি করছেন নাকি?'

বিরাজবাবু হাসিলেন– 'আরে না না, ও প্রাসাদ তো মাত্র দেড় হাজার কি দু'হাজার বছরের পুরনো। আমাদের দৃষ্টি আরো গভীরে। রাজপ্রাসাদ থেকে মাইল তিনেক দূরে এক জায়গায় সিন্ধু সভ্যতার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। অন্তত চার হাজার বছর আগে ওখানে ব্রোঞ্জ যুগের একটা সভ্যতা ছিল, এখন বালি চাপা পড়েছে। আমরা তাই খুঁড়ে বার করছি।'

বিরাজবাবু শুধু প্রত্নপণ্ডিত নন, প্রত্নপাগল; তিনি উৎসাহভরে খননকার্য বিষয়ে আরও অনেক তথ্য বলিয়া চলিলেন। সুবীরের পুরাতত্ত্বের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না, সে নীরবে শুনিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা চলিবার পর সম্মুখে মাইল দুয়েক দূরে একটা উঁচু পাথরের ঢিবি দৃশ্যমান হইল; যেন বালু ফুঁড়িয়া একটা ত্রিকোণ পাথরের চাঙড় মাথা তুলিয়াছে। বিরাজবাবু বলিলেন— 'ঐ দেখ রাজপ্রাসাদ, যেখানে তোমরা থাকবে।'

অরুণা উৎসুক চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। সুবীর বলিল— 'আপনিও তো ওখানেই থাকেন।'

বিরাজবাবু বলিলেন— 'ওখানে আমার অফিস আছে বটে, কিন্তু আমি বেশির ভাগ তাঁবুতেই থাকি। যেখানে এক্স্‌কাভেশন হচ্ছে সেখানে হরদম না থাকলে অসুবিধা হয়। আমার সহকারীরা এবং কুলিরাও সরজমিনে থাকে। রাজপ্রাসাদটা তোমাদের দু'জনের জন্যে রিজার্ভ থাকবে।'

সুবীর ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল— 'কেবল আমরা দু'জন একলা থাকব?'

বিরাজবাবু বলিলেন— 'একেবারে একলা নয়, অফিসের একজন পাহারাদার আছে, সে প্রাসাদেই থাকে। তার বৌকেও আনিয়ে রেখেছি। ওরা স্থানীয় লোক। দু'জনে মিলে তোমাদের খবরদারি করবে!'

জীপ আসিয়া রাজপ্রাসাদের সামনে থামিল। একজোড়া স্ত্রীপুরুষ প্রাসাদের ছায়ায়, বালুর উপর মুখোমুখি বসিয়া ছিল, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। পুরুষের মাথায় ধামার মতো প্রকাণ্ড পাগড়ি, পাগড়ির নীচে গোঁফ ও দোপাট্টা দাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। স্ত্রীলোকটির নাকে নথ, সীমন্তে রূপার ঘুন্টি।'

বিরাজবাবু বলিলেন— 'গিরধর সিং, এঁরা এসেছেন, তোমরা এঁদের দেখভাল্ করবে। রুক্‌মিণী, রান্নার ব্যবস্থা করেছ তো? বেশ, আমি এখন খাদে যাচ্ছি, 'চিরাগ-বাত্তি'র সময় ফিরব। তোমরা এঁদের সামান্ ভিতরে নিয়ে যাও।' সুবীরকে বলিলেন— 'আজ রাত্তিরটা আমি এখানেই থাকব, তোমাদের ঘর-বসত করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। —আচ্ছা।'

বিরাজবাবু জীপ চালাইয়া প্রস্থান করিলেন।

গিরধর সিং ও রুক্‌মিণী লটবহর লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সুবীর ও অরুণা প্রাসাদের সম্মুখে বালুর উপর পায়চারি করিতে করিতে চারিদিক দেখিতে লাগিল। প্রাসাদের সদর আন্দাজ পঞ্চাশ গজ চওড়া, আগাগোড়া গেরুয়া রঙের পাথর দিয়া তৈয়ারি। নীচের তলা বালুস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু অবশিষ্ট দুইতল মিলিয়া এখনও প্রায় চল্লিশ ফুট উচ্চ। তৃতীয়তল পিরামিডের ন্যায় কোণাকৃতি। স্থানে স্থানে পাথর খসিয়া গিয়া প্রাসাদের গায়ে ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর অটুট আছে।

সুবীর দেখিতে দেখিতে বলিল— 'এত পুরনো বাড়ি, দেখে কিন্তু মনে হয় না। এই বাড়িতে দেড় হাজার দু'হাজার বছর আগে রাজা-রানী থাকত, লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত গম্‌গম্ করত, কল্পনা করা যায় না। তুমি

কল্পনা করতে পার?'

স্বপ্নাতুর চক্ষে চাহিয়া অরুণা বলিল— 'পারি।'

গিরধর আসিয়া জানাইল, সামান্ যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে, এখন মালিক ও মাল্‌কিণী গৃহে প্রবেশ করিতে পারেন। সুবীর ও অরুণা ঢালু বালির পাড় আরোহণ করিয়া একেবারে দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত হইল। বারান্দাটি প্রশস্ত, তাহার প্রান্ত হইতে ঘরের সারি আরম্ভ হইয়াছে; কক্ষের পর কক্ষ, অসংখ্য কক্ষ। কোনোটি আকারে আয়তনে সভাগৃহের ন্যায় বৃহৎ, কোনোটি কোটরাকৃতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। সব মিলিয়া একটি বিশাল মধুচক্র বলিয়া ভ্রম হয়।

অট্টালিকার নিম্নতল হইতে পাথরের সিঁড়ি বিবর-নির্গত অজগরের মতো দ্বিতলের বারান্দায় উঠিয়াছে। তারপর পাক খাইয়া ত্রিতলের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

গিরধর সিং বলিল— 'আপনাদের মহল তিনতলায়। আসুন।'

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল— 'তোমরা কোথায় থাকো?'

গিরধর সোপান-গহ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল— 'নীচে দুটো ঘর পরিষ্কার করে নিয়েছি, সেখানে থাকি। রান্নাঘরও সেখানেই। ভারি চমৎকার জায়গা হুজুর। ঠাণ্ডা নেই, গরম নেই; একটু অন্ধকার, এই যা।'

সুবীর বলিল— 'আর অফিস কোথায়?'

গিরধর বলিল— 'ঐ যে ওদিকের ঘরগুলো, ওখানে অফিস।'

সুবীর একটা বড় ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, অনেকগুলো টেবিল রহিয়াছে; টেবিলের উপর নানা আকৃতির পাথরের টুক্‌রো। অফিসের স্বাভাবিক সরঞ্জাম, কাগজপত্র, টাইপরাইটার, কিছুই নাই।

সুবীর বলিল— 'চল, এবার আমাদের মহল দেখি।'

ত্রিতলটা চন্দ্রশালা, অর্থাৎ চিলেকোঠা। পাশাপাশি তিনটি ঘর; বাকি ছাদ উন্মুক্ত, মাঠ ময়দানের ন্যায় প্রশস্ত। ছাদ ঘিরিয়া পাথরের কারুকর্মখচিত আলিসা। মেঝের উপর বালুকার পুরু পলি পড়িয়াছে।

ঘর তিনটি কিন্তু পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন, ধূলাবালির চিহ্ন নাই। মাঝের ঘরে একটি বড় খাট, এক পাশের ঘরে একটি টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার দিয়া বৈঠকের আকারে সাজানো হইয়াছে; অন্য পাশের ঘরে স্নানাদির ব্যবস্থা। বিরাজবাবু প্রত্নলোকবাসী হইলেও বর্তমানকালের শ্যালক ও শ্যালবধূর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ভালই করিয়াছেন।

এই ঘরগুলির একটা অসুবিধা, দ্বারের কপাট নাই। পূর্বকালে নিশ্চয় কাঠের কপাট চৌকাঠ সবই ছিল, এখন ঘুণ-চর্বিত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যা হোক, বিরাজবাবু দ্বারে পর্দা টাঙাইয়া দিয়া যথাসম্ভব আব্রু রক্ষা করিয়াছেন।

গিরধর সিং বলিল— 'হুজুর, আপনারা আরাম করুন, আমি চায় নিয়ে আসি।'

গিরধর সিং চলিয়া গেল। সুবীর ও অরুণা ঘরগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। সুবীরের মুখে চোখে নূতনত্বের ঔৎসুক্য, অরুণার চোখে অবাস্তবের কুহক। সুবীর বলিল— 'কেমন লাগছে?'

অরুণা অস্ফুট আত্মগত স্বরে বলিল— 'এসব আসবাব এখানে কেন!'

সুবীর চকিত হইয়া বলিল— 'সেকালের বাড়িতে একালের আসবাব বেমানান্ ঠেকছে— না! কিন্তু উপায় কি! গজদন্ত পালঙ্ক অস্নেহদীপিকা সুবর্ণভৃঙ্গার, এসব কোথায় পাওয়া যাবে!'

গিরধর সিং একটি বড় থালার উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া উপস্থিত হইল। দু'টি পাথরের বাটিতে মশলাদার চা; সঙ্গে ডালের ভাজিয়া, ঝাল মটর, পাঁপড় ভাজা ইত্যাদি টুকিটাকি খাবার। দু'জনেরই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহারা সাগ্রহে খাইতে বসিল।

চায়ের স্বাদ ঠিক স্বাভাবিক চায়ের মতো নয়, তবু মন্দ লাগিল না। ভাজাভুজিতে ঝাল একটু বেশি, কিন্তু

অত্যন্ত মুখরোচক। দু'জনে হুস্‌হাস্ করিতে করিতে সব খাইয়া ফেলিল। তারপর ঘরের বাহিরে ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াইল।

প্রাসাদের পিছন দিকে বালুপ্রান্তরের পরপারে সূর্য অস্ত যাইতেছে। আতপ্ত বাতাসের গায়ে একটু শৈত্যের স্পর্শ লাগিয়াছে। দু'জনে আলিসার পাশ দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পশ্চিম দিকে গিয়া উপস্থিত হইল। অরুণা আয়ত চক্ষু মেলিয়া দিগন্তের পানে চাহিল। সুবীর নীচের দিকে উঁকি মারিল। শ' হাত নীচে আল্‌গা বালির ঢালু বাঁধ প্রাসাদের নিতম্বে আসিয়া ঠেকিয়াছে। সে বলিল— 'চারিদিকে বালির সমুদ্র, মাঝখানে এই প্রাসাদ যেন একটি পাথরের দ্বীপ।'

অরুণা উত্তর দিল না, একাগ্র চক্ষে অস্তমান সূর্যের পানে চাহিয়া রহিল।

সূর্য অস্ত গেল। নিম্নে বালুর উপর ঈষৎ আলোড়ন তুলিয়া শুষ্ক শীতল বায়ু তাহাদের মুখে আসিয়া লাগিল। অরুণা হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। সুবীর কাছে আসিয়া তাহার স্কন্ধ জড়াইয়া লইল, বলিল— 'ঠাণ্ডা লাগছে। চল, ঘরে যাই। ভারি মজার দেশ রাজস্থান; দিনে গ্রীষ্মকাল, আবার সূর্যাস্ত হতে না হতেই শীতকাল।'

দু'জনে ঘরে ফিরিয়া গেল। সুবীর লক্ষ্য করিল না, অরুণার চোখে শঙ্কা-ছোঁয়া উত্তেজনা। সে যে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়াছিল তাহা কেবল শীতল বায়ুর স্পর্শ নয়, তাহার মনেও যেন কোন্ অভাবনীয় ভবিতব্যতার স্পর্শ লাগিয়াছে।

ঘরে একটি অর্ধ-গোলাকৃতি গবাক্ষ আছে, বর্তমানে তাহার উপর পর্দা ঢাকা। ছায়াচ্ছন্ন ঘরে সুবীর ও অরুণা দুইটি চেয়ারে পাশাপাশি বসিল; সুবীর অরুণার একটা হাত নিজের হাতে লইয়া বলিল— 'নতুন জায়গায় এসে তোমার বেশ ভাল লাগছে?'

অরুণা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল— 'ভাল লাগছে। আবার একটু ভয়-ভয় করছে।'

সুবীর অনুভব করিল, অরুণার হাতের আঙুলগুলি ঠাণ্ডা, সে আঙুলের সহিত আঙুল জড়াইয়া লইয়া বলিল— 'ভয়ের কী আছে। বাড়িটা মান্ধাতার আমলের, লোকজনও বেশি নেই, তাই একটু ভূতুড়ে-ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। দু'দিন থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

অরুণা দ্বিধাভরে বলিল— 'হ্যাঁ।'

দ্বারের কাছে আলো দেখা গেল। রুক্‌মিণী প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটি রেকাবির উপর কয়েকটি জ্বলন্ত মোমবাতি। এই দীপান্বিতা রমণীকে দেখিয়া সুবীরের চোখে একটা বিভ্রম জন্মিল; রুক্‌মিণী যেন বর্তমানকালের মেয়ে নয়, তাহার বেশভূষা স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গি সবই যেন সুদূর অতীতের স্পর্শবহ। রুক্‌মিণী সুন্দরী নয়, যুবতীও নয়। তাহার বয়স ত্রিশের ঊর্ধ্বে, তামাটে গৌরবর্ণ দেহে কঠিন স্বাস্থ্য, নথ-পরা মুখখানিতে আভিজাত্যের দীপ্তি। প্রকৃতির বিচিত্র বিধানে রাজস্থানের উচ্চ নীচ সকল জাতির মেয়ের দেহে রাজকন্যাসুলভ মর্যাদা রহিয়া গিয়াছে।

রুক্‌মিণীর হাসিটা মিষ্ট, কণ্ঠস্বরও বিনম্র। একটি মোমবাতি টেবিলের উপর রাখিয়া সে অরুণার পানে চোখ তুলিল, ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলিল— 'বাঈ, সব ঘরে বাতি দিয়ে আসি?'

অরুণা বলিল— 'এস।' অরুণার বাপের বাড়ি বিহার প্রদেশে, সেও অল্পবিস্তর হিন্দী বলিতে পারে।'

রুক্‌মিণী চলিয়া গেল; অন্য ঘর দুটোতে বাতি দিয়া আসিয়া অরুণার পাশে দাঁড়াইল— 'বাঈ, এবার তোমার চুল বেঁধে দিই?'

অরুণা তাহার পানে স্মিত মুখ ফিরাইল, নিজের চুলে একবার আঙুল বুলাইয়া বলিল— 'আজ থাক। আজ শুধু মুখ-হাত ধুয়ে নেব।'

'আচ্ছা। আমি তাহলে যাই, রসুই করতে হবে।'

'যাও।' রুক্‌মিণী অরুণার প্রতি একটি সুস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল। সুবীর বলিল— 'রুক্‌মিণীর দেখছি তোমাকে ভাল লেগেছে।'

অরুণা একটু অন্যমনস্ক হাসিল।

দু'জনে মোমবাতির আলোয় নীরবে বসিয়া রহিল। অরুণার দিকে চাহিয়া সুবীরের মনে হইল, এই অস্পষ্ট আলোতে অরুণা যেন আরও অবাস্তব হইয়া গিয়াছে।

নীচে জীপের শব্দ হইল। বিরাজবাবু ফিরিয়াছেন। অরুণা উঠিয়া পড়িল। স্যুটকেস হইতে কাপড়, জামা, সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি লইয়া স্নানঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বিরাজবাবু প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে এক মুঠি ধূপের কাঠি। উচ্চকণ্ঠে বলিলেন— 'কি হে, কেমন অট্টালিকা? শ্যালবধূ কোথায়?'

সুবীর বলিল— 'বাথরুমে গেছে। চমৎকার অট্টালিকা! আপনি কোথায় শোবেন?'

বিরাজবাবু বলিলেন— 'ভয় নেই, আড়ি পাতব না। আমার শয়নকক্ষ দোতলায়।— স্টেশনে এক আঁটি ধূপকাঠি কিনেছিলাম, জীপেই পড়ে ছিল।' বলিয়া তিনি কয়েকটা ধূপ জ্বালিয়া দিয়া চেয়ারে বসিলেন— 'এ ঘরগুলোতে ধূপ-ধুনো দেওয়া দরকার, অনেক দিন শূন্য পড়ে আছে।'

ধীরে ধীরে ঘরটি ধূপের গন্ধে ভরিয়া উঠিল।

সুবীর বলিল— 'চা খাবেন না?'

বিরাজবাবু বলিলেন— 'তাঁবু থেকে চা খেয়ে এসেছি। এখানে কেবল রাত্রে ভোজন এবং শয়ন। তারপর সূর্যোদয়ের আগেই প্রস্থান।'

সুবীর বলিল— 'এখানকার জল-হাওয়া খুব ভাল—না?'

বিরাজবাবু সোৎসাহে বলিলেন— 'মরুভূমির মতো জায়গা আছে! রোগের বীজাণু এখানে টিকতে পারে না, জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। তাছাড়া এমন রাত্রি পৃথিবীর আর কোথাও নেই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এ দেশটা রাজস্থানের অন্তর্গত হলেও আসলে মালব দেশ। মুসলমানেরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসে ওরা লক্ষ্য করেছিল, অযোধ্যার সন্ধ্যা, রাজোয়াড়ার সকাল আর মালবের রাত্রি জগতে অতুলনীয়। মুসলমানী ভাষায় বয়েৎ আছে।'

মালবের রাত্রি! বাক্যটির রোমান্টিক স্বাদ সুবীর মনে মনে গ্রহণ করিতেছে এমন সময় অরুণা শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে স্নিগ্ধ-শিখা মোমবাতি। সুবীরের মাথায় কবিতা গুঞ্জরিয়া উঠিল— হেন কালে হাতে দীপশিখা, ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা!

প্রবেশ করিয়াই অরুণা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, চকিত কটাক্ষে এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল— 'কেয়া ফুলের গন্ধ!'

বিরাজবাবু হাসিয়া উঠিলেন— 'কেয়া ফুল নয়, অম্বুরী ধূপের গন্ধ। কেয়া ফুল এদেশে কোথায়! তাছাড়া এটা কেয়া ফুলের সময় নয়। —এস শ্যালবধূ।'

দ্বিধামন্থর পদে অরুণা আসিয়া টেবিলের উপর মোমবাতি রাখিল, একটু অপ্রতিভ হাসিয়া বিরাজবাবুর পাশের চেয়ারে বসিল। তাহার মনের মধ্যে যেন বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সুবীরের মনে উদ্বিগ্ন বিস্ময় পাক খাইতে লাগিল— অরুণা বার বার কেয়া ফুলের গন্ধ পাইতেছে! কী ব্যাপার?

বিরাজবাবু কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটু বেশি কথা বলেন, কিন্তু কথাগুলি নীরস নয়। নানাপ্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা মিশাইয়া দুই ঘণ্টাকাল কাটাইয়া দিলেন।

গিরধর ও রুক্‌মিণী রাত্রির আহার লইয়া আসিল। আহার্য দ্রব্যগুলি টেবিলে রাখিয়া গিরধর আরও কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়া দিল। তিনজনে টেবিলের ধারে চেয়ার টানিয়া খাইতে বসিলেন।

খাদ্যবস্তু সংখ্যায় এবং পরিমাণে প্রচুর। শাক-সবজিই বেশি, তার সঙ্গে ঘৃতপক্ক অন্ন ও চাপাতি, অল্প মাংস, মালাই এবং বরফি।

খাইতে খাইতে সুবীর বলিল— 'এই মরুভূমির মাঝখানে তাজা শাক-সবজি পান কোত্থেকে?'

বিরাজবাবু বলিলেন— 'মাইল দুই দূরে আভীরদের একটা গ্রাম আছে, তারাই দুধ আর শাক-সবজি জোগায়। মাঝে মাঝে ভেড়ার মাংস পাওয়া যায়। কিন্তু মাছ পাওয়া যায় না। মরুভূমিতে জল কোথায় যে মাছ আসবে!'

সুবীর জলের গেলাসে চুমুক দিয়া বলিল— 'ভারি সুস্বাদু জল। এ জল কোথায় পান?'

বিরাজবাবু বলিলেন— 'নীচের তলায় একটা ঘরের মেঝেয় ইঁদারা আছে। সেই দু'-হাজার বছরের পুরনো ইঁদারা! কিন্তু কী জল! বরফের মতো ঠাণ্ডা, শরবতের মতো মিষ্টি।

অরুণা পুরুষদের বাক্যালাপে যোগ দিল না, একটু নিঝুম ভাবে আহার করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে বিরাজবাবু বলিলেন— 'শ্যালবউ, তুমি ক্লান্ত হয়েছ, শুয়ে পড় গিয়ে, আমরা আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজব করি। কাল ভোরেই আমি চলে যাব, হয়তো দু'তিন দিন আসতে পারব না।'

অরুণা একটু ঘাড় হেলাইয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। তারপর দু'জনে ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া গল্প করিতে করিতে ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। বিরাজবাবু গলা খাটো করিয়া বলিলেন— 'বৌকে কিছু বোলো না, কিন্তু গিরধরের মুখে শুনেছি এ বাড়িতে নাকি আছে।'

'কী আছে— ভূত-প্রেত! আপনি বিশ্বাস করেন?'

বিরাজবাবু হাসিলেন— 'আমি বিজ্ঞানী, যার প্রমাণ পেয়েছি তা বিশ্বাস না করে উপায় কি? বিজ্ঞানী আর অ-বিজ্ঞানীর মধ্যে ঐখানেই তফাত, বিজ্ঞানী প্রমাণ পেলে বিশ্বাস করে, অ-বিজ্ঞানী প্রমাণ পেলেও বিশ্বাস করে না, উল্টে নানা রকম কু-ব্যাখ্যা শুরু করে দেয়।'

'আপনি তাহলে প্রমাণ পেয়েছেন?'

'দ্যাখো, ভূত-কাল নিয়েই আমার কারবার। ভূত-কালের সন্ধানে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ এমন কিছু পেয়েছি যাকে বাস্তব বলা যায় না। সে গল্প আর-একদিন বলব। তবে এ বাড়িতে আমি নিজে কিছু প্রত্যক্ষ করিনি। যা শুনেছি চাকর-বাকরের মুখে।'

'ওরা কী বলে?'

'ওরা বলে একটা আত্মা আছে। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে বীণার ঝঙ্কার শোনা যায়, তাজা ফুলের গন্ধ চারিদিকে ভর্‌ভর্‌ করতে থাকে—।'

সুবীর চমকিয়া বলিল— 'কোন্ ফুল! কেয়া?'

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন— 'তা জানি না। আজ তোমার বৌ কেয়ার গন্ধ পেয়েছিল... তাই তো, এটা আমার খেয়াল হয়নি—'

সুবীর বলিল— 'অরুণার এই দুর্ঘটনা হবার পর থেকে সে তিনবার কেয়া ফুলের গন্ধ পেয়েছে; কোথাও কেয়া ফুল নেই, তবু গন্ধ পেয়েছে। এর মানে আপনি বলতে পারেন?' বলিয়া সুবীর মোটর দুর্ঘটনার পর হইতে ব্যাপার বিবৃত করিল।

বিরাজবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন— 'এখানে আসার আগে যদি গন্ধ পেয়ে থাকে তাহলে অলৌকিক কাণ্ড না হতেও পারে। হয়তো মাথায় চোট লাগার ফলে olfactory nerves বিগ্‌ড়ে গিয়েছে। স্নায়ু বড় বিচিত্র যন্ত্র। যা হোক, ভাবনার কিছু নেই, আস্তে আস্তে normal হয়ে যাবে।'

তারপর, রাত্রি গভীর হইতেছে দেখিয়া তিনি দ্বিতলে শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন। সুবীর শয়নকক্ষে যাইবার আগে একবার বহির্দ্বারের পর্দা সরাইয়া ছাদের দিকে উঁকি মারিল। বাহিরে মধুর শীতলতা; চাঁদ আকাশের মাঝখানে উঠিয়াছে, বালু-ঢাকা প্রকাণ্ড ছাদ চন্দ্রকিরণে কিংখাবের মতো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তন্দ্রাজড়িত স্বপ্নসমাকুল দৃশ্য। মালবের রাত্রি। সুবীর একটি নিশ্বাস ফেলিল। অরুণা যদি সুস্থ থাকিত, দু'জনে মিলিয়া তাহারা মালবের এই অপরূপ রাত্রি উপভোগ করিতে পারিত।

সুবীর শয়নকক্ষে গেল। বৃহৎ কক্ষের মাঝখানে বিস্তীর্ণ পালঙ্ক, অরুণা শয্যার এক পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া

পড়িয়াছে। সুবীর পালঙ্কের পাশে ঝুঁকিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল— 'অরুণা!'

অরুণা জাগিল না। তাহার দেহ এমন শিথিল ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছে যে মনে হয়, শুধু ঘুম নয়, ঘুমের চেয়েও দুরবগাহ অবচেতনার মধ্যে তাহার সংজ্ঞা ডুবিয়া গিয়াছে। হঠাৎ শঙ্কিত হইয়া সুবীর তাহার বুকের উপর করতল রাখিল। না, হৃৎস্পন্দন মন্থর বটে, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই সচল আছে। সুবীর সযত্নে অরুণার গায়ের উপর চাদর টানিয়া দিল, অপলক চক্ষে তাহার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মাথার শিয়রে নিঃশেষিত মোমবাতিটা নিব-নিব হইয়া আসিয়াছিল, নির্বাপিত হইবার পূর্বে দপ্‌দপ্ করিয়া উঠিল। সুবীর তখন সন্তর্পণে অরুণার পাশে শয়ন করিল।

পরদিন সকাল হইতে তাহার প্রকৃত প্রবাস-জীবন আরম্ভ হইল। নির্জন প্রবাসে জীবনযাত্রার সুবিধা অসুবিধা দুই-ই আছে। পরিচিত মানুষের অভাব কখনও সুবিধা কখনও অসুবিধা বলিয়া মনে হয়। কাজকর্ম নাই, খবরের কাগজ নাই, এরূপ অবস্থা কাহারও পক্ষে সুখকর, কাহারও পক্ষে অসুখকর। কিন্তু যেখানে দু'টি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রণয়ের বন্ধন আছে সেখানে প্রবাসের নির্জনতা মধুময় হইয়া ওঠে।

সুবীরের মন এই নিবিড় রসানুভূতির জন্য উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু অরুণার দিক হইতে তাহার প্রতিফলন আসিল না। বরং মনে হইল অরুণা সুবীরকে এড়াইয়া চলিতেছে। একসঙ্গে ওঠাবসা করিয়াও দু'জন মানুষ মনে মনে পরস্পরকে এড়াইয়া চলিতে পারে। অরুণা স্বভাবত সরল ও সিধা প্রকৃতির মেয়ে; কিন্তু এখন দেখা গেল অরুণার চোখে গোপনতার কটাক্ষ, সে যেন সুবীরের নিকট হইতে নিজের মানসিক অবস্থা প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহার মনের মধ্যে এমন কিছু ঘটিতেছে যাহা সে সুবীরকে জানিতে দিতে চায় না।

রুক্‌মিণী প্রথম দর্শনেই অরুণাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, সে নিজের কাজ হইতে ছুটি পাইলেই উপরে আসিয়া অরুণার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। অযাচিত ভাবে তাহার সেবা করে, চুলে তেল মাখাইয়া চিরুনি দিয়া আঁচড়াইয়া চুল বাঁধিয়া দেয়, আর অনর্গল গল্প করে। অরুণাও তাহার সঙ্গে বেশ স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে। মেয়েদের ঐ একটি গুণ আছে, তাহারা উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সকল জাতের মেয়ের সঙ্গে মিশিতে পারে। পুরুষের সে গুণ নাই, থাকিলে সুবীরের ভারি সুবিধা হইত, গিরধর সিং-এর সঙ্গে গল্প জমাইয়া সময় কাটাইতে পারিত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে যেন একটু নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে যে-কয়টা বই আনিয়াছে তাহা মাঝে মাঝে খুলিয়া বসে। কিন্তু বই-এ মন বসে না। তখন সে উঠিয়া প্রাসাদের দ্বিতলে অগণিত কক্ষগুলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘরগুলি পরিষ্কৃত নয়; কোথাও দেওয়াল হইতে পাথর খসিয়া পড়িয়াছে, কোথাও ছাদের কোণে চামচিকা বাসা বাঁধিয়াছে। সব মিলিয়া পরিত্যক্ত লোকালয়ের প্রাণহীন কঙ্কালসার শুষ্কতা।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর সুবীর ত্রিতলের খোলা ছাদে একাকী পরিক্রমণ করিতেছিল। আলিসার কিনারে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নানা অসংলগ্ন চিন্তার মধ্যে ভূত-প্রেতের চিন্তাও তাহার মনে আসিতেছিল। বিরাজবাবু বৈজ্ঞানিক হইলেও অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করেন। এ বাড়িটাতে বাজনার শব্দ শোনা যায়, ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়; হয়তো কিছু আছে। হানা-বাড়ির কত গল্পই তো শোনা যায়, সবই কি মিথ্যা? এই বাড়িটা দু'হাজার বছর ধরিয়া মরুভূমির মাঝখানে পড়িয়া আছে; হয়তো জীবিত অবস্থায় যাহারা এখানে বাস করিত তাহাদেরই কেহ বাড়ির মায়া ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে নাই, দু'হাজার বছর ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। কিসের প্রতিক্ষা করিতেছে কে জানে। এই রাজস্থানেই নাকি কোথায় একটা রাজপ্রাসাদ আছে, সেখানে রাত্রিকালে প্রেতাত্মা 'ম্যায় ভুখা হুঁ' বলিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।—

আজও আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। ঠাণ্ডা বাতাসে সুবীরের গা শীত-শীত করিয়া উঠিল। সে ঘরে ফিরিয়া গেল।

বসিবার ঘরে কেহ নাই, কিন্তু শয়নকক্ষ হইতে রুক্‌মিণীর কলকণ্ঠ আসিতেছে। সুবীর শয়নকক্ষের পর্দা সরাইয়া দেখিল, সেখানে দুটি মানুষের মজলিশ্ বসিয়া গিয়াছে। মেজেয় পাটি পাতিয়া অরুণা ও রুক্‌মিণী

মুখোমুখি বসিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে একটি আগুনের ছোট আংটা; রুক্‌মিণী খোসাসুদ্ধ চীনাবাদাম আগুনে ঝল্‌সাইয়া খোসা ছাড়াইয়া অরুণাকে দিতেছে, অরুণা পরম সুখে নুন ও লঙ্কার গুঁড়া মাখাইয়া খাইতেছে।

সুবীরকে দ্বারের কাছে দেখিয়া রুক্‌মিণীর বাক্যস্রোত সংহত হইল, অরুণাও মুখ তুলিয়া চাহিল। সুবীর তাহাদের কাছে আসিয়া বসিল, হাসিমুখে বলিল— 'কি গল্প হচ্ছে? আমিও গল্প শুনতে এলাম।'

অরুণা একটু বিব্রত হইয়া বলিল— 'মেয়েলি গল্প কি তোমার ভাল লাগবে।'

সুবীর বলিল— 'ভাল না লাগে উঠে যাব। অন্তত চীনেবাদাম ভাজা তো ভাল লাগবে।' সে কয়েক দানা চীনাবাদাম মুখে দিয়া বলিল— 'আচ্ছা রুক্‌মিণী, তোমরা এ বাড়িতে ফুলের গন্ধ পেয়েছ?'

সুবীরের আগমনে রুক্‌মিণী একটু আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, এখন আবার স্বচ্ছন্দ হইয়া বলিল— 'জি মালিক, পেয়েছি। তাছাড়া গভীর রাত্রে বাঁশির আওয়াজ শোনা যায়, সিতারের আওয়াজ শোনা যায়।'

'কোন্ ফুলের গন্ধ পেয়েছ— আতর গুলাব ধূপ-ধূনার গন্ধ নয়?'

'জি না, তাজা ফুলের গন্ধ। জাই জুঁহি চম্পা— এই সব।'

'কেয়া ফুলের গন্ধ কখনো পেয়েছ?'

অরুণা সুবীরের প্রতি একবার চকিত ভ্রূক্ষেপ করিল। রুক্‌মিণী উৎসুক স্বরে বলিল— 'কেওড়া ফুলের গন্ধ! না বাবুজি, কেওড়া ফুলের গন্ধ কেমন হয় আমি জানি না, কেওড়া ফুল কখনো দেখিনি। তবে কেওড়া ফুলের গল্প জানি।'

'কেওড়া ফুলের গল্প!'

'হ্যাঁ বাবুজি, ভারি চমৎকার গল্প। আমি আমার দাদি'র কাছে শুনেছিলাম আমার দাদি আবার তার দাদি'র কাছে শুনেছিল। বহুকাল ধরে এ-গল্প চলে আসছে। এই মহল নিয়েই গল্প।'

'তাই নাকি! কী গল্প বল তো শুনি।'

তখন রুক্‌মিণী চীনাবাদাম পোড়াইতে পোড়াইতে গল্প আরম্ভ করিল—

'অনেক অনেক দিন আগে এখানে একটি রাজ্য ছিল। মরুভূমির কিনারায় রাজ্য; ছোট রাজ্য হলেও বড় সুখের রাজ্য। শত্রুর উৎপাত নেই, অন্নাভাব নেই, মারী-মহামারী নেই; প্রজারা অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে মনের আনন্দে বাস করে।

'রাজার নাম বিজয়কেতু। তরুণ রাজা, সম্প্রতি দক্ষিণ দেশের এক রাজকন্যাকে বিয়ে করেছেন। অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা; যেমন তার রূপ তেমনি মধুর স্বভাব। নাম অরুণাবতী।'

সুবীর চমকিয়া প্রশ্ন করিল, 'কি নাম বললে?'

রুক্‌মিণী বলিল— 'অরুণাবতী। এ গল্পের নাম রানী অরুণাবতীর গল্প।'

সুবীর ও অরুণা বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিল, তারপর অরুণা চক্ষু সরাইয়া লইল। সুবীর বলিল— 'আচ্ছা, তারপর বল—'

রুক্‌মিণী বলিতে লাগিল।—

রাজা আর রানীর মধ্যে গভীর ভালবাসা; কেউ কাউকে একদণ্ড না দেখে থাকতে পারেন না। রাজা যখন সভায় বসে মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজকার্য করেন, রানী তখন অলিন্দ থেকে উঁকি মেরে দেখে যান। রাজাও রাজকার্য করতে করতে হঠাৎ উঠে গিয়ে রানীকে দেখে আসেন। রাজা আর রানী যেন জোড়ের পায়রা।

রানীর মনে কিন্তু একটি দুঃখ আছে। তাঁর বাপের বাড়ির দেশে যেমন ঋতুতে ঋতুতে নতুন ফুল ফোটে — বসন্তে অশোক নবমল্লিকা জাতি যূথী, গ্রীষ্মে চম্পক বকুল পিয়াল, বর্ষায় গোকর্ণ কদম্ব কেতকী— এদেশে তেমন ফুল ফোটে না।

একদিন সায়াহ্নে রাজা-রানী চন্দ্রশালিকার বিস্তীর্ণ ছাদে হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছিলেন, দেখলেন পশ্চিমের আকাশে মেঘ উঠেছে। দু'জনের মনে খুব আহ্লাদ হল। এদেশে বৃষ্টি কম, মেঘ বেশি আসে না। রানী

কাজল-কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'রাজা, অনেক দিন কেতকী ফুলের গন্ধ পাইনি। এদেশে কি কেয়া ফুল পাওয়া যায় না?'

বিজয়কেতু বলিলেন— 'না। পশ্চিমে লাট দেশ, সেখানে বনেজঙ্গলে কেয়া ফুল ফুটে থাকে, গ্রামের লোকেরা কেয়ার ঝাড় দিয়ে ঘরের বেড়া বাঁধে।'

অরুণাবতী কুতূহলী হয়ে বললেন— 'লাট দেশ! সে কত দূর?'

বিজয়কেতু বললেন— 'ঘোড়ার পিঠে দুই-তিন দিনের পথ।'

রানী অরুণাবতী তখন রাজার বকের ওপর দু'হাত রেখে পরম আগ্রহভরে বললেন— 'রাজা, লাট দেশ থেকে আমাকে কেয়া ফুল আনিয়ে দাও। কেয়া ফুলের জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।'

রাজা বিজয়কেতু বললেন— 'এ আর বেশি কথা কি! আমি নিজে গিয়ে তোমার জন্যে কেয়া ফুল তুলে নিয়ে আসব।'

অরুণাবতী একটু শঙ্কিত হলেন— 'তুমি নিজে যাবে?'

বিজয়কেতু বললেন— 'কাল সকালেই যাত্রা করব। তিন-চার দিনের মধ্যে তোমার কেয়া ফুল নিয়ে ফিরে আসব।'

রানী কিছুক্ষণ রাজার বুকের ওপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর হাসিমুখ তুলে বললেন— 'বেশ, তুমি যতদিন না ফিরে আসবে আমি ততদিন রোজ পাঁচ ফোঁটা মধু খাব, আর কিছু খাব না।'

রাজা বললেন— 'আর কিছু খাবে না কেন?'

রানী বললেন— 'তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।'

পরদিন ভোরবেলা রাজা ঘোড়ায় চড়ে পশ্চিমমুখে যাত্রা করলেন। রানী প্রাসাদের চূড়ায় উঠে যতক্ষণ দেখা যায় চেয়ে রইলেন।

তারপর একদিন গেল, দু'দিন গেল। রানী পাঁচ ফোঁটা মধু খেয়ে আছেন। তৃতীয় দিন থেকে রানী আবার ছাদের উপর যাতায়াত আরম্ভ করলেন। শরীর দুর্বল, কিন্তু মন মানে না। ছাদের কিনারায় গিয়ে পশ্চিমদিকে চেয়ে থাকেন। চতুর্থ দিনও ঐভাবে কাটল। রানীর শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখের কোলে কালি। ছয়দিন কেটে গেল রাজার কিন্তু দেখা নেই। কোথায় গেলেন রাজা! কী হল তাঁর?

রাজা বিজয়কেতু দ্বিতীয় দিন দুপুরবেলা লাট দেশে পৌঁছেছিলেন। সেখানে জঙ্গল থেকে কয়েকটি কেয়া ফুল তুলেছিলেন। তারপর একটি কেয়া ফুল বল্লমের ডগায় গেঁথে নিয়ে নিজ রাজ্যের দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়েছিলেন। ঘোড়া পবনবেগে ঘরের পানে ছুটেছিল।

রাজ্যের সীমানায় ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, এই গিরিসঙ্কট পার হয়ে নিজের রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। তৃতীয় দিন দুপুরবেলা রাজা গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে চলেছেন, এমন সময় একদল সশস্ত্র লোক আশপাশের পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে ঘিরে ধরল।

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন— 'একি! কে তোমরা?'

তারা বলল— 'আমরা যে হই, তুমি আমাদের বন্দী।'

রাজা ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে বললেন— 'কি, তোমাদের এত স্পর্ধা। জানো, আমি এ রাজ্যের রাজা?'

তারা জয়ধ্বনি করে বলল— 'তবে তো ভালই হয়েছে। চল আমাদের সেনাপতির কাছে।'

পাহাড়ের মধ্যে বিদেশী শত্রু ছাউনি ফেলেছে, প্রায় বিশ হাজার সৈন্য। সেনাপতি তখন নিদ্রা যাচ্ছিলেন। সৈন্যরা বলল— 'তুমি আজ বন্দী থাকো, কাল সেনাপতির সঙ্গে দেখা হবে।'

সৈন্যরা রাজা বিজয়কেতুর কথা বিশ্বাস করেনি, তারা ঠাট্টা তামাসা করতে করতে তাকে একটা শিবিরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখল। রাজা জানতেন, উত্তর থেকে দুর্ধর্ষ শক জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, কিন্তু তারা যে এতদূর অগ্রসর হয়েছে তা তিনি জানতে পারেননি।

পরদিন সেনাপতির সঙ্গে দেখা হল না, সেনাপতি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তার পরদিন দুপুরবেলা সৈন্যরা রাজাকে সেনাপতির কাছে নিয়ে গেল। সেনাপতির প্রকাণ্ড চেহারা, টক্‌টকে রঙ, বড় বড় চোখ। তিনি রাজাকে আপাদমস্তক দেখে বললেন— 'আপনি সত্যি এদেশের রাজা?'

বিজয়কেতু বললেন— 'হ্যাঁ, এই দেখুন আমার অঙ্গুরী, এই দেখুন কবচ।'

সেনাপতি বললেন— 'আপনি সত্যই রাজা। আমরা আপনার রাজ্য জয় করতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনাকে যখন ধরেছি তখন আর আমাদের যুদ্ধ করতে হবে না। বিনা যুদ্ধে রাজ্য জয় হয়েছে।'

রাজা বললেন— 'আমার রাজ্য ক্ষুদ্র, সৈন্যবল সামান্য। এ-রাজ্য জয়ে আপনার গৌরব নেই। তবে কেন এ-রাজ্য জয় করতে চান?'

সেনাপতি বললেন— 'রাজস্থান বীরভূমি। মাটির গুণে মানুষ বীর হয়, মাটির দোষে কাপুরুষ হয়। তাই আমি রাজস্থান জয় করে নিজের রাজ্য স্থাপন করতে চাই।'

'কিন্তু আমাকে বন্দী করে লাভ কী? আপনি যদি আমার রাজ্য আক্রমণ করেন রাজ্যের লোক স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে।'

'না। তারা যখন জানতে পারবে আপনি আমার হাতে বন্দী, তখন আর যুদ্ধ করবে না, আত্মসমর্পণ করবে।'

রাজা চিন্তা করে বললেন— 'সেনাপতি, আমাকে একবার আমার প্রাসাদে ফিরে যেতেই হবে। আপনি আমাকে দু'দিনের জন্য মুক্তি দিন, আমি আবার ফিরে এসে স্বেচ্ছায় ধরা দেব।'

সেনাপতি কিছুক্ষণ রাজার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন— 'আপনি যে ফিরে আসবেন তার নিশ্চয়তা কি?'

রাজা সগর্বে বললেন— 'আমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় কখনো শপথ ভঙ্গ করে না।'

সেনাপতি প্রশ্ন করলেন— 'কিন্তু প্রাসাদে আপনার এত কী প্রয়োজন?'

রাজা বললেন— 'আমার পত্নী কেবল কয়েকবিন্দু মধু খেয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন, তাঁকে দেখা দিয়েই আমি ফিরে আসব।' রাজা কেতকী ফুল আহরণের কাহিনী সেনাপতিকে বললেন।

শুনে সেনাপতি প্রীত হলেন, বললেন— 'ভাল। আমি আপনাকে মুক্তি দেব। কিন্তু আজ তো দিন শেষ হয়ে এল। আজ যদি যাত্রা করেন, দিন থাকতে প্রাসাদে পৌঁছুতে পারবেন না। তার চেয়ে কাল সকালে আপনি যাত্রা করবেন। শর্ত রইল পত্নীর সঙ্গে দেখা করেই আপনি ফিরে আসবেন।'

পরদিন প্রত্যুষে রাজা শূলশীর্ষে কেতকী ফুল গেঁথে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করলেন।

ওদিকে রানীর অবস্থা তখন শোচনীয়। দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়ে শরীর এত দুর্বল হয়েছে যে শয্যা ছেড়ে উঠতে কষ্ট হয়, মনের অবস্থা পাগলের মতো। এমন সময় বেলা তিন প্রহরে দাসীরা ছুটে এসে খবর দিল— রাজা আসছেন!

রানী পালঙ্ক থেকে নেমে ছাদের পানে ছুটলেন। দাসীরা মানা করল, তিনি শুনলেন না। ছাদের কিনারায় গিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালেন। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না, তবু মনে হল, অনেক দূরে মাঠের পরপার থেকে একজন অশ্বারোহী ছুটে আসছে।

কিছুক্ষণ পরে অশ্বারোহী আরও কাছে এলে রানী চিনতে পারলেন, রাজা আসছেন; তাঁর ভল্লের মাথায় একটি কেয়া ফুল উঁচু হয়ে আছে। রাজাও রানীকে প্রাসাদ-শীর্ষে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি বল্লমসুদ্ধ হাত তুললেন।

রানী আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। দু'হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। দাসীরা চিৎকার করে উঠল, কিন্তু রানীকে ধরতে পারল না; তিনি আলিসা পেরিয়ে একেবারে নীচে পড়ে গেলেন।

রাজা এসে দেখলেন রানী অরুণাবতীর মৃতদেহ প্রাসাদমূলে পড়ে আছে। তিনি দু'হাতে মৃতদেহ বুকে

তুলে নিলেন।

তারপর রানীকে চিতায় তুলে দিয়ে রাজা কেয়া ফুল দিয়ে চিতা সাজিয়ে দিলেন। চিতা জ্বলে উঠল। কেয়া ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরে গেল।

রাজা আর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন না, ঘোড়ায় চড়ে একলা শক সেনাপতির শিবিরে ফিরে গেলেন। সেনাপতিকে বললেন— 'আমি ফিরে এসেছি। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে আমার রাজ্য আপনি পাবেন না। আসুন, যুদ্ধ করুন।'

শক সেনাপতির সঙ্গে রাজা বিজয়কেতুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল। যুদ্ধে রাজা বিজয়কেতু মারা পড়লেন। তারপর শক জাতি এসে রাজ্য দখল করল, সেনাপতি রাজপুরী দখল করলেন। অনেক বছর কেটে গেল; মরুভূমি এসে রাজ্য গ্রাস করে নিল। দেশ জনশূন্য হল। প্রাসাদ শূন্য পড়ে রইল।

এই ভাবে কত শতাব্দী কেটে গেছে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু এখনো প্রাসাদের বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়ায়, হঠাৎ নিশুতি রাত্রে বীণার ঝঙ্কার শোনা যায়। যারা শুনেছে তারা বলে, রাজার আর পুনর্জন্ম হয়নি, তাঁর আত্মা এই প্রাসাদেই আছে। রানীর জন্ম হয়েছে, তিনি ষাট-সত্তর বছর অন্তর দেহ ত্যাগ করে আসেন, রাজার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। তারপর আবার তিনি চলে যান, রাজা প্রতীক্ষা করে থাকেন।

এই হচ্ছে রাজা বিজয়কেতু আর রানী অরুণাবতীর গল্প।—

গল্প শেষ করিয়া রুক্মিণী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তাহার এখনো অর্ধেক রান্না বাকি।

সুবীর দেখিল, অরুণা আচ্ছন্ন অভিভূতের মতো বসিয়া আছে। তারপরই অরুণা চমকিয়া সুবীরের পানে চোখ তুলিল, মুখে ছদ্ম হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল— 'আষাঢ়ে গল্প— না?'

সুবীর বলিল— 'একেবারে আষাঢ়ে গল্প নাও হতে পারে। মূলে হয়তো একটু সত্যি আছে।'

অরুণা আর কিছু বলিল না। তাহার মুখের উপর রহস্যের পর্দা নামিয়া আসিল। তাহার মনের মধ্যে কী হইতেছে সুবীর তাহা নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে না পারিলেও তাহার মনও অশান্ত হইয়া উঠিল। এ কোন্ অদৃশ্য কুহক জালে তাহারা জড়াইয়া পড়িতেছে! যে সন্দেহটা সুবীর জোর করিয়া মন হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল তাহা এই: অরুণা কি নিজেকে জন্মান্তরের রানী অরুণাবতী মনে করিতেছে এবং মনে মনে বিদেহাত্মা রাজা বিজয়কেতুর উদ্দেশ্যে অভিসারযাত্রার জন্য উৎসুক হইয়াছে? অসুস্থ শরীরে মনও অসুস্থ হয়। ইহা কি সেই অসুস্থতার লক্ষণ?

কিন্তু যাহাই হোক, গল্পের রানী অরুণাবতী নাম আশ্চর্য রকমের সমাপতন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে রাত্রে অরুণা 'ক্ষিদে নেই' বলিয়া শয়ন করিতে চলিয়া গেল। সুবীর যথাসময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়নকক্ষে গিয়া দেখিল অরুণা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুবীর তাহাকে জাগাইল না, অস্বচ্ছন্দ মন লইয়া কিছুক্ষণ খাটের চারিপাশে পায়চারি করিল, তারপর শয়ন করিল।

গভীর রাত্রে সুবীরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দূর হইতে যেন বীণাযন্ত্রের অস্ফুট মূর্ছনা আসিতেছে। সুবীরের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল। ঘরে আলো নাই, মোমবাতি নিভিয়া গিয়াছে।

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া সুবীর পাশের দিকে অনুভব করিল, অরুণা শয্যায় নাই।

বালিশের পাশে সুবীর একটা বিদ্যুতিক টর্চ রাখে, সেটা জ্বালিয়া দেখিল শয্যা শূন্য। ঘরের চারিপাশে আলো ফেলিয়া দেখিল, ঘরেও অরুণা নাই। দূরাগত বীণাধ্বনি দূরে মিলাইয়া গেল।

সুবীর স্নায়ুপেশী শক্ত করিয়া কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিল, কিন্তু অরুণা আসিল না। তখন সে উঠিয়া গায়ে চাদর জড়াইয়া লইল, টর্চ জ্বালিতে জ্বালিতে অন্য ঘর দু'টা দেখিল। সেখানেও অরুণা নাই।

দৃঢ়ভাবে নিজেকে সংযত করিয়া সুবীর ঘরের বাহিরে ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। পশ্চিম আকাশে প্রায় পূর্ণাঙ্গ চাঁদ ঢলিয়া পড়িয়াছে, আকাশ এবং মরুভূমিতে চাঁদের কিরণ যেন উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বরফের কাঁটার মতো সুবীরের গায়ে বিঁধিল।

বিশাল ছাদ চন্দ্রকুহেলিতে ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে; সুবীর চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল, কিন্তু অরুণাকে দেখিতে

পাইল না। কিছুক্ষণ সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোথায় গেল অরুণা? এই নির্জন পুরীতে গভীর রাত্রে একাকিনী কোথায় গেল? তবে কি নীচে গিয়াছে! কেন? তাহাকে না জাগাইয়া একাকিনী নীচের তলায় যাইবে কেন?... নিশির ডাক? ...না, না, এ সব কী অবিশ্বাস্য কথা সে ভাবিতেছে! আজ সন্ধ্যাবেলা যে গল্প তাহারা শুনিয়াছে, এ সব তাহারই অনুরণন। অরুণা নিশ্চয় কাছেই কোথাও আছে—

সে গলা চড়াইয়া ডাকিল— 'অরুণা!'

সাড়া নাই। কেবল ঠাণ্ডা বাতাস তাহার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

এতক্ষণ সুবীর নিজের মনকে দৃঢ় শাসনে রাখিয়াছিল। এইবার তাহার সংযমের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সে ছুটিয়া আলিসার কাছে গিয়া নীচে দৃষ্টিপাত করিল, তারপর নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সারা ছাদ পরিক্রমণ করিল। না, অরুণা ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া যায় নাই। তবে সে কোথায়?

সুবীর ক্ষণকাল মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আবার শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল। শয়নকক্ষটা ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, হয়তো অরুণা ঘুমের ঘোরে খাটের পাশে পড়িয়া গিয়াছে!

অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে কেয়া ফুলের গন্ধ ভর্‌ভর্ করিতেছে। স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া সুবীর ভাবিল— কেয়া ফুলের গন্ধ তবে মিথ্যা নয়, রোগ-বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা নয়। অতিপ্রাকৃত যতদূর প্রাকৃত হইতে পারে কেয়া ফুলের গন্ধ তাই। বীণাধ্বনিও তাই। এক সূক্ষ্ম জগতের অলৌকিক পরিবেশের মধ্যে তাহারা বাস করিতেছে।

সুবীর টর্চ জ্বালিল। বিছানার এক পাশে অরুণা শুইয়া আছে। তাহার বেশবাস বিস্রস্ত, চুল এলোমেলো; সে গভীর ক্লান্তির ঘুম ঘুমাইতেছে। সুবীরের সংশয় জাগিল, তবে কি অরুণা সারাক্ষণ বিছানায় শুইয়া ছিল! কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব!

একটা মোমবাতি জ্বালিয়া সুবীর শয্যাশিয়রে রাখিল, তারপর শয্যায় উঠিয়া অরুণার পাশে বসিল। তাহার নিদ্রাশিথিল মুখের পানে চাহিয়া সুবীরের হৃদয়ে একটি বাষ্পীভূত স্নেহের উচ্ছ্বাস কণ্ঠ পর্যন্ত উদ্‌গত হইয়া উঠিল। সে দুই বাহু দিয়া নিবিড়ভাবে তাহাকে জড়াইয়া লইয়া রুদ্ধস্বরে ডাকিল— 'অরুণা! অরুণা!'

অরুণার কিন্তু ঘুম ভাঙিল না, তাহার শ্লথ অঙ্গে কোনো প্রতিক্রিয়া নাই। ক্লান্ত শিশুর মতো সে ঘুমাইয়া রহিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া সুবীর তাহাকে ছাড়িয়া দিল, তারপর আলো নিভাইয়া তাহার গায়ে হাত রাখিয়া শয়ন করিল। সে লক্ষ্য করিল, কেতকীর গন্ধ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বিলীন হইয়া গেল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিলে সুবীর অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিল— 'কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?'

অরুণার চোখে সদ্য ঘুম ভাঙার জড়িমা; সে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল— 'কোথায় গিয়েছিলুম! যাইনি তো কোথাও।'

সুবীর বলিল— 'গিয়েছিলে। দুপুর রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি তুমি বিছানায় নেই।'

অন্তর্লীন কণ্ঠে অরুণা বলিল— 'কি জানি— মনে পড়ে না—' সুবীর দেখিল অরুণার স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেছে। সে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

অরুণা নত নেত্র তুলিয়া সুবীরের পানে চাহিল; চোখে শঙ্কা ও গোপন উত্তেজনা। সে জড়ানো গলায় বলিল— 'ঘুমের ঘোরে কি করেছি মনে পড়ছে না।' তাহার মুখের উপর অদৃশ্য মুখোশের আবরণ পড়িয়া গেল।

বাহিরের ঘর হইতে চায়ের সরঞ্জামের ঠুং ঠাং শব্দ আসিল, গিরধর প্রাতঃকালীন চা আনিয়াছে। সুবীর উঠিয়া পড়িল। তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে কাল রাত্রির কথা অরুণার মনে পড়িয়াছে, কিন্তু সে তাহা সুবীরের কাছে গোপন করিতে চায়। কী কথা গোপন করিতে চায়? স্বপ্নাভিসার?

দিনটা অবসন্ন আলস্যে কাটিয়া গেল। দু'জনেই শামুকের মতো নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইয়াছে। সুবীর এইরূপ বিচিত্র পরিস্থিতিতে কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। অরুণা একটা অন্তর্গূঢ় মাদকতায়

নিমজ্জিত হইয়া আছে। তাহারা যেন দুটি সচল যন্ত্র, পরস্পরের সহিত কোনো সচেতন সংযোগ নাই, নিতান্ত আকস্মিকভাবেই একত্র বিন্যস্ত হইয়াছে।

সূর্যাস্তের পর রুক্‌মিণী ছাদের উপর পাটি পাতিয়া অরুণার চুল বাঁধিতে বসিল। চুল বাঁধার সঙ্গে মৃদুস্বরে জল্পনা চলিতেছে। সুবীর দূর হইতে দেখিল অরুণার মুখ উৎসুক ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; তন্দ্রাচ্ছন্ন মাদকবিমূঢ় ভাব আর নাই। সে একটু আশ্বস্ত হইয়া নীচে নামিয়া গেল। সায়ন্তন জ্যোৎস্নার ম্লান বিজনতায় বালুর উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

জামাইবাবু আজ যদি আসেন ভাল হয়... এ স্থানটা বিজনবাসের পক্ষে খুবই চমৎকার, কিন্তু... প্রাসাদে কোনও বুভুক্ষু আত্মা অদৃশ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে... কেয়া ফুলের গন্ধ, বাজনার আওয়াজ, এসব মিথ্যা নয়... অরুণার মানসিক অবস্থা এখানে আসার পর আরও অবোধ্য রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে... তাহার মনের মধ্যে কী হইতেছে তাহা যদি দেখা যাইত... জামাইবাবু আসিয়া পড়িলে ভাল হয়।...

ঘণ্টাখানেক পরে সুবীর বালির বাঁধ বাহিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিল। বসিবার ঘরে চার-পাঁচটা মোমবাতি জ্বলিতেছে; অরুণা একটি আয়না হাতে লইয়া নিজের মুখ দেখিতেছে। সুবীর চমৎকৃত হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল। অরুণার চুলে নূতন ধরনের কবরীবন্ধ, মুখে অলকা-তিলক, সীমন্তে একগুচ্ছ মুক্তার ঝুম্‌কা; তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে একটি অজন্তার ছবি। রুক্‌মিণী তাহাকে সেকালের ভঙ্গিতে সাজাইয়া দিয়াছে।

সুবীর কিছুক্ষণ মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল— 'বাঃ! কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে!'

অরুণা সুবীরকে দেখিতে পায় নাই, ধরা পড়িয়া গিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল, তারপর ছুটিয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

অরুণার লজ্জা যেন অস্বাভাবিক। সুবীর ক্ষণকাল অবাক থাকিয়া শয়নকক্ষে অরুণাকে অনুসরণ করিল। দেখিল, অরুণা শয্যায় বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আছে। খাটের পাশে দাঁড়াইয়া সুবীর হাল্কা সুরে বলিল— 'এতে লজ্জার কী আছে? ওঠো, আর একবার ভাল করে দেখি।'

অরুণা কিন্তু মুখ তুলিল না। কিছুক্ষণ সাধ্যসাধনা করিয়া সুবীর বসিবার ঘরে ফিরিয়া গেল, চেয়ারে বসিয়া চোখের সামনে একটা বই খুলিয়া ধরিল। জীবনটা হঠাৎ অত্যন্ত শুষ্ক এবং জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

রাত্রির আহারের পর অরুণা একটা বই লইয়া পড়িতে বসিল। তাহার নূতন সাজসজ্জার লজ্জা কাটিয়া গিয়াছে।

সুবীর বলিল— 'শুতে যাবে না?'

অরুণা বলিল— 'না, দুপুরবেলা ঘুমিয়েছি, এখন শুলে ঘুম আসবে না।'

তিক্ত মনে সুবীর একাকী শয়ন করিতে চলিয়া গেল।—

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সুবীরের ঘুম ভাঙিল। এবার বীণাধ্বনি নয়, কেয়া ফুলের হিমগদ্‌গদ্‌ গন্ধ। সুবীরের ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিয়াছে।

শয্যায় অরুণা নাই; সে যে শয়ন করিয়াছিল তাহার চিহ্নও শয্যায় নাই। টর্চ হাতে লইয়া সুবীর খাট হইতে নামিল। পাশের ঘরও নিষ্প্রদীপ, সেখানে অরুণা নাই। সুবীর ছাদে গেল।

আজও চাঁদ অস্ত যাইতেছে, পশ্চিম আকাশে আলোর বন্যা। কিন্তু অরুণা এখানে নাই। ছাদে কেয়া ফুলের গন্ধও কম।

সুবীর ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইল। এখন কেয়ার গন্ধ বেশি, মনে হয় নীচের তলা হইতে গন্ধটা আসিতেছে। সুবীর ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিল।

যে ঘরটিতে প্রত্নবস্তু রাখা ছিল সেই ঘর হইতে গন্ধ আসিতেছে। সুবীর টর্চ জ্বালিল না, দ্বারের সম্মুখে কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল। প্রকাণ্ড ঘর অন্ধকার, কেবল দূরে ঘরের অন্য প্রান্তে মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের আলোয় ঘরের ইতস্তত-বিন্যস্ত টেবিল প্রভৃতি আসবাবগুলি অস্পষ্টভাবে অনুভব

করা যায়।

সুবীর নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, সন্তর্পণে টেবিলগুলি বাঁচাইয়া ঐ আলোকবিন্দুর দিকে অগ্রসর হইল।

অর্ধপথে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। মৃদু বিগলিত হাসির শব্দ! যেন দুইটি প্রণয়ী বাসরশয্যায় শুইয়া চুপিচুপি কথা বলিতেছে, গভীর রসালুতার গদ্‌গদ্ হাসি হাসিতেছে। দীপের ক্ষীণ আলোকে কিন্তু মানুষ দেখা যাইতেছে না।

সুবীরের মস্তিষ্কের ক্রিয়া বোধকরি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, একটা অন্ধ আবেগ তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিল। সে আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দপ্ করিয়া টর্চ জ্বালিল।

দেয়াল ঘেঁষিয়া পাটি পাতা, তাহার উপর অরুণা একাকিনী শুইয়া আছে। টর্চের তীব্র আলোয় তাহার অঙ্গের অলঙ্কারগুলি ঝলমল করিয়া উঠিল। সে তড়িদ্বেগে উঠিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল।

'অরুণা!'

ব্যাধের সাড়া পাইয়া ত্রস্ত হরিণী যেমন পলায়ন করে, অরুণাও তেমনি ছুটিয়া পালাইল। সুবীর ক্ষণকাল হতবুদ্ধির মতো দাঁড়াইয়া রহিল, ঘরের এদিকে ওদিকে টর্চের আলো ফেলিল। কেহ কোথাও নাই। কেবল পাটির শিয়রে পীতাভ দীপশিখা জ্বলিতেছে। সুবীর দৈহিক এবং মানসিক জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত উপরে ফিরিয়া গেল।

শয়নঘরে অরুণা খাটের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল। সুবীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

—'অরুণা!'

অরুণা উঠিয়া বসিল, গলদশ্রু চক্ষে চাহিয়া বলিল— 'কেন তুমি আমাকে নির্যাতন করছ?'

স্তম্ভিত হইয়া সুবীর বলিল— 'আমি তোমাকে নির্যাতন করছি!'

অরুণা মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিল— 'আমাকে ছেড়ে দাও। মুক্তি দাও।'

সুবীর খাটের পাশে বসিল, অরুণার হাত ধরিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল— 'অরুণা, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই, এই অভিশপ্ত বাড়ি ছেড়ে দেশে ফিরে যাই।'

অরুণা সত্রাসে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল— 'অ্যাঁ! না না না—'

সুবীর বলিল— 'এখানে তোমার মনের রোগ সারবে না। আমি তোমাকে আর এখানে থাকতে দেব না। জামাইবাবু আসুন, কালই আমরা চলে যাব।'

'না না না— আমি যাব না—'

'হ্যাঁ যাবে। তোমাকে আমি জোর করে নিয়ে যাব। এ বাড়িতে আর নয়।'

'না না না—' অরুণা ধড়মড় করিয়া খাট হইতে নামিয়া পড়িল, তারপর তীরবেগে ছাদের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

'অরুণা, অরুণা—' ডাকিতে ডাকিতে সুবীর তাহার পিছনে ছুটিল।

চাঁদ অস্ত যাইতেছে, আকাশে বাঁধভাঙা জ্যোৎস্নার প্লাবন। সুবীর দেখিল অরুণা ছুটিতে ছুটিতে ছাদের পশ্চিম কিনারার দিকে যাইতেছে। সেও উচ্চকণ্ঠে অরুণার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিল।

ছাদের আলিসার কাছে আসিয়া অরুণা একবার পিছন দিকে চাহিল। দেখিল, সুবীর ছুটিয়া আসিতেছে। অনৈসর্গিক চিৎকার করিয়া অরুণা ছাদ হইতে নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সুবীর আলিসার উপর ঝুঁকিয়া দেখিল, জ্যোৎস্নালোকে অরুণা বিশ হাত নীচে বালুর উপর পড়িয়া আছে। সুবীর দীর্ঘ শিহরিত নিশ্বাস টানিয়া অন্ধের মতো সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আল্‌গা নরম বালুর উপর অরুণার দেহ বিস্রস্তভাবে লুণ্ঠিত রহিয়াছে। সুবীর দেখিল, তাহার জ্ঞান নাই কিন্তু প্রাণ আছে। আল্‌গা বালুর উপর পড়িয়াছিল বলিয়া দেহে আঘাত লাগে নাই। তখন সুবীর নিজের

অজ্ঞাতসারে ‘অরুণা, অরুণা’ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহাকে দুই বাহু দিয়া তুলিয়া লইল, অসীম কষ্টে বালুর বাঁধ পার হইয়া উপরে আসিল; অরুণার বালু-ধূসর দেহ বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

সকাল হইতে এখনও দুই-তিন ঘণ্টা বাকি। সুবীর ভিজা তোয়ালে দিয়া অরুণার মুখ ও দেহ মুছাইয়া দিল। অরুণার কিন্তু জ্ঞান হইল না।

নিঝুম রাত্রি! ঝি-চাকরদের জাগাইবার কথা সুবীরের মনে আসে নাই। সে অরুণার পাশে বসিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রাত কাটাইয়া দিল।

সকাল সাড়ে সাতটার সময় জীপে চড়িয়া বিরাজবাবু আসিলেন। সুবীরের মুখে সমাচার শুনিয়া তিনি বলিলেন— ‘এখনি হাসপাতালে নিয়ে চল।’

রেল স্টেশনের কাছে হাসপাতাল। অরুণাকে জীপে তুলিয়া সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। প্রবীণ ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ‘শরীরে কোনও আঘাত নাই, কেবল কংকাশন হইয়াছে, শীঘ্রই জ্ঞান হইবে।’

অপরাহ্নে তিনটার সময় অরুণার জ্ঞান হইল। ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া সে কিছুক্ষণ শূন্যপানে চাহিয়া রহিল, তারপর তাহার চোখের কোণ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সুবীর পাশে বসিয়া ছিল, সে অরুণার মুখের উপর ঝুঁকিয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল— ‘অরুণা!’

অরুণার ঠোঁট দু’টি একটু নড়িল— ‘আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।’

‘বাড়ি!’

‘হ্যাঁ। কলকাতায় আমাদের নিজের বাড়িতে ফিরে যাব।’

বিহ্বল উল্লাস দমন করিয়া সুবীর বলিল— ‘আজই আমরা কলকাতায় ফিরে যাব।’

মেল ট্রেন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। সর্বাঙ্গ প্রকম্পিত করিয়া হু হু শব্দে ছুটিয়াছে। এখানে মরুভূমি নাই, যতদূর দৃষ্টি যায় হিমচর্চিত শ্যামলতা।

কূপে কামরার মধ্যে সুবীর অরুণার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইল, আস্তে আস্তে বলিল— ‘অরুণা, মরুভূমির মাঝখানে সেই পাথরের বাড়িটার কথা তোমার মনে আছে?’

অরুণা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল— ‘ও কথা আর কোনও দিন আমাকে মনে করিয়ে দিও না। আমি ভুলে যেতে চাই।’

সুবীর তাহার মুখখানা গাঢ়ভাবে নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল— ‘আমি তোমাকে ভুলিয়ে দেব। তুমিও একটা কথা মনে রেখো, ইহজন্মে তুমি আমার।’

১৮ পৌষ ১৩৬৮

ছোটকর্তা

আভার বিবাহের সময় বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে কি একটা মতান্তর হইয়াছিল। কিন্তু দুই পক্ষই ভদ্রলোক, তাই মতান্তর ঝগড়ায় পরিণত হয় নাই। বরপক্ষ আভাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তারপর পনেরো বছর আভা আর পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে নাই। দুই পরিবারের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছিল।

এই পনেরো বছরে দুই পরিবারেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। কর্তারা গত হইয়াছেন, যুবকেরা বাড়ির কর্তা হইয়াছে। যাহারা ছোট ছিল তাহারা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছে। আভার বিবাহের সময় কি লইয়া মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল তাহাও বোধ করি কাহারও মনে নাই। তবু দুই পক্ষের মাঝখানে দূরত্বটা যেন মনোযোগের অভাবেই পূর্ববৎ রহিয়া গিয়াছিল।

আভার ছোট ভাই দেবু আভার চেয়ে সাত-আট বছরের ছোট। তাহার বয়স এখন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর; সে ফৌজী দলের লেফটেনেন্ট, উপস্থিত পুণায় আছে। হঠাৎ কর্মোপলক্ষে তাহাকে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসিতে হইল। এবং আসিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল, দিদির শ্বশুরবাড়ি কলিকাতায়।

দেবু জীবনটা যদিও পশ্চিমাঞ্চলেই কাটাইয়াছে, তবু কলিকাতা তাহার অপরিচিত নয়। ছেলেবেলায় কয়েকবার আসিয়াছে। কিন্তু তখন সে স্বাধীন ছিল না, এখন স্বাধীন। দিদিকে দেখিবার জন্য তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিল।

দিদির শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা তাহার জানা ছিল, শোভাবাজারের নামজাদা গোষ্ঠী। সে হোটেলে জিনিসপত্র রাখিয়া বিকালবেলা বাহির হইল। অবশ্য দিদির শ্বশুরবাড়িতে সে সমাদর পাইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু না-ই বা পাইল সমাদর। সে একবার দিদিকে দেখিয়াই চলিয়া আসিবে। দিদির বিবাহকালীন কচি মুখখানি তাহার মনে আঁকা আছে। দিদির চেহারা এখন কেমন হইয়াছে কে জানে। দেবুর চেহারা অনেক বদলাইয়া গিয়াছে, দিদি কখনই তাহাকে চিনিতে পারিবে না।

সাবেককালের দোতলা বাড়িটা বেশ বড়। কর্তারা দুই ভাই একান্নবর্তী ছিলেন। প্রায় দশ বছর আগে আভার শ্বশুর মারা গিয়াছিলেন, ছাপা দায়-জানানো পত্র দেবু দেখিয়াছিল। তারপর এ সংসারে কী ঘটিয়াছে সে জানে না। হয়তো একান্নবর্তীই আছে, ছোট কর্তা এখন বাড়ির কর্তা।

দেবু দ্বারের কড়া নাড়িল। ক্ষণকাল পরে দ্বার খুলিয়া দিল একটি মেয়ে, কিন্তু জঙ্গী পোশাক পরা অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে দ্বার খোলা রাখিয়াই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল। দেবু অপ্রতিভভাবে খোলা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

বাড়িতে যে অনেকগুলি লোক থাকে এইবার তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। দুই চারিটি বয়ঃপ্রাপ্ত লোক এবং অনেকগুলি কুচোকাচা দ্বারের কাছে আসিয়া পরম কৌতূহলের সহিত দেবুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেবুর মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কি বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিবে ভাবিয়া পাইল না।

‘তোরা সরে যা’ বলিয়া একটি গোলাকৃতি মহিলা দ্বারের কাছে উপস্থিত হইলেন, দেবুকে একমুহূর্ত ভাল করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘ওমা, দেবু এসেছিস! আয় আয়।’

তিনি দেবুর হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং দেবুর গণ্ডদেশে সশব্দে চুম্বন করিলেন। দেবু লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, বুঝিল এই গোলাকৃতি মহিলাই তাহার দিদি। পনেরো বছরে দিদির স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইয়াছে।

আভা তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, 'কত বড় হয়েছিস রে! তার ওপর আবার মিলিটারি পোশাক! কিন্তু আমার চোখে কি ধুলো দিতে পারিস! দেখেই চিনেছি।'

দেবুকে লইয়া বাড়িতে সমাদরের সমারোহ পড়িয়া গেল। বাড়িতে লোক অনেক; শাশুড়ি, খুড়শাশুড়ি, দেবর, ননদ; আভা সকলের কাছে লইয়া গিয়া দেবুর পরিচয় করাইয়া দিল। দেবু দেখিল, আভাই বাড়ির গৃহিণী। তাহার শাশুড়ি, খুড়শাশুড়ি ঠাকুরঘরে বসিয়া কেবল মালা জপ করেন।

ইতিমধ্যে আভার স্বামী পরিমলবাবু গৃহে ফিরিলেন। ইনি হাইকোর্টের উকিল। ভারি মজলিশী লোক, তিনি দেবুকে লইয়া মহানন্দে রঙ্গ রসিকতা শুরু করিয়া দিলেন। দেবু অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন লোকগুলোর সঙ্গে এতদিন বিচ্ছেদ ছিল কি জন্য?

গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আভা আসিয়া বলিল, 'দেবু, আজ তুই যেতে পাবি না। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া করে এখানেই শুয়ে থাকবি। কাল সকালে যেখানে ইচ্ছে যাস।'

দেবু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'কিন্তু তোমাদের অসুবিধে হবে—'

'কিছু অসুবিধে হবে না।' আভা স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'ওপরে ছোট্-ঠাকুরের ঘরে দেবুর শোবার ব্যবস্থা করি।'

পরিমলবাবু চকিত হইয়া বলিলেন, 'বেশ তো।' স্বামী-স্ত্রীর চোখে চোখে কি একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল দেবু ধরিতে পারিল না। সে বলিল, 'কিন্তু জামা-কাপড় যে কিছুই আনিনি।'

আভা বলিল, 'বাথরুমে জামা-কাপড় রেখেছি। তুই যা, তোর মিলিটারি পোশাক ছেড়ে নে।'

দেবু বাথরুমে চলিয়া গেল। মুখ হাত ধুইয়া সাদা জামা-কাপড় পরিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল, দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে চুপিচুপি কি কথা বলিতেছে। সে আসিতেই দিদি হাসিমুখে উঠিয়া চলিয়া গেল।

যে মেয়েটি দেবুকে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল সে বসিবার ঘরে আসিয়া চা-জলখাবার দিয়া গেল। মেয়েটির বয়স সতেরো কি আঠারো, রঙ ফর্সা, ভাসা-ভাসা হাসিভরা চোখ। পরিমলবাবু বলিলেন, 'আমার খুড়তুতো বোন রানী।'

গল্প করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল তখন পরিমলবাবু দেবুকে লইয়া রান্নাঘরে খাইতে বসিলেন। রানী লুচি বেলিয়া দিতেছে, আভা গরম গরম লুচি ভাজিয়া পাতে দিতে লাগিল। দেবু রানীর লুচি বেলা দেখিতে দেখিতে মনে মনে ভাবিল, বেশ মেয়েটা।

আহারের পর মুখ ধুইতে ধুইতে দেবু শুনিতে পাইল দিদি খাটো গলায় রানীকে বলিতেছে, 'ওপরে যা, ছোট্‌ঠাকুরকে বল আমার ভাই এসেছে, আজ রাত্তিরের জন্যে ঘরটা যেন ছেড়ে দেন।'

শুনিয়া দেবু বুঝিল, তাহার জন্য কোনও বৃদ্ধকে কক্ষচ্যুত করা হইতেছে, সে মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল, কিন্তু এখন আর আপত্তি করিয়া লাভ নাই।

রানী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং পরক্ষণেই নামিয়া আসিয়া আভার দিকে ঘাড় নাড়িল। আভা বলিল, 'দেবু, রাত হয়েছে, শুয়ে পড় গিয়ে। আমি বাপু মোটা মানুষ, সিঁড়ি ভাঙতে পারব না। রানী, তুই আর একবার ওপরে যা, দেবুকে ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয়। লক্ষ্মীটি।'

রানী তখন দেবুর দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া আবার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, দেবু তাহার অনুসরণ করিল। সিঁড়ি বেশি চওড়া নয়, অর্ধপথ উঠিয়া বিপরীত মুখে ঘুরিয়া গিয়াছে। দেবু অর্ধপথ উঠিয়া দেখিল একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক উপর হইতে নামিয়া আসিতেছেন। রানী সিঁড়ির মাঝখানের চত্বরে দাঁড়াইয়া পড়িল, দেবুও দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গায়ে বেগুনি রঙের বালাপোষ, পায়ে কটকি চটি। মাথার চুল সাদা। স্বল্পালোকে মুখ চোখ ভাল দেখা গেল না, তিনি দেবুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

রানী আবার উপরে উঠিতে লাগিল, দেবু তাহার অনুগামী হইল। দ্বিতলে উঠিয়া রানী কোনও কথা বলিল না, কেবল আঙুল দিয়া একটা খোলা দরজা দেখাইয়া দিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

ঘরে আলো জ্বলিতেছে। দেবু ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরটি পরিপাটিভাবে সাজানো। খাটের উপর ধব্‌ধবে বিছানা পাতা, বিছানার পদপ্রান্তে একটি রঙীন সুজনি পাট করা রহিয়াছে। দেয়ালে একটি বড় ফটোগ্রাফ টাঙানো, দেবু কাছে গিয়া দেখিল, যে-বৃদ্ধ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন তাহারই ফটো। শান্ত প্রসন্ন মুখ, চোখের দৃষ্টি জীবন্ত। দিদি যাঁহাকে ছোট্‌ঠাকুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল ইনি নিশ্চয় তিনিই।

কিন্তু ঘরের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। ঘরের বাতাস বদ্ধ, বাতাসে একটা মেটে-মেটে গন্ধ। অনেক দিন ঘর বন্ধ থাকিলে যেমন গন্ধ হয় সেইরূপ। দেবু জানালা খুলিয়া দিল, দ্বার ভেজাইয়া দিল, তারপর শয্যার পাশে বসিয়া সিগারেট ধরাইল। আজিকার নূতন অভিজ্ঞতাগুলি সে মনের মধ্যে গুছাইয়া লইতে চায়।

দিদি সুখে আছে, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। উঃ, কি মোটাই হইয়াছে! কিন্তু মুখের ছেলেমানুষী ভাব এখনও যায় নাই। পরিমলবাবুও চমৎকার লোক। আর রানী! বাংলা দেশের মেয়েগুলো তো বেশ ভাল! ইহারা সকলেই সহজ স্বাভাবিক মানুষ, বড় সুখের একটি একান্নবর্তী পরিবার। দেবু নিশ্বাস ফেলিল, আবার কতদিনে ইহাদের সঙ্গে দেখা হইবে কে জানে!

সিগারেট শেষ করিয়া দেবু আলো নিবাইল, সুজনি গায়ে টানিয়া লইয়া শয়ন করিল। খোলা জানালা দিয়া রাস্তার আলো চোরের মতো তির্যকভাবে হাত বাড়াইয়াছে, ঘর একেবারে অন্ধকার নয়। দেবু ঘুমাইয়া পড়িল।

ওদিকে আভা ও পরিমলবাবুও শয়ন করিয়াছিলেন। আভা উৎসুক কণ্ঠে বলিল, 'হলে কিন্তু বেশ হয়—না?'

পরিমলবাবু বলিলেন, 'দেবুকে নেড়েচেড়ে দেখলাম, ছেলেটা খুব ভাল।'

আভা গর্ব অনুভব করিয়া বলিল, 'আমার ভাই, ভাল ছেলে হবে না! এখন কাকা রাজী হলে হয়।'

পরিমলবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, অনেক সম্বন্ধই তো করলাম, কিন্তু কাকার পছন্দ হল না। এবার দেখা যাক।' বলিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

রাত্রি আন্দাজ তিনটের সময় দেবুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে অনুভব করিল ঘরের মধ্যে কেহ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া সে শয্যায় উঠিয়া বসিল; স্বল্পান্ধকারে মনে হইল কে যেন দরজা একটু ফাক করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দেবু উঠিল, আলো জ্বালিয়া দেখিল কেহ ঘরে নাই, তখন সে দ্বারে হুড়কা লাগাইয়া আবার আলো নিবাইয়া শয়ন করিল।

দ্বিতীয়বার দেবুর ঘুম ভাঙিল তখন চারটে বাজিয়া গিয়াছে, ভোর হইয়া আসিতেছে। সে চোখ মেলিয়া দেখিল, যে বৃদ্ধটিকে সে সিঁড়িতে দেখিয়াছিল তিনি শয্যার পাশে ঝুঁকিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দেবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

শয্যা হইতে নামিয়া দেবু সুইচ টিপিয়া আবার আলো জ্বালিল। ঘরে কেহ নাই, দরজার হুড়কা পূর্ববৎ লাগানো রহিয়াছে।

দেবুর হঠাৎ গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। সে হুড়কা খুলিয়া বাহিরে উঁকি মারিল। বাহিরেও কেহ নাই, বাড়ি সুপ্ত। তখন সে বৃদ্ধের ছবির দিকে তাকাইল। বৃদ্ধ প্রসন্ন অপলক চক্ষে তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন।

সিগারেট ধরাইয়া দেবু জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কী ব্যাপার! ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি! কিংবা তাহারই স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হইয়া অবাস্তব ভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছে?

জানালার পাশে একটা আরাম-কেদারা ছিল, দেবু সিগারেট ফেলিয়া দিয়া তাহাতে লম্বা হইল। আর ঘুমের চেষ্টা বৃথা, ফর্সা হইতে দেরি নাই।—

'হ্যাঁ রে, রাত্তিরে কি ঘুম হয়নি?'

দেবু চোখ মেলিয়া দেখিল, ঘরে সকালের আলো ঝল্‌মল্‌ করিতেছে; দিদি চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

চোখ মুছিয়া দেবু চায়ের পেয়ালা লইল, তাহাতে এক চুমুক দিয়া বলিল, 'দিদি, উনি কে?' বলিয়া দেয়ালে ফটোর দিকে আঙুল দেখাইল।

আভা থতমত খাইয়া বলিল, 'উনি? উনি আমার খুড়শ্বশুর ছিলেন, রানীর বাবা।'

দেবু বলিল, 'খুড়শ্বশুর ছিলেন— তার মানে?

আভা থপ্‌ করিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িল, বলিল, 'দু' বছর আগে উনি মারা গেছেন।'

দেবু বলিয়া উঠিল, 'সে কি। ওঁকে যে আমি কাল রাত্তিরে দেখেছি।'

'দেখেছিস!' আভা কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'মারা গেছেন বটে, কিন্তু উনি আছেন। এই ঘরটা ওঁর ছিল, এই ঘরেই আছেন। কোনো গণ্ডগোল নেই; বাড়িতে অতিথি এলে ওঁকে খবর দিলেই উনি ঘর ছেড়ে দেন। তা তুই ভয় পাসনি তো?'

দেবু বলিল, 'না, ভয় পাব কেন। কিন্তু সত্যি আছেন? মানে, সত্যি মারা গেছেন? আমি যে চোখে দেখলাম।'

আভা ধীরে ধীরে বলিল, 'আমরা সবাই চোখে দেখেছি, ইচ্ছে করলেই উনি দেখা দিতে পারেন। তবে কথা বলেন না, ইশারায় নিজের কথা জানিয়ে দেন। মৃত্যুর আগে রানীর বিয়ে দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিলেন, কিন্তু বিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। তারপর আমরা রানীর বিয়ের অনেক সম্বন্ধ এনেছি, কিন্তু ওঁর পছন্দ হচ্ছে না।'

দেবু কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, 'কি মুশকিল!'

আভা তখন উৎসুক হইয়া বলিল, 'আজ কাকা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তোকে ওঁর খুব পছন্দ হয়েছে। তুই রানীকে বিয়ে করবি? কাকা জানিয়েছেন রানীর বিয়ে হয়ে গেলে উনি চলে যাবেন, আর এ বাড়িতে থাকবেন না। করবি বিয়ে? ভারি ভাল মেয়ে রে, অমন মেয়ে আজকালকার দিনে দেখা যায় না।'

দেবুর মাথাটা ঘুরপাক খাইতেছিল; সে দেওয়ালের দিকে চোখ তুলিল। দেখিল, বৃদ্ধের জীবন্ত চোখে যেন একটু হাসি খেলা করিতেছে।

১৯ জুলাই ১৯৬২

মালকোষ

বরদা বলিল, 'ওস্তাদ কাফি খাঁর সেতার শুনেছ?'

ক্লাবের পাঠাগারে আমরা কয়েকজন নীরবে বসিয়া সাময়িক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিলাম। অমূল্য পত্রিকা হইতে চোখ তুলিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'মতলবটা কি? নতুন আষাঢ়ে গল্প তৈরি করেছ, তাই শোনাতে চাও?'

বরদা কর্ণপাত করিল না, গল্প আরম্ভ করিয়া দিল— পুজোর ছুটিতে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলাম। আমার ছোট শালা শুভেন্দুর ভারি গান-বাজনার শখ, একদিন আমাকে বলল— 'জামাইবাবু, ওস্তাদ কাফি খাঁর সেতার শুনতে যাবেন? ওস্তাদজি আমাকে খুব ভালবাসেন; কয়েকদিনের জন্য শহরে এসেছেন, ডাকবাংলোতে আছেন। আমি খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছিলাম; তিনি বললেন, আজ রাত্রে যখন আর কেউ থাকবে না তখন বাজনা শোনাবেন। যাবেন আপনি আমার সঙ্গে?'

নেই কাজ তো খই ভাজ। উচ্চাঙ্গ গান-বাজনার প্রতি আমার বিশেষ আসক্তি নেই; ধ্রুপদ চৌতাল ধামার দশকুশী বুঝি না; রবীন্দ্রসঙ্গীতেই আমার আত্মা পরিতুষ্ট। কিন্তু বিনা মাশুলে যখন এতবড় একজন ওস্তাদের বাজনা শোনার সুযোগ হয়েছে তখন ছাড়ি কেন। বললাম— 'আচ্ছা যাব।'

রাত্রি আন্দাজ নটার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে ডাকবাংলোতে উপস্থিত হলাম। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, পাঁচিল-ঘেরা উঁচু ভিতের বাড়ি, বাড়ির সামনে চার ফুট উঁচু চাতাল। এই চাতালের ওপর আলোয়ান গায়ে দিয়ে একটি বৃদ্ধ বসে আছেন, তার পাশে একটি সেতার শোয়ানো রয়েছে।

পরিষ্কার চাঁদের আলোয় ওস্তাদজিকে দেখলাম। লম্বা একহারা চেহারা, মাথায় পাকা বাব্‌রি চুল, চিবুকে ত্রিকোণ দাড়ি। বয়স অনুমান করা শক্ত, তবে সত্তরের কাছাকাছি। শ্যালক ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। ওস্তাদজি স্নিগ্ধ স্বরে বললেন— 'এস বাবা। সঙ্গে ওটি কে?'

শালা পরিচয় করিয়ে দিল, আমিও হেঁট হয়ে প্রণাম করলাম। ওস্তাদজিকে দেখে তিনি হিন্দু কি মুসলমান এ কথা মনে আসে না। মনে হয় তিনি একটি প্রশান্তচিত্ত সাধক। সাধকের জাত নেই।

শালা জিজ্ঞেস করল— 'আজ কেউ আসেনি?'

ওস্তাদজি একটু ম্লান হেসে বললেন— 'এসেছিল কয়েকজন রঈস্ লোক, আধঘণ্টা বাজনা শুনে বাহবা দিতে দিতে চলে গেল।— কেউ কিছু বোঝে না।'

গুণিজনের পক্ষে অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ কতখানি পীড়াদায়ক তা জানি বলেই নিজের কথা ভেবে মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। ওস্তাদজি যাতে আমার অজ্ঞতা ধরতে না পারেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

ওস্তাদজি সেতারের ওপর হাত রেখে শালাকে বললেন, 'কী শুনতে চাও বল।'

শালা হাত জোড় করে বলল— 'অনেকদিন আপনার মালকোষ শুনিনি।'

ওস্তাদজি আস্তে আস্তে সেতারটি কোলে তুলে নিলেন, আঙুলের মেরজাপ্ পরে তারের ওপর মৃদু স্পর্শ করলেন; তারগুলি রণ্‌রণ্ করে উঠল। তারপর তিনি সেতারের কানে মোচড় দিয়ে তারগুলি বেঁধে নিতে নিতে বললেন— 'এখন হেমন্ত কাল, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরও আরম্ভ হয়ে গেছে। মালকোষ বাজাবার উপযুক্ত সময় বটে।'

চারিদিকে জ্যোৎস্না ঝিম্‌ঝিম্ করছে; দূর থেকে শহরের যেটুকু শব্দ আসছে তাও যেন দূরত্বের দ্বারা মোলায়েম হয়ে আসছে। ওস্তাদজি যন্ত্র বেঁধে নিয়ে বললেন— 'মালকোষ বাজাচ্ছি। একটা কথা বলে রাখি, যদি কিছু দেখতে পাও ভয় পেও না।'

ওস্তাদজি নিতান্ত সহজভাবেই কথাটা বললেন, কিন্তু আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। ওস্তাদজি আমার দিকে চেয়ে বললেন— 'মালকোষ যদি শুদ্ধভাবে বাজানো যায় তাহলে জিন্ আসে। ওরা মালকোষ রাগ শুনতে বড় ভালবাসে।'

জিন্! আরব দেশের দৈত্য বিশেষ। আমি ভূত-প্রেত নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু জিন্ জাতীয় জীবের সঙ্গে কখনো মূলাকাৎ হয়নি। ওরা আরব্য রজনীর কাল্পনিক প্রাণী, এই ধারণাই ছিল। এখন মালকোষ শোনবার জন্যে তারা আসতে পারে এই কথা ভেবে মনটা বেশ উৎসুক হয়ে উঠল।

ওস্তাদজি বাজাতে শুরু করলেন। লক্ষ্য করলাম, তার হাতের আঙুলগুলো লোহার তারের মতো বাঁকা-বাঁকা, কঠিন; কিন্তু সেতারের তারের ওপর তাদের স্পর্শ কি নরম! যেন ফুলের বাগানে মৌমাছি গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে। তিনি প্রথমে খুব ঠায়ে বাজাতে শুরু করলেন, তারপর আস্তে আস্তে তালের গতি দ্রুত হতে লাগল। আমি উচ্চসঙ্গীতের সমঝদার নই কিন্তু শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলাম। কে যেন ঐ সুরের মধ্যে ডুক্‌রে ডুক্‌রে মাথা কুটে কুটে কাঁদছে, যেন অব্যক্তকণ্ঠে বলছে— হামারি দুখের নাহি ওর—

আমার শালা সত্যিকারের রসজ্ঞ লোক। সে মাথা নাড়ছে না, ঊরুতে তাল ঠুকছে না, ঘাড় নীচু করে স্থির হয়ে বসে আছে। আমিও একটা নিবিড় অনুভূতির মধ্যে ডুবে গেছি। এই ভাবে কতক্ষণ কেটে গিয়েছে জানি না, বোধ হয় কুড়ি পঁচিশ মিনিট হবে। এক সময় অনুভব করলাম, নাকে একটা গন্ধ আসছে। স্থান কাল বিবেচনায় গন্ধটা স্বাভাবিক নয়।

শুকনো তামাক পাতার কড়া গন্ধ! এতক্ষণ অর্ধনিমীলিত নেত্রে বাজনা শুনছিলাম, এখন চোখ আর একটু খুলে এদিক ওদিক তাকালাম। কই, তামাক পাতা তো কোথাও নেই। ওস্তাদজি ঘাড় গুঁজে বাজিয়ে চলেছেন, শালা নিবাত নিষ্কম্প বসে আছে। অন্য মানুষও কেউ আসেনি। তবে?

হঠাৎ নজর পড়ল চাতালের নীচে মাটির ওপর। বুকটা একবার গুর্‌গুর্ করে উঠল—

আমি বসেছিলাম চার ফুট উঁচু চাতালের কিনারা ঘেঁষে, নীচে নজর পড়তেই বুঝলাম গন্ধটা কোথা থেকে আসছে। ঠিক চাতালের নীচেই একটা প্রকাণ্ড মানুষ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। চাঁদের আলোয় তার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, নিকষের মতো কালো গায়ের রঙ, আট হাত লম্বা তাগড়া শরীর, সর্বাঙ্গে লোহার শলার মতো রোঁয়া খাড়া হয়ে রয়েছে। দুই বাহু দিয়ে মাথাটা বেড়ে নিয়ে দৈত্য পড়ে আছে।

ভূত-প্রেত দেখে ডরিয়ে ওঠার দিন আমার নেই, কিন্তু সাষ্টাঙ্গ প্রণামরত বিরাট দৈত্যটাকে দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগল। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে দেখি, আমার ঠিক পিছনে আর একটা দৈত্য লম্বা হয়ে শুয়ে মালকোষ শুনছে।

আর একটু হলেই হাউমাউ করে উঠেছিলাম আর কি! অতি কষ্টে সামলে নিলাম। তারপর চোখ বুজে বসে রইলাম। চোখ খুলে তাকাবার সাহস নেই, হয়তো দেখব আরও অনেকগুলি আট হাত লম্বা জিন্ ভূমিষ্ঠ হয়ে মালকোষ শুনছে।

ভাই, আমি নানা জাতের ভূত দেখেছি, কিন্তু ভূতের গা দিয়ে তামাক পাতার গন্ধ বেরোয় এবং তারা উপুড় হয়ে শুয়ে মালকোষ শুনতে ভালবাসে এ কথা জানা ছিল না। আরব্য উপন্যাসেও কিছু লেখেনি। হয়তো আরব দেশের ভূত এমনিই হয়। মালকোষ সুরটা কিন্তু খাঁটি ভারতীয় সুর, তার আদি নাম মল্লকৌষিক।

ওস্তাদজির বাজনা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। যেন একটা মর্মন্তুদ বিলাপ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল। ওস্তাদজি কিছুক্ষণ সেই ভাবে বসে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে সেতার নামিয়ে রাখলেন।

আমি চোখ বুজে বসে বসে অনুভব করলাম তামাক পাতার গন্ধটা মিলিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে এদিক-

ওদিক তাকালাম, কাউকে দেখতে পেলাম না। জিনেরা চলে গেছে।

ওস্তাদজি আমার দিকে সপ্রশ্ন চোখে চাইলেন— ‘ওরা এসেছিল নাকি?’

বললাম— ‘এসেছিল।’

তিনি তৃপ্তস্বরে বললেন— ‘আজ বাজানো ভাল হয়েছে; মন বসে গিয়েছিল। তোমরা ভয় পাওনি তো?’

এতক্ষণে শালার ধ্যানভঙ্গ হল। সে পকেট থেকে একটি রুমাল এবং একটি গিনি বার করল; গিনি রুমালের ওপর রেখে রুমাল ওস্তাদজির পায়ের কাছে রাখল। তারপর লম্বা হয়ে তাঁকে প্রণাম করল।

তার ভূমিষ্ঠ প্রণামের ভঙ্গি দেখে মনে হল সেও একটি ছোটখাটো জিন্।

৯ আগস্ট ১৯৬২

ফকিরবাবা

মনে পড়ল পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন মুঙ্গেরে ওকালতি করি। আমার বাবা জেলা কোর্টের বড় উকিল ছিলেন, তাঁর গুটি তিন-চার জুনিয়র। আমি ছিলাম তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

কাজকর্ম বিশেষ করতাম না; বাবার পিছন পিছন এক এজলাস থেকে অন্য এজলাসে ঘুরে বেড়াতাম, কখনো বা এজলাসে সাক্ষীর এজেহার লিখতাম, এবং বেশির ভাগ সময় বার-লাইব্রেরিতে বসে সমবয়স্ক উকিলদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম।

বার-লাইব্রেরির আড্ডা সম্বন্ধে একটা কথা বলতে পারি। অনেক চক্রে আড্ডা দিয়েছি, কিন্তু এমন চোখা বুদ্ধি ও wit-এর সংঘর্ষ আর কোথাও পাইনি। এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস সব বার-লাইব্রেরিই সমান।

আদালতের সরজমিনে নানা জাতীয় মানুষের বিচিত্র সমাবেশ। অধিকাংশই পুরুষ; বাদী প্রতিবাদী আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী উকিল মুন্সী তদ্বিরকারী পাটোয়ারি। কেউ ছুটোছুটি করছে, কেউ মোকদ্দমা জিতে ঢোল পিটোচ্ছে, কেউ হেরে গিয়ে গাছতলায় গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ক্রোধ লোভ কুটিলতা হতাশা জয়োল্লাস, কত রকম যে মনোভাব এই আদালত নামক ভূখণ্ডের মধ্যে তাল পাকাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কোনোটাই কিন্তু উচ্চাঙ্গের মনোবৃত্তি নয়।

এই জনাবর্তের মধ্যে একটি লোককে মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম যার সঙ্গে আদালতের বাতাবরণের কোনো মিল নেই। তাকে লোকে বলত ফকির-বাবা। ইয়া ষণ্ডা চেহারা, নিকষের মতো গায়ের রঙ, মাথায় এক-মাথা তৈল-চিক্কণ বাব্‌রি চুল, অল্প দাড়ি আছে। মাংসল মুখে সামনের দুটো দাঁত ভাঙা, কিন্তু হাসিটি প্রাণখোলা; কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, চোখ দুটিও ঐ ফোঁটার মতোই রক্তবর্ণ। কি শীত কি গ্রীষ্ম— একটা কালো কম্বল তার চওড়া কাঁধে পাট করা থাকত। পরনে লুঙ্গি, কখনো সেই সঙ্গে একটা গেঞ্জি।

লোকটিকে দেখে আমার মনে হত সে আদৌ মুসলমান ছিল, তারপর তান্ত্রিক সাধনা আরম্ভ করেছিল। তার ফকির-বাবা নাম থেকেও তাই মনে হয়। কিন্তু এ আমার আন্দাজ মাত্র। তার গোটা পরিচয় কোনোদিন জানতে পারিনি।

ফকির-বাবা আদালতে আসত টাকা রোজগার করতে। তার টাকা রোজগারের প্রক্রিয়া আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। আদালতের খোলা জায়গায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সে হঠাৎ একটা লোকের হাত ধরে বলত— 'তুই যদি আমাকে পাঁচটা টাকা দিস তোকে মামলা জিতিয়ে দেব।' কাউকে কখনো অস্বীকার করতে দেখিনি, বরং পরম আহ্লাদিত হয়ে টাকা দিত। আশ্চর্য এই যে, যারা টাকা দিত তারা কখনো মোকদ্দমায় হারত না। আবার দেখেছি কত লোক ফকির বাবাকে একশো দুশো টাকা নিয়ে ঝুলোঝুলি করছে, বলছে— 'বাবা, আমাকে মোকদ্দমা জিতিয়ে দাও।' কিন্তু ফকির-বাবা টাকা নেয়নি। বলেছে— 'তোর টাকা নেব না।'

আমার বিশ্বাস ফকির-বাবার একটা দৈবশক্তি ছিল—খুব নিম্নস্তরের সিদ্ধাই—যার দ্বারা সে লোকের মুখ দেখে তার ভবিষ্যৎ জানতে পারত। আমাকে একবার একটা এজলাসের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে বলেছিল, 'তুই এখানে কি করছিস? যা ভাগ্—পালা।' তখন তার কথার মানে বুঝিনি।

দু'চার দিন আদালতে ঘুরে বেড়িয়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে ফকির-বাবা ডুব মারত, আবার দু'-চার মাস পরেই ঠিক ফিরে আসত।

যে ঘটনা আজ মনে পড়ল সেটা ঘটেছিল গ্রীষ্মকালের একটি অপরাহ্নে। তখন বোধ হয় সকালে আদালত বসছে, বিকেলবেলা বাড়িতে মক্কেল আসে। মনে আছে, বিকেল আন্দাজ চারটের সময় বাবা অফিস-ঘরে এসে বসেছেন, আমিও এসেছি, আর এসেছেন বাবার প্রধান জুনিয়র শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়। নিরাপদদাদা পরবর্তীকালে রাজনীতির ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তখন জুনিয়র উকিল ছিলেন, আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন।

মক্কেল তখনো কেউ আসেনি; সদর দরজা ভেজানো আছে। বাবা আর নিরাপদদাদা টেবিলের দুই পাশে বসে বিশ্রম্ভালাপ করছেন। টেবিলের ওপর নথিপত্র, ভারি ভারি আইনের বই ছড়ানো রয়েছে।

হঠাৎ সদর দরজায় ঠেলা দিয়ে ঘরে ঢুকল— ফকির-বাবা। সেই শা-জোয়ান চেহারা, সেই কাঁধে কম্বল, সেই গালভরা হাসি। অনেকদিন তাকে আদালতে দেখিনি, আমাদের বাড়িতে তার পদার্পণও এই প্রথম। বাবা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

ফকির-বাবা তাঁর চেয়ারের পাশে গিয়ে দাড়াল; বলল, 'বকিল সাহেব, দুটো টাকা দাও।'

বাবা বললেন, 'তুমি টাকা কি করবে?'

সে ফোগলা মুখে হেসে সপ্রতিভভাবে বলল, 'মদ খাব।'

বাবা দোনা-মনা করতে লাগলেন। টাকা দিলেন না, কিন্তু 'দেব না' বলে তাকে হাঁকিয়েও দিলেন না। বাবার মনে বোধ হয় সংশয় জেগেছিল, যে-ব্যক্তি মদ খাওয়ার জন্যে টাকা চায় তাকে টাকা দেওয়া উচিত কিনা।

নিরাপদদাদা এই সময় কথা বললেন, তিনি সে-সময় একটু নাস্তিক গোছের লোক ছিলেন, বললেন, 'ফকির সাহেব, তুমি তো সাধুসজ্জন ব্যক্তি, ভূত দেখাতে পারো?'

ফকির-বাবা তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে ফিরে বলল, 'হ্যাঁ, পারি।'

ক্ষণেকের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। বলে কি লোকটা! ভূত দেখাবে!

নিরাপদদাদা বললেন, 'দেখাও ভূত। কিন্তু খাঁটি ভূত দেখাতে হবে, বুজরুকি চলবে না।'

ফকির-বাবা বলল, 'এমন ভূত দেখাবো পিলে চমকে যাবে। এক তা সাদা কাগজ দাও।'

নিরাপদদাদা এক তা কাগজ টেবিল থেকে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিলেন। ফকির-বাবা কাগজ স্পর্শ করল না, কেবল কাগজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'হয়েছে। এবার কাগজটা চাপা দিয়ে রাখো।'

নিরাপদদাদা একটা ভারি বইয়ের তলায় কাগজ চাপা দিয়ে রাখলেন। ফকির বাবা তখন চেয়ার টেনে বসল, নিতান্ত সহজভাবে এ-কথা সে-কথা বলতে লাগল। কথাগুলো এতই সাধারণ যে আজ আর তার একটি কথাও মনে নেই।

পাঁচ মিনিট পরে ফকির-বাবা গালগল্প থামিয়ে বলল, 'এবার কাগজটা বের করে দেখ।'

নিরাপদদাদা বই-এর তলা থেকে কাগজ বের করলেন। কাগজ দেখে সত্যিই পিলে চমকে উঠল। তার ওপর আঁকা রয়েছে এক বিকট ভয়ঙ্কর চেহারা। ছেলেমানুষদের ভয়-দেখানো রাক্ষস-খোক্কসের চেহারা নয়, এমন একটা জীবন্ত হিংস্র কদর্যতা আছে ঐ চেহারায় যে, বয়স্থ মানুষেরও বুক গুর্‌গুর্ করে ওঠে। আমরা মোহগ্রস্তের মতো তাকিয়ে রইলাম।

ফকির-বাবা অট্টহাস্য করে বলল, 'দেখলে ভূত? এবার চাপা দিয়ে রাখো।'

নিরাপদদাদা যন্ত্রচালিতের মতো কাগজখানা আবার বই-চাপা দিলেন। ফকির বাবা পিতৃদেবের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'টাকা দাও।'

বাবা নিঃশব্দে দুটি টাকা দেরাজ থেকে বের করে তার হাতে দিলেন। ফকির বাবা গালভরা হাসি হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমরা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলাম। তারপর নিরাপদদাদা দ্বিতীয়বার চাপা দেওয়া কাগজখানা বের করলেন। দেখা গেল কাগজে ভূতের চেহারা নেই, সাদা কাগজ আবার সাদা হয়ে গেছে।

৮ জানুয়ারি ১৯৬৩

পিছু পিছু চলে

সত্যবান গজাধর সিন্ধে বললেন, 'আপনি কখনো ভূত দেখেছেন?'

চুপ করে রইলাম। যারা ভূত দেখেছে তারা অন্যকে ভূত দেখাতে পারে না, সুতরাং নাস্তিকদের কাছে হাস্যাস্পদ হয়। আজকাল নাস্তিকদের যুগ চলেছে, অতএব সাবধানে থাকা ভাল।

সত্যবান সিন্ধে পুণায় আমার প্রতিবেশী, আমার সমবয়সী। এককালে সুপুরুষ ছিলেন, এখন জীর্ণ শীর্ণ চেহারা। আমার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কিন্তু এক পাড়ায় থাকতে গেলে হাসি কথা শিষ্টতার বিনিময় করতে হয়। তিনি কোন এক বীমা কোম্পানিতে চাকরি করতেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত।

গত পৌষমাসে হপ্তাখানেক দারুণ শীত পড়েছিল। একদিন সন্ধ্যের পর আমি দোর-জানলা বন্ধ করে একখানা বই নিয়ে বসেছি, এমন সময় দোরের ঘণ্টি বেজে উঠল। দোর খুলে দেখি, সত্যবান সিন্ধে। তাঁর মাথায় পাগড়ির মতো স্কার্ফ জড়ানো, গায়ে আলোয়ান, তবু ভদ্রলোক শীতে কাঁপছেন। একটু আশ্চর্য হলাম, কিন্তু আপ্যায়ন করে এনে বসালাম, 'আসুন, এবার বেজায় শীত পড়েছে।'

তিনি দন্তবাদ্য থামিয়ে এদিক-ওদিক চাইলেন, তারপর প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি কখনো ভূত দেখেছেন?'

আমাকে নিরুত্তর দেখে তিনি বললেন, 'আমি বড় বিপদে পড়েছি। আপনি ভূতের গল্প-টল্প লেখেন শুনেছি, তাই ভাবলাম—'

চাকরকে কফি তৈরি করবার হুকুম দিয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার বলুন দেখি, আপনি ভূত দেখেছেন নাকি?'

তিনি অনেকক্ষণ চোখ বড় করে বসে রইলেন, তারপর বললেন, 'ভূত কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কি ভূত দেখেননি?'

বললাম, 'চোখে দেখিনি, কিন্তু অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছি।'

'সে কি রকম?'

'গন্ধ পেয়েছি, শব্দ শুনেছি, এমন কি স্পর্শ পর্যন্ত পেয়েছি।'

সত্যবান সিন্ধে গুম হয়ে গেলেন। তাঁর চোখে অজানিতের আতঙ্ক দুঃস্বপ্নের মতো জেগে রইল।

চাকর কফি দিয়ে গেল। জিভ-পোড়ানো গরম কফি সত্যবান সিন্ধে এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন, তারপর আলোয়ানটা গাঢ়ভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'তবে আপনাকে আমার গল্পটা বলি, আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন।'

একটু দম নিয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, 'গত মে মাসে একদিন সন্ধ্যের সময় আমি টিলক রোডের একটা রসবন্তী দোকানে বসে আখের রস খাচ্ছিলাম। আপনি তো জানেন গরম কালে এখানে খোলা জায়গায় বাখারির বেড়া দিয়ে ঘিরে আখ মাড়াইয়ের যন্তর বসায়। আমি একটা বেঞ্চিতে বসে রস খাচ্ছি, এমন সময় নজর পড়ল, বেড়ার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একটা লোক একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'বুড়ো লোক, দীন-দরিদ্র বেশ। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে ছাবকা ছাবকা দাড়ি-গোঁফ, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। প্রথমটা চিনতে পারিনি, তারপর—'

তিনি আবার চুপ করলেন। মুখ দেখে মনে হল তার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। বললাম, 'তাহলে চেনা লোক?'

সিন্ধে কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, 'হ্যাঁ। ত্রিশ বছর আগে যখন নাগপুরে ছিলাম তখন অনন্তা বিষ্ণু মারাঠেকে চিনতাম। স্কুলে মাস্টারি করত।'

বললাম, 'তাহলে অনন্তা বিষ্ণু মারাঠে আপনার বন্ধু!'

তিনি চমকে উঠে বললেন, 'না, না, বন্ধু নয়। তবে নাগপুরে এক পাড়ায় থাকতাম, যাওয়া আসা ছিল—' তারপর যে কথাটা চাপবার চেষ্টা করছিলেন তা বেরিয়ে এল, 'অনন্তার বৌ সুমন্তা ছিল অপরূপ সুন্দরী, আমি— আমি তাকে নিয়ে— সে আমার সঙ্গে ইলোপ করেছিল।'

যৌবনকালে সত্যবান সিন্ধে দেখছি গুণবান ব্যক্তি ছিলেন। এখন বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়েছেন। কিন্তু আমাকে এসব কথা বলছেন কেন? আমি বিদেশী, তাই?

বললাম, 'তারপর বলুন।'

সত্যবান বললেন, 'সুমন্তাকে নিয়ে নাগপুর থেকে নাসিকে পালিয়ে এসেছিলাম, সেখান থেকে বোম্বে। সুমন্তা কিন্তু বেশিদিন আমার কাছে রইল না, আর একজনের সঙ্গে আমাকে ছেড়ে গেল। আর তাকে দেখিনি।

'তারপর আমি কাজের সূত্রে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি; আমেদনগর, শোলাপুর, ঔরঙ্গাবাদ; শেষে কাজে অবসর নিয়ে পুণায় এসে বসেছি।'

প্রশ্ন করলাম, 'এই ত্রিশ বছরের মধ্যে অনন্তা মারাঠের সঙ্গে আর দেখা হয়নি?'

তিনি বললেন, 'না, এই প্রথম। তাকে যখন চিনতে পারলাম, তখন ভয় হল। অনন্তা মারাঠে স্কুলের মাস্টার ছিল বটে, কিন্তু ভারি একরোখা লোক ছিল।

'রসবন্তীতে বসে রস খেতে খেতে আড়চোখে তার দিকে তাকাতে লাগলাম। সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল।

'আর এক গেলাস রস খেলাম। বাইরে বেশ ঘোর ঘোর হয়ে এল, তখন বাইরে এসে এদিক-ওদিক তাকালাম। রাস্তায় তখন মোটর, অটো-রিক্সা, মানুষের ভিড়; অনন্তা মারাঠেকে দেখতে পেলাম না।

'তবু বাড়ির দিকে আসতে আসতে মাঝে মাঝে পিছু ফিরে চাইছি। কিছু দূর এসে দেখলাম অনন্তা মারাঠে আমার পিছু নিয়েছে; খুব কাছে আসেনি, লোকের ভিড়ের সঙ্গে মিশে আমাকে অনুসরণ করছে। অনন্তার মতলব বুঝলাম; সে আমার বাড়ির ঠিকানা জানতে চায়। বাড়িতে এসে হাঙ্গামা বাধাবে। বাড়িতে আমার বৌ আছে, ছেলেমেয়ে আছে—

'রাস্তা দিয়ে একটা খালি অটো-রিক্সা যাচ্ছিল, টপ্ করে তাতে উঠে পড়লাম। চলে গেলাম একেবারে শম্ভাজি পার্ক। সেখানে একটা বেঞ্চিতে অন্ধকারে বসে রইলাম। তারপর ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ি ফিরে এলাম। অনন্তাকে আর দেখতে পেলাম না।

'অনন্তা মারাঠে বোধ হয় কোনো কাজে নাগপুর থেকে পুণায় এসেছিল, তারপর হঠাৎ রসবন্তীতে আমাকে দেখতে পায়। ত্রিশ বছরে আমার চেহারা অনেক বদলে গেছে, তবু সে আমাকে চিনতে পেরেছিল। লোকটা ভয়ঙ্কর রাগী আর প্রতিহিংসাপরায়ণ।'

বললাম, 'বৌ নিয়ে পালালে রাগ হবারই কথা।'

সিন্ধে বললেন, 'দেখুন, আমার দোষ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু দোষ আমার একার নয়। অনন্তার বৌটা ছিল— যাকে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে— প্রবিকীর্ণকামা বিকীর্ণমন্মথা পুংশ্চলী।'

'আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন নাকি?'

'জানি। আপনার কোষ্ঠী আছে? একদিন দেখব। যা হোক, তারপর তিন দিন আর বাড়ি থেকে বেরুলাম না, ভাবলাম দু-তিন দিনের মধ্যেই অনন্তা কাজ সেরে নাগপুরে ফিরে যাবে।

'প্রথম যেদিন বেরুলাম সেদিন অনন্তাকে দেখতে পেলাম না। তার পরদিন লছমী রোডে গিয়েছি কিছু কেনাকাটার জন্যে, দেখি অনন্তা আমার পিছু নিয়েছে। তার হাতে একটা মোটা লাঠি। ভয় পেয়ে গেলাম, কি

করি! একটা সাত নম্বর বাস রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল, টুক্ করে তাতে উঠে পড়লাম। ভাগ্যক্রমে অনন্তা ওঠবার আগেই বাস ছেড়ে দিল।

'সাত নম্বর বাস পুণা স্টেশনে যায়, আমি স্টেশনে নেমে শিবাজিনগরের টিকিট কিনে একটা লোকাল ট্রেনে উঠে বসলাম; পাঁচ মিনিট পরে শিবাজিনগর স্টেশনে নেমে অটো-রিক্সা চড়ে বাড়ি ফিরে এলাম। অনন্তা আমাকে ধরতে পারল না।

'এরপর সাত দিন বাড়ি থেকে বেরুলাম না। কিন্তু বুড়ো বয়সে প্রত্যহ একটু ঘোরাফেরা দরকার, নইলে শরীর খারাপ হয়ে যায়। আমি ভোর চারটের সময় বেড়াতে বেরুতে আরম্ভ করলাম। সূর্যোদয়ের আগেই ফিরে আসি। অনন্তার দেখা নেই।

'কিন্তু শুধু প্রাতঃভ্রমণ করলেই তো চলে না; আমি গেরস্ত মানুষ, বাজার-হাটও করতে হয়। সাতদিন পরে বিকেলবেলা গুটি গুটি বেরুলাম। অনন্তার দেখা পেলাম না। ভাবলাম, যাক্, অনন্তা নাগপুরে ফিরে গেছে।

'তারপর গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা এল—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'একটা কথা বলুন। এটা ভূতের গল্প বলছেন, না মানুষের গল্প?'

সত্যবান বললেন, 'তা আমি নিজেই জানি না। শেষ পর্যন্ত শুনে আপনি বলুন।'

তিনি আবার আরম্ভ করলেন, 'বর্ষাও শেষ হয়ে এল। আমি বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছি। পুণার বৃষ্টি বোম্বের মতো নয়, ঝিরঝিরে বৃষ্টি; কদাচিৎ তোড়ে পাউস্ নামে। একদিন আমি ছাতা নিয়ে মণ্ডাই গেছি শাক-সবজি কিনতে, হঠাৎ তোড়ে বৃষ্টি নামল। ছাতায় সে-বৃষ্টি সামলায় না, আমি বাড়ি ফেরার পথে আটকা পড়ে গেলাম। একটা দোকানের ওল্‌তলায় কয়েকজন লোক দাঁড়িয়েছিল, আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম।

'তারপর— সেই আকাশ-ভাঙা বৃষ্টির মাঝখানে অনন্তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। অনন্তাও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য ভয়ের বিশেষ কারণ ছিল না, এতগুলো লোকের মাঝখানে অনন্তা নিশ্চয় আমাকে খুন করত না। কিন্তু তার চোখের চাউনি দেখে আমি ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে গলার মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ করছে।

'রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলাম, বৃষ্টি ভেদ করে দুটো ট্রাক রাস্তার দু'দিক থেকে দৈত্যের মতো ছুটে আসছে। এই সুযোগ! ট্রাক দুটো এসে পড়বার আগেই আমি যদি রাস্তা পার হয়ে যেতে পারি, তাহলে অনন্তা অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে আমার পিছু নিতে পারবে না। সেই ফাঁকে আমি পালাব।

'রাস্তার ওপর দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তবু নেমে পড়লাম; ট্রাক দুটো এসে পড়েছে, আমি চট্ করে রাস্তা পার হয়ে গেলাম। তারপরই শুনতে পেলাম, ট্রাকের ব্রেক কষার কড়্ কড়্ শব্দ। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে রক্তারক্তি কাণ্ড।

'দুটো ট্রাকই দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর তাদের মাঝখানে অনন্তার রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে। তার একটা হাত ট্রাকের চাকার নীচে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়েছে, চারদিকে রক্ত-মাখা জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। অনন্তা নিশ্চয় আমাকে অনুসরণ করেছিল, তারপর দুটো ট্রাক দু'দিক থেকে এসে তাকে থেঁতলে দিয়েছে। ডান হাতটা বোধ হয় চাকার নীচে পড়েছিল, কনুই থেকে কেটে আলাদা হয়ে গেছে।

'চারদিক থেকে লোকজন হৈ-হৈ করে ছুটে এল। আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না।

'এ-রকম একটা বীভৎস দৃশ্য চোখে দেখলে মানুষের প্রাণে আঘাত লাগে। আমার কিন্তু দুঃখ হল না। মনে হল, অনন্তা মরেছে আমার হাড় জুড়িয়েছে, আমি মুক্তি পেয়েছি।

'মাসখানেক ভারি আনন্দে কেটে গেল। বর্ষা গিয়ে শীত এল। আমি শীতকালে পাহাড়ের মাথায় পার্বতী মন্দিরে উঠি। আগে রোজ উঠতাম, আজকাল হপ্তায় একদিন উঠি। তার বেশি পেরে উঠি না। রোজ দেড়শো সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার আর শক্তি নেই।

একদিন সন্ধ্যের সময় পার্বতী মন্দিরের পাহাড়ে উঠেছি। এই শিখরটা পেশোয়াদের আমলে দুর্গ ছিল,

এখনো তার চৌদ্দ হাত চওড়া প্রাকার ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। আমি গিয়ে পশ্চিম দিকের প্রাকারের কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসলাম। ঠিক পায়ের তলায় পার্বতী পাহাড়ের গা প্রায় খাড়া নীচে নেমে গেছে। সূর্যাস্তের পর আকাশে রঙের খেলা আরম্ভ হয়েছে। আমি সেই দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।

'হঠাৎ মনে হল, আমার পাশে কে বসে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি— অনন্তা! তার একটা হাত কনুই থেকে কাটা, সে আমার দু'হাত দূরে বসে কট্‌মট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'ভয়ে আমার দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না। তারপর কি করে যে পার্বতী পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলাম, তা আমি নিজেই জানি না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পিছু ফিরে দেখবার সাহস হয়নি, কিন্তু মনে হয়েছে অনন্তা পিছনে তেড়ে আসছে, এখনি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। পার্বতী পাহাড় থেকে নেমে আমি এক ছুটে নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

'সে আজ দশ-বারো দিন আগের কথা।

'তারপর থেকে সন্ধ্যের পর যখনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, হাতকাটা অনন্তা আমার পিছু নিয়েছে; বেশি কাছে আসে না, আট-দশ হাত দূর থেকে আমার অনুসরণ করে। কিন্তু দিনের বেলা তাকে দেখতে পাই না।

'তাই সন্ধ্যের পর আর বাড়ির বাইরে থাকি না।

'আজ এক বন্ধুর বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা ছিল। সন্ধ্যের আগেই সেখানে গিয়েছিলাম; ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, কিন্তু পাল্লায় পড়ে দেরি হয়ে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে বেশ জোরে জোরে পা চালিয়ে দিলাম।

'আপনার এদিকটা রাত্রিবেলা বেশ নির্জন, কিন্তু এদিক দিয়ে এলে শিগ্‌গির হয়। তাই এই পথেই এলাম। বেশি দূরে আসতে হল না, দেখি অনন্তা নিঃশব্দে আমার পিছু নিয়েছে। অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার মতো মূর্তি। প্রথমটা দূরে দূরে, তারপর ক্রমশ কাছে আসছে।

'উঠি-পড়ি করে ছুটে চলেছি। বুকের রক্ত শুকিয়ে গিয়েছে; যদি হোঁচট খেয়ে পড়ি আর উঠতে হবে না, হার্টফেল করে মরে যাব। পা দুটো অবশ হয়ে আসছে।

'আপনার বাড়ির সামনে যখন এলাম, তখন অনন্তা প্রায় আমার ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে। দেখলাম, আপনার সদরে আলো জ্বলছে। আর দ্বিধা করলাম না, এখানেই ঢুকে পড়লাম। নিজের বাড়ি পর্যন্ত যাবার সাহস হল না।

সত্যবান সিন্ধে চুপ করলেন। আমিও খানিক চুপ করে রইলাম; শেষে বললাম, 'দেখুন, যে অনন্তা ট্রাক চাপা পড়েছিল সে জ্যান্ত মানুষ, কারণ প্রেত গাড়ি চাপা পড়েছে এমন কখনো শোনা যায়নি।'

সত্যবান বললেন, 'কিন্তু তার পরে?'

'তার পরে বলা শক্ত। প্রেতও হতে পারে, মানুষও হতে পারে। ভেবে দেখুন, অনন্তার হাত কাটা গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রাণটা হয়তো শেষ পর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিল।'

'কিন্তু আমি যে খবরের কাগজে মৃত্যু-সংবাদ পড়েছি। যেদিন দুর্ঘটনা হয়, তার পরদিন 'সকালে' বেরিয়েছিল। লিখেছিল, অনন্তা ঘটনাস্থল থেকে হাসপাতাল পৌঁছুবার আগেই মরে গিয়েছিল।'

'তাই নাকি! তাহলে—'

'তাছাড়া, বিবেচনা করুন, আমি সেদিন পার্বতী পাহাড়ে ভাঙা পাঁচিলের কিনারায় বসেছিলাম, অনন্তা যদি মানুষ হত তাহলে সে পিছন দিক থেকে আমাকে ঠেলে খাদে ফেলে দিত, আমি মরে যেতাম। ও যে আমার পিছনে লেগেছে, ওর উদ্দেশ্য আমার মৃত্যু ঘটান। জ্যান্ত অবস্থায় আমাকে মারতে পারেনি, এখন ভূত হয়ে মারবে!— আপনি বলুন, এখন উপায় কী! কেমন করে অনন্তার হাত থেকে উদ্ধার পাব।'

ভূতের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় জানা নেই। চাল-পড়া সর্ষে-পড়া আজকাল আর চলে না। অনেক ভেবে বললাম, 'এ-দেশে পিণ্ডদানের কোনো ব্যবস্থা আছে?'

সত্যবান একটু নিরাশভাবে বললেন, 'আছে। পেন্‌ঢারপুরে পিণ্ডি দেওয়া যায়, আরো দু'একটা জায়গা

আছে। কিন্তু অত দূরে যাওয়া কি সম্ভব? অনন্তা আমার পিছু নেবে।’

‘তা বটে।’

দু’জনে মুখোমুখি বসে উপায় চিন্তা করতে লাগলাম, বাঘের হাত ছাড়ানো যায়, জঙ্গলে না গেলেই হল; কুমিরকে এড়িয়ে চলা যায়, নদীতে না নামলেই হল। কিন্তু অশরীরীর হাত থেকে নিস্তার নেই। এই সব ভাবছি বটে, কিন্তু মনের সংশয় যাচ্ছে না। সত্যি ভূত বটে তো? ভয় পেলে মানুষ ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখে —

হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলোটা মিট্‌মিট্‌ করে চোখ টিপল। এই রে, এবার বুঝি আলো নিভবে! পুণায় এমন প্রায়ই হয়, হঠাৎ অকারণে আলো নিভে যায়, তারপর কখনো পাঁচ মিনিট কখনো দু’-ঘণ্টা অন্ধকারে বসে থাকো।

আলো কিন্তু নিভল না, দু’চার বার মিট্‌মিট্‌ করে স্থির হল। কিছুক্ষণ পরে সদর দরজার ঘন্টি ক্ষীণভাবে একবার বেজে উঠেই থেমে গেল।

এত রাত্রে আবার কে এল! উঠে গিয়ে সদর দরজা খুললাম। সদর দরজার মাথায় আলো আছে; দেখলাম, একজন লোক দোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধোপার পাটে আছড়ালে যেমন দেখতে হয় সেই রকম চেহারা। তার ডান হাতটা কনুই থেকে কাটা।

লোকটা ঝাঁকড়া ভুরুর তলা থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার হৃদ্যন্ত্রটা ধড়ফড় করে উঠল।

তারপর আলো নিভে গেল। আমি হাঁপিয়ে উঠে বললাম, ‘কে?’ কিন্তু সাড়া পেলাম না।

দু’মিনিট পরে আবার আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম, কেউ নেই— লোকটা চলে গেছে।

সে-রাত্রে সত্যবান সিন্ধেকে টর্চ হাতে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম।

এই কাহিনী লেখা শেষ করবার পর আজ খবর পেলাম, সত্যবান সিন্ধে পেন্‌ঢারপুর যাচ্ছিলেন, পথে হার্টফেল করে মারা গেছেন।

১৯ জুন ১৯৬৫

কামিনী

স্টেশনে ট্রেন থামিতেই হ্যাট-কোট পরা সুরনাথবাবু নামিয়া পড়িলেন। স্টেশনটি ছোট, তাহার সংলগ্ন জনপদটিও বিস্তীর্ণ নয়। ট্রেন দু'মিনিট থামিয়া চলিয়া গেল।

সুরনাথ ঘোষ একজন পোস্টাল ইন্সপেক্টর। সম্প্রতি এদিকটার গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি নূতন পোস্ট অফিস খুলিয়াছে, সুরনাথবাবু সেগুলি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি এদিকে কখনো আসেন নাই।

ছোট সুটকেসটি হাতে লইয়া তিনি স্টেশন হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে অন্য কোনো লটবহর নাই। সুটকেসের মধ্যে আছে এক সেট্ প্যান্টুলুন ধুতি গামছা সাবান, দাঁত মাজিবার বুরুশ ইত্যাদি।

স্থানীয় পোস্ট অফিসটি স্টেশনের কাছেই। ডাক এবং 'তার' দুই-ই আছে, কিন্তু সবই শহরের অনুপাতে; একজন পোস্টমাস্টার, একটি কেরানী ও দু'জন পিওন। পোস্ট অফিসের পশ্চাদ্ভাগে পোস্টমাস্টার সপরিবারে বাস করেন।

বেলা আন্দাজ এগারটার সময় সুরনাথবাবু পোস্ট অফিসে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন, পোস্টমাস্টার খাতির করিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরের আহারাদির ব্যবস্থা পোস্টমাস্টারবাবুর বাসাতেই হইল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সুরনাথবাবু ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার ধড়াচূড়া পরিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি খবর লইয়াছেন, যে তিনটি পোস্ট অফিস পরিদর্শনে তিনি যাইবেন তাহার মধ্যে সবচেয়ে যেটি নিকটবর্তী সেটি বারো মাইল দূরে। কাঁচা-পাকা রাস্তা আছে। সুরনাথ 'তার' পিওনের সাইকেলটি ধার লইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার সময় উদ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছিবেন, কাল সকালে সেখানকার পোস্ট অফিস তদারক করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসিবেন, তারপর আবার অন্য পোস্ট অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবেন।

সাইকেলের পশ্চাদ্ভাগে ছোট সুট্‌কেসটি বাঁধিয়া সুরনাথ তাহাতে আরোহণের উদ্যোগ করিলে পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'এখান থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে রাস্তা দু'-ফাঁক হয়ে গেছে। ডান-হাতি রাস্তা দিয়ে গেলে একটু ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু আপনি ঐ রাস্তা দিয়েই যাবেন।'

সুরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, বাঁ-হাতি রাস্তাটা কী দোষ করেছে?'

পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'ও রাস্তাটা ভাল নয়।'

সাইকেলে আরোহণ করিয়া সুরনাথ বাহির হইয়া পড়িলেন। ক'য়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি শহরের এলাকা পার হইলেন। তারপর অবারিত মুক্ত দেশ।

দেশটা বর্ণসঙ্কর। অবিমিশ্র পলিমাটি নয়, আবার নির্জলা মরুকান্তারও নয়। স্থানে স্থানে ঘন বন আছে, কোথাও নিস্তরুপাদপ শিলাভূমি, কোথাও নরম মাটির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুক্ষ পাথরের ঢিবি মাথা তুলিয়াছে। এই বিচিত্র ভূমির উপর দিয়া নির্জন পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে।

আকাশে পৌঁষ মাসের স্নিগ্ধ সূর্য, বাতাসে আতপ্ত আরাম। সুরনাথ প্রফুল্ল মনে মন্থর গতিতে চলিয়াছেন। মাত্র বারো-চৌদ্দ মাইল পথ সাইকেলে যাইতে কতই বা সময় লাগিবে!

সুরনাথের বয়স চল্লিশ বছর। মধ্যমাকৃতি দৃঢ় শরীর, মুখশ্রী মোটের উপর সুদর্শন। তিনি বিপত্নীক, বছর তিনেক আগে স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। আবার বিবাহের প্রয়োজন তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন, কিন্তু

বিপত্নীকত্বের ফলে যে ক্ষণিক স্বাধীনতাটুকু লাভ করিয়াছেন তাহা বিসর্জন দিতেও মন চাহিতেছে না।

তিনি যখন ছয় মাইল দূরস্থ পথের দ্বিভুজে পৌঁছিলেন তখন সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকখানি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সম্মুখে দুইটি পথ ক্রমশ পৃথক হইতে হইতে ধনুকের মতো বাঁকিয়া গিয়াছে; মাঝখানে উঁচু জমি, তাহার উপর তাল খেজুরের গাছ মাথা তুলিয়া আছে।

হঠাৎ কোথা হইতে ক্ষুদ্র একখণ্ড কালো মেঘ আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিল; চারিদিক অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গেল। সুরনাথ পথের সন্ধিস্থলে সাইকেল হইতে নামিলেন।

আগে পাশে নিকটে দূরে জনমানব নাই। আকাশ নির্মল, কেবল সূর্যের মুখের উপর টুকরা মেঘ লাগিয়া আছে, যেন সূর্য মুখোশ পরিয়াছে। সুরনাথ একটু চিন্তা করিলেন। এখনো ছয়-সাত মাইল পথ বাকি, আধ ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য অস্ত যাইবে; অন্ধকার হইবার পূর্বে যদি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে না পারেন, দিক্‌ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

পোস্টমাস্টার বলিয়াছিলেন বাঁ-হাতি রাস্তাটা ভাল নয়, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ছোট। সুতরাং বাঁ-হাতি রাস্তা দিয়া যাওয়াই ভাল।

সুরনাথ সাইকেলে চড়িয়া বাঁ-হাতি রাস্তা ধরিলেন। পোস্টমাস্টার মিথ্যে বলেন নাই, পথ অসমতল ও প্রস্তরাকীর্ণ; কিন্তু সাবধানে চলিলে আছাড় খাইবার ভয় নাই। সুরনাথ সাবধানে অথচ দ্রুত সাইকেল চালাইলেন।

সূর্যের মুখ হইতে মেঘ কিন্তু নড়িল না। মনে হইল মুখে মুখোশ আঁটিয়াই সূর্যদেব অস্ত যাইবেন।

মিনিট কুড়ি সাইকেল চালাইবার পর সুরনাথ সামনে একটি দৃশ্য দেখিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। অস্পষ্ট আলোতে মনে হইল যেন রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট কুটির দেখা যাইতেছে, দু'একটা আবছায়া মূর্তিও যেন ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

আরো কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া সুরনাথ ব্রেক্ কষিলেন। একটি ছোট মাটির কুটির যেন মন্ত্রবলে রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আশেপাশে অন্য কোনো কুটির দেখা যায় না; এই কুটিরটি যেন গ্রামে প্রবেশের মুখে প্রহরীর মতো দাঁড়াইয়া আছে।

সুরনাথ রাস্তার ধারে যেখানে সাইকেল হইতে নামিলেন সেখান হইতে তিন গজ দূরে কুটিরের দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া একটি যুবতী বসিয়া আছে। সুরনাথের চোখের সহিত তাহার চোখ চুম্বকের মতো আবদ্ধ হইয়া গেল।

চাষার মেয়ে। গায়ের রঙ মাজা পিতলের মতো পীতাভ, দেহ যৌবনের প্রাচুর্যে ফাটিয়া পড়িতেছে। মুখের ডৌল দৃঢ়, প্রগল্‌ভতার সমাবেশ। মাথার অযত্নবিন্যস্ত চুলের প্রান্তে একটু পিঙ্গলতার আভাস, চোখের তারা বড় বড়। পরিধানে কেবল একটি কস্তাপাড় শাড়ি, অলঙ্কার নাই। সধবা কি বিধবা কি কুমারী বোঝা যায় না। তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন আগুন-রাঙা চুল্লীর দিকে চাহিয়া আছি।

'হ্যাঁগা, তুমি কোথায় যাবে?' যুবতী প্রশ্ন করিল। দাঁতগুলি কুন্দশুভ্র, গলার স্বর গভীর ও ভরাট; কিন্তু কথা বলিবার ভঙ্গি গ্রাম্য।

সুরনাথের বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করিয়া উঠিল। দীর্ঘকালের অনভ্যস্ত একটা অন্ধ আবেগের স্বাদ তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু তিনি লঘুচেতা লোক নন, সবলে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, 'রতনপুর।'

যুবতী দাওয়ার কিনারায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে প্রগল্‌ভতা ছাড়াও এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ুশিরায় আগুন ধরাইয়া দিতে পারে। শেষে হাসি থামাইয়া সে বলিল, 'রতনপুর যে অনেক দূর, যেতে যেতেই রাত হয়ে যাবে, পৌঁছুতে পারবে না।'

সুরনাথ রাস্তার দিকে চাহিলেন। দূর হইতে যে গ্রামের আভাস পাইয়াছিলেন সন্ধ্যার ছায়ায় তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। তিনি উদ্বেগ স্বরে বলিলেন, 'তাহলে গ্রামে কি কোথাও থাকবার জায়গা আছে?'

'এখানেই থাকো না!'

সুরনাথ চকিত চক্ষে যুবতীর দিকে চাহিলেন। যুবতীর দৃষ্টিতে দুরন্ত আহ্বান, আরো কত রহস্যময় ইঙ্গিত। সুরনাথের বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি শরীর শক্ত করিয়া নিজেকে সংবরণ করিলেন, একটু স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'বাড়ির পুরুষেরা কোথায়?'

যুবতী দূরের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, 'তারা মাঠে গেছে, সারা রাত ধান পাহারা দেবে। মাঠে ধান পেকেছে, পাহারা না দিলে চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে।'

সুরনাথ কণ্ঠের মধ্যে একটা সঙ্কোচন অনুভব করিলেন, বলিলেন, 'তা— যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই থাকব।'

যুবতী দশনচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া হাসিল, প্রায়ান্ধকারে তাহার হাসিটা তড়িদ্দীপালির মতো ঝলকিয়া উঠিল। সে বলিল, 'তোমার গাড়ি দাওয়ায় তুলে রাখো। আমি আসছি।'

যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল, একটি মাদুর আনিয়া দাওয়ার একপাশে পাতিয়া দিল। এক ঘটি জল ও গামছা খুঁটির পাশে রাখিয়া বলিল, 'হাত মুখ ধোও। চা খাবে তো? আমি এখনি তৈরি করে আনছি।'

যুবতী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। সুরনাথ হাত মুখ ধুইয়া মাদুরে বসিলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, আলোর পীতবর্ণ ধারা দাওয়ার উপর আসিয়া পড়িল।

বাইরে নিরন্ধ্র অন্ধকার চরাচর গ্রাস করিয়া লইয়াছে। সুরনাথ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মানসিক অবস্থার বর্ণনা অনাবশ্যক। ব্যাধ-শরাহত মৃগ, বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মানসিক অবস্থা কে কবে বিবৃত করিয়াছে!

'এই নাও, চা এনেছি।' চা দিতে গিয়া আঙুলে আঙুলে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হইল— 'আমি রান্না চড়াতে চললুম।'

সুরনাথ ক্ষীণস্বরে আপত্তি তুলিলেন, 'আমার জন্যে আবার রান্না কেন? ঘরে মুড়ি-মুড়কি যদি কিছু থাকে, তাই খেয়ে শুয়ে থাকব।'

'ওমা, মুড়ি-মুড়কি খেয়ে কি শীতের রাত কাটে! রাত-উপোসী হাতি টলে। তোমার অত লজ্জায় কাজ নেই, এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে।'

যুবতী চলিয়া গেল। সুরনাথ চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন। পিতলের বাটিতে গুড়ের চা, কিন্তু খুব গরম। তাহাই ছোট ছোট চুমুক দিয়া পান করিতে করিতে তাঁহার শরীর বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সুরনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন কুটিরের মধ্যে দুটি ঘর, একটি রান্নাঘর, অপরটি বোধহয় শয়নকক্ষ। তিনি অনুমান করিলেন দাওয়ায় মাদুরের উপর তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইবে। সেই ভাল হইবে। কোনো মতে রাত কাটাইয়া ভোর হইতে না হইতে তিনি চলিয়া যাইবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে যুবতী দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'ভাত বেড়েছি, খাবে এস।'

সুরনাথ উঠিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের ঠাণ্ডার তুলনায় ঘরটি বেশ আতপ্ত। পিঁড়ের সামনে ভাতের ভালা, প্রদীপটি কাছে রাখা হইয়াছে। আয়োজন সামান্যই; ভাত ডাল এবং একটা চচ্চড়ি জাতীয় তরকারী।

সুরনাথ আহারে বসিলেন। যুবতী অতি সাধারণ গৃহস্থালির কথা বলিতে বলিতে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুরনাথ লক্ষ্য করিলেন, রান্না করিতে করিতে যুবতী কখন পায়ে আলতা পরিয়াছে।

যুবতী সুরনাথের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিতেছে, অথচ তিনি হুঁ হাঁ ছাড়া কিছুই বলিতেছেন না। বিপদের সময় যে ডাকিয়া ঘরে আশ্রয় দিয়েছে, খাইতে দিয়াছে, তাহার সহিত অন্তত একটু মিষ্টালাপ করিবার প্রয়োজন আছে। তিনি শামুকের মতো খোলের ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিলেন, 'তোমার নাম কি?'

এক ঝলক হাসিয়া যুবতী বলিল, 'কামিনী।'

নামটা তপ্ত লোহার মতো সুরনাথের গায়ে ছ্যাঁক করিয়া লাগিল। তিনি শামুকের মতো আবার খোলের

মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আহারান্তে সুরনাথ হাত মুখ ধুইলে কামিনী বলিল, 'পাশের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছি, শুয়ে পড় গিয়ে।'

সুরনাথের বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তিনি তোতলা হইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি—আমি বাইরে মাদুরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব।'

কামিনী গালে হাত দিয়া বলিল, 'ওমা, বাইরে শোবে কি! শীতে কালিয়ে যাবে যে। যাও, বিছানায় শোও গিয়ে।'

সুরনাথ কথা কাটাকাটি করিলেন না, কামিনী রাত্রে কোথায় শুইবে প্রশ্ন করিলেন না, দণ্ডাজ্ঞাবাহী আসামীর মতো শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। মেঝের উপর খড় পাতিয়া তাহার উপর তোশক বিছাইয়া শয্যা। সুরনাথ সুট্‌কেস আনিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিলেন, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াই শয়ন করিলেন।

চোখ বুজিয়া তিনি পাশের ঘরে খুট্‌খাট্ ঠুন্‌ঠান্ বাসন-কোশনের শব্দ শুনিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গুলি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনের উত্তাপ একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল।

চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি আচ্ছন্নের মতো হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ চট্‌কা ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন, কামিনী নিঃশব্দে কখন তাহার বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়াছে; তাহার মুখে বিচিত্র হিংস্র মধুর হাসি।

তিন দিন পর্যন্ত সুরনাথ যখন ফিরিয়া আসিলেন না তখন পোস্টমাস্টারবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কেবল সুরনাথবাবুর জন্য নয়, সেই সঙ্গে পোস্ট অফিসের সম্পত্তি সাইকেলটিও গিয়াছে। পোস্টমাস্টার পুলিসে খবর দিলেন।

পুলিস খোঁজ লইল। সুরনাথের যে তিনটি পোস্ট অফিসে যাইবার কথা সেখানে তিনি যান নাই। পুলিস তখন রীতিমত তদন্ত আরম্ভ করিল।

সাত দিন পরে সুরনাথকে পাওয়া গেল। বাঁ-হাতি রাস্তায় একটিও কুটির নাই, সেই রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সাইকেলটা অনতিদূরে মাটিতে লুটাইতেছে। তাহার পশ্চাতে সুরনাথের সুট্‌কেস রহিয়াছে, সুটকেসের মধ্যে কাপড়-চোপড় সাবান মাজন বুরুশ সমস্তই মজুত আছে। কিছু খোয়া যায় নাই।

সুরনাথের দেহে কোথাও আঘাতচিহ্ন নাই। কিন্তু দেহটি প্রাচীন মিশরীয় 'মমি'র মতো শুষ্ক ও অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, যেন রক্ত-চোষা বাদুড় দেহটা শুষিয়া লইয়াছে।

পুলিস হাসপাতালে লাশ চালান দিল।

পোস্টমাস্টার যখন সুরনাথের মৃত্যু-বিবরণ শুনিলেন তখন তিনি আক্ষেপে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা! ডাইনীর হাতে পড়েছিলেন! কামিনী ডাইনী এখনো ও তল্লাটে আছে, মায়া বিস্তার করে বেচারিকে টেনে নিয়েছিল। আমি ইন্সপেক্টরবাবুকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, বাঁ-হাতি রাস্তা ভাল নয়। কিন্তু উনি শুনলেন না।'

৮ আগস্ট ১৯৬৫

গল্প-পরিচয়

১৯১৫ সালে (বাংলা ১৩২২ সন) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ষোল বছর বয়সে তাঁর জীবনের প্রথম ছোটগল্প— একটি অলৌকিক কাহিনী— রচনা করেন। গল্পটির নাম 'প্রেতপুরী'। পুষ্পপাত্র পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েও লেখক দীর্ঘকাল এটিকে তাঁর কোন গল্পগ্রন্থে স্থান দেননি। ১৯৬৪ সালে শারদীয় রোমাঞ্চ পত্রিকায় এই গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হয়। লেখকের শেষ অলৌকিক গল্প হল 'কামিনী' (১৯৬৫)। এই দুটি গল্পই ঘটনাচক্রে একই গ্রন্থে— 'রঙীন নিমেষ'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শরদিন্দুবাবু তাঁর প্রথম অলৌকিক গল্পেই ভূতজ্ঞানী বরদার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। প্রথম দিকে ভূতের গল্পগুলি মূলত বরদারই কাহিনী। অধিকাংশ গল্পের পশ্চাৎপট মুঙ্গের শহর ও বিহারের গ্রামাঞ্চল। বরদার গল্প বলার এক নিজস্ব ভঙ্গি ছিল। গোড়াতেই চমকপ্রদ একটা কথা বলে সে শ্রোতাদের হতবুদ্ধি করে দিত তারপর শ্রোতারা সামলাইয়া ওঠবার আগেই গল্প শুরু করত। তখন আর তাকে থামানোর উপায় ছিল না। এইভাবেই সে অল্পকালের মধ্যে পাঠকদের মনে আসন পেতে বসে। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের সঙ্গেও একবার ভূতান্বেষী বরদার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সে কাহিনী— ব্যোমকেশ ও বরদা— ইতিপূর্বে শরদিন্দু অম্‌নিবাস প্রথম খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে।

এক কৌতূহলী পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে লেখক মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে বলেছিলেন: 'ভূতের গল্প সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতা আছে। বরদা চরিত্র কাল্পনিক। নতুন কোন আইডিয়া না পেলে ভৌতিক গল্প আর লিখব না। আসলে বরদাই আমাকে ছেড়ে গেছে, আমি বরদাকে ছাড়িনি।'

কেবলমাত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ছোটগল্পগুলির মধ্য থেকে নির্বাচন করে দু'ধরনের গল্প অম্‌নিবাসের পঞ্চম খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে। প্রথম একত্রিশটি গল্প অলৌকিক ধরনের; লেখকের সমস্ত অলৌকিক গল্পগুলি এখানে দেওয়া হয়েছে। বত্রিশ থেকে আশি সংখ্যক বাকি গল্পগুলি হল মূলত সরস কাহিনী— হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকরসই যার প্রধান উপজীব্য।

গল্পগুলি রচনাকাল অনুসারে সন্নিবিষ্ট। লেখকের সমুদয় গল্প সঙ্কলনের পর গল্পগ্রন্থগুলির পরিচয় নির্দেশ করা হয়েছে।

গ্রন্থের সংস্করণ ভেদে কোন কোন গল্পের সামান্য পাঠ-ভেদ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া লেখক তাঁর ব্যক্তিগত কপিতে নিজে কিছু কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করেছিলেন। এইভাবে সংশোধিত পাঠই বর্তমান সঙ্কলনে গ্রহণ করা হয়েছে।

শরদিন্দুবাবুর কতকগুলি হাস্য ও কৌতুকরসের গল্প নিয়ে ইতিপূর্বে দুটি সঙ্কলন গ্রন্থ বেরিয়েছিল— সরস গল্প ও হসন্তী। এই দুটি বইএর সব গল্প শরদিন্দু অম্‌নিবাসের পঞ্চম খণ্ডে পাওয়া যাবে।

অলৌকিক ও অতিলৌকিক গল্পেরও একটি সঙ্কলন 'কল্পকুহেলী' নামে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীসুভদ্রকুমার সেন লিখিত সেই গ্রন্থের ভূমিকার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল:

'...কলা বৌয়ের ঘোমটার আবরণ সরাতে চাওয়াটা যেমন অযৌক্তিক এবং অশোভন তেমনি অলৌকিক অতিলৌকিক কাহিনীর সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা চাওয়াটা অযৌক্তিক ও অপরিণত মননের পরিচায়ক।

সার্থক অলৌকিক কাহিনীর একটি মূল ধর্ম হল the benefit of the doubt, গল্পটি পড়ে শেষ করবার পর পাঠকের মনে কিছু সন্দেহ থেকে যাওয়া চাই; অর্থাৎ ব্যাপারটি হলেও হতে পারে এই ধরনের অনুভূতি

পাঠকের মনে রেশ জাগিয়ে রাখে। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।...

['কালো মোরগ'] গল্পটিকে যদি বিশ্লেষণ করি দেখব যে, ঘটনার পরম্পরা এমনই যে গোকুলবাবুর মন সহজেই বিভ্রান্ত হয়েছে। পাঠক ঘটনাগুলি এই ভাবে সাজালেই আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য অনুধাবন করতে পারবেন। জামায় টান লাগা— সেই বিশেষ গাছটি দেখা— আবদুল্লা কাহিনী স্মরণ— শীতের মায়াবী কুয়াশা ছড়ানো সন্ধ্যা— ভগ্নপ্রায় কবরখানা— এবং সর্বোপরি মোরগটির রংয়ের সঙ্গে আবদুল্লার লুঙ্গির সাদৃশ্য। তারও চেয়ে বড় কথা গোকুলবাবুর মন সেই সময়ে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় উত্তেজিত ছিল। এই ভাবে অবচেতন মনের নজীর ও দোহাই দিয়ে হয়তো সমস্ত ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকমনে কিছু খুঁতখুঁতুনি থেকে যায়। সমগ্র ব্যাপারটিই কি অবচেতন মনের কারসাজি? কিংবা আরো কিছু বুদ্ধির অগম্য অভিজ্ঞতা জীবনের অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকে? এই সংশয়েই অলৌকিক কাহিনীর রসপুষ্টি বা সার্থকতা। ঠিক এই রকম ঘটনা জীবনে হয়তো ঘটে না, একথা হয়তো সত্য; কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। ঘটেনি বা ঘটে না বলেই ঘটবে না একথা জোর করে বলা চলে না।...

...বরদার উক্তিব্যক্তি সম্বন্ধে তার বন্ধুরা স্থিরনিশ্চয় নয়। ইংরেজী হলে বলতুম রীতিমত sceptic। বরদার বর্ণিত কাহিনীগুলি তার বন্ধুরা শুনতে অনিচ্ছুক নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে পরাঙ্মুখ। অথচ যখন গল্প বলা শেষ হয় তখন তারা গল্পটিকে গাঁজাখুরি বলে সরাসরি উড়িয়ে দিতেও পারে না। ঘরে ফিরে যেতে তাদের গা ছমছম করে। ধরা যাক 'নীলকর' গল্পটি। গল্পের নায়িকা কবুতরী সেই ধরনের মেয়ে যাদের বলে পুংশ্চলী। কাহিনীর শুরু থেকে তার ব্যবহার তার চরিত্র ও স্বভাব অনুযায়ী। কিন্তু নীলকর সাহেবের সেই কোৎঘরে বরদার সামনে তার ব্যবহার কি hysteria-জনিত, নাকি অন্য কোন কারণজাত? বরদা তার উত্তর জানে কি? অন্তত তার বন্ধুরা সঠিক উত্তরটি জানে না।...

ভূতুড়ে বাড়ি প্রকল্পনা (theme) আশ্রয় করে কাহিনী... 'প্রতিধ্বনি' এবং 'অশরীরী'...। পুরনো বাড়ি জীবন-নাট্যের অনেক বাহ্যিক ও আন্তরিক দৃশ্যের নীরব সাক্ষী। জন্ম-মৃত্যুর লাল নীল সূতায় বোনা জীবন-নক্সার বহু বিচিত্রতা তার কক্ষে কক্ষে অলিন্দে অলিন্দে আজও হয়তো আঁকা হয়ে আছে, কে জানে। যে সব নরনারী একদিন তাদের দুঃখসুখের, হাসিকান্নার ছন্দেবিছন্দে এই ঘরগুলিকে ভরিয়ে রেখেছিল, আজ তারা কোথায়? পাত্র-পাত্রীরা হয়তো অনন্তে বিলীন হয়েছে, কিন্তু তাদের তীব্র অনুভূতি, জ্বলন্ত ইমোশন— সে সবও কি মহাশুন্যে বিলীন হয়ে গেছে? কোথাও কি কোনও 'অনাহত বীণাতারে' তারা বাজছে না? কোথাও কি বাতাসের দমকে দমকে ঈথারের থরে থরে, সময়ের স্তরে স্তরে সেগুলি সঞ্চরণ করে না? যেমন করে মহাফেজখানায় পুরানো কাগজপত্র রক্ষিত হয়, তেমন কোথাও থাকে না কি? বছরের পর বছর কেটে যায়, সে সব কাগজপত্র কেউ নেড়ে-চেড়ে দেখেও না; কিন্তু একদিন কেউ তো সেগুলো দেখতেও পারে?

'প্রতিধ্বনি' গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, এই গল্পে অলৌকিকের কোন রূপ প্রকাশিত নেই। তবু সে আছে। তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বাতাসের মতো আলোর গতিপথের মতো দৃষ্টিগোচর না হলেও তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

'অশরীরী' গল্পে বক্তার কাঁধে হঠাৎ শিমুল ফুল পড়ার কল্পনাটি বড় সুন্দর। ব্যাপারটি কি সম্পূর্ণ কাকতালীয়?

এই ধরনের কাকতালীয় (?) যদি 'মরণ-ভোমরা' গল্পে। বক্তা গল্প বলা শেষ করলেন। বন্ধ ঘর। চুরোটের ধোঁয়ায় ঘরের হাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। একজন উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শীতল বাতাস নিয়ে এল আরাম আর একটা কালো কুচকুচে কালো ভ্রমর।

'শূন্য শুধু শূন্য নয়' এবং 'সবুজ চশমা' fantasy জাতীয় রচনা।

'মায়া কুরঙ্গী' এবং 'সতী' মূলতঃ অতি-অলৌকিক কাহিনী। 'মায়া কুরঙ্গী'র শেষ অনুচ্ছেদে হঠাৎ বক্তার নারীমুখ চিত্রণ কুশলতায় লেখকের তুলির টানটি (touch) বড় সুন্দর।

‘চিরঞ্জীব’ গল্পের মুখ্য চরিত্র চিরঞ্জীব-কে গঞ্জিকাবীর মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গল্পের সমস্ত আবহাওয়াটি বদলে গেল কর্ণেল ভর্মার একটি প্রশ্নে: ‘চিরঞ্জীব! কোথায় সে?’...

‘কামিনী’ গল্পে প্রচলিত প্রকল্পনাকে নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর একটি আশ্চর্য গল্প ‘বহুরূপী’। এই গল্পের প্রকল্পনা doppelgaenger কল্পনাকে আশ্রয় করেনি। পক্ষান্তরে জীবিত ও অ-জীবিতের এই লুকোচুরির কল্পনাটি খুব চমৎকার। এবং বরদাকে impersonate করার কল্পনাটি তুলনাহীন।

‘ছোটকর্তা’য় জীবিত ও অজীবিতের মধ্যে এক মধুর সম্পর্কের স্নিগ্ধ চিত্র আঁকা হয়েছে। পারিবারিক ও বাস্তু প্রেতাত্মা— ইংরেজী হলে বলতুম domestic ghost প্রকল্পনাটি অভিনব।

‘নিরুত্তর’ ও ‘ফকিরবাবা’ occult জাতীয় গল্প।

‘পিছু পিছু চলে’ গল্পটির নাম সহজেই হতে পারত ‘এড়ানো যায় না’। সত্যবান গজাধর সিন্ধে কাকে দেখছে? অনন্তা মারাঠে কে? অনন্তার প্রেত কে? নাকি তার নিজের বিবেক অনন্তার রূপ ধরে তাকে তাড়া করে ফিরছে?

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অলৌকিক-অতিলৌকিক কাহিনীর আর-একটি উল্লেখযোগ্য দিক স্থানীয় পরিবেশের যথাযথ ও সুন্দর বিনিয়োগ। ‘মধু-মালতী’ গল্পে পুণা শহর ও মারাঠা জীবন যথাযথ ও সুন্দরভাবে বিম্বিত হয়েছে। পশ্চিম ভারতের এই শান্ত স্নিগ্ধ শহরটির সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁরা ‘মধু-মালতী’ বা ‘চিরঞ্জীব’ পড়তে বসে নিশ্চয়ই মন-কেমনের হাওয়া অনুভব করবেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের বিহার প্রদেশ, বিশেষতঃ মুঙ্গের শহর বরদার কাহিনীগুলিকে উদ্ভাসিত করেছে। পরিবেশ-সৃষ্টির এই সহজ কুশলতায় অলৌকিকের মধ্যেও মানবিক রস সঞ্চারিত হয়ে, গল্পগুলিকে আরও বেশী চিত্তহারী করেছে।’

‘শ্রেষ্ঠ গল্প’-এর ভূমিকায় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য লেখকের ভূতের গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন:

‘ভূতের ভয় মানুষের সংস্কারগ্রস্ত মনকে আদিম যুগ থেকে অধিকার করে আছে। ভয় যেমন প্রবল, আকর্ষণও তেমনি দুর্বার। কিন্তু ভৌতিক রহস্য চিরদিনই অন্ধকারে আবৃত। এ যুগের মানুষের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এই অন্ধকারকে আলোকিত করবার জন্যে অলৌকিক লোকেও তার বুদ্ধির আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। ভৌতিক রহস্যলোকে কবিকল্পনা চিরকালই প্রসারিত হয়েছে। আমাদের ত্রৈলোক্য মুখুজ্জের ভুতুড়ে গল্প থেকে পরশুরামের ‘ভূশণ্ডীর মাঠে’র রসিকতা পর্যন্ত বিচিত্র রসের অনেক ভৌতিক কাহিনী লিখিত হয়েছে। শরদিন্দুবাবুর ভূতের গল্পে ভয়ের চেয়ে বিস্ময়ের উপাদানই বেশী। ফলে সেগুলোতে ভয়ানক-রসের চেয়ে অদ্ভুত-রসেরই পরিবেশন। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বলেছিল, ‘মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোনও উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তবে তার চেয়ে লাভ আর কি আছে? তা সে যে-ই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না।’ শরদিন্দুবাবু জন্মজন্মান্তরের জীবনধারাকে সাহিত্যে গ্রথিত করে রেখেছেন। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্যেকার তমসাবৃত জীবনরহস্য স্বভাবতই তাঁকে আকর্ষণ করেছে। এখানেই তাঁর ভূতের গল্পের উৎপত্তি।’

‘চুয়াচন্দন’ গল্পগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এই সঙ্কলনে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি গল্পের বিষয়ে লিখেছিলেন (শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৪৩):

...‘মরণ-ভোমরা’ ও ‘রক্ত-খদ্যোত’ ভৌতিক গল্প। ভূতের গল্পের দুটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ— তাহা ভূত হওয়া চাই ও গল্প হওয়া চাই। শরদিন্দুবাবু এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। ইহার প্রধান রস— রহস্যের রস। সংস্কার এখানে বুদ্ধির বড় শরীক। শরদিন্দুবাবুর মধ্যে এই রহস্য ঘনীভূত করিয়া তুলিবার শক্তি যথেষ্টই আছে।... এবার হইতে ভোমরা দেখিলেই শরদিন্দুবাবুর কথা মনে পড়িবে, কি জানি তিন দিনের মধ্যে কাহাকে ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে।’

শরদিন্দুবাবু তাঁর জীবদ্দশায় বরদার গল্পগুলি নিয়ে একটি গল্প-সংগ্রহ প্রকাশ করার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর

নোটখাতায় এই সংগ্রহের একটি ভূমিকার খসড়া দেখা যায়। সেটির আংশিক উদ্ধৃতি বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না:

'রক্ত-খদ্যোত' গল্পের শেষ কয়েক পংক্তির ভাবাংশ স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের একটি গল্প হইতে গৃহীত হইয়াছে।

'অশরীরী'কে লিখিবার সময় দ্য-মোপাসাঁর 'La Horla' নামক গল্পটি মনের পশ্চাৎপটে বিদ্যমান ছিল। উভয় গল্পই ডায়েরীর আকারে লেখা— কিন্তু বিষয়বস্তুতে কোনো মিল নাই। 'অশরীরী'কে দ্য-মোপাসাঁর ভাবানুপ্রেরণায় লিখিত বলা যাইতে পারে।

অন্য গল্পগুলি মৌলিক।'

২৮ জুলাই ১৯৭৫ শোভন বসু

অলৌকিক গল্পসমগ্র • শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

|| ই-বুকটি সমাপ্ত হল ||

www.anandapub.in